নবীন নবন্যাস।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

এ সংসারে আশাপারে কে যাইতে পারে ?
যে পারে সে ভালবাসে আশা-চ[illegible]রে

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

Calcutta:
PRINTED BY D. C. DASS AND COMPANY,
PUBLISHED BY
WOOMA CHURN DASS
"CORINTHIAN" PRESS, 33, NEW CHINA BAZAR

1885.

মূল্য চারি আনা। *Price 4 Annas.*

আশা-চপলা।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

পাঠকমহাশয় !

আবার আমি রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলাম। পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহ, উৎসাহ, সহায়তা, এবং সহানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা।

অনেকগুলি প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। একে একে সূত্রে সূত্রে মালাগুলি গাঁথা হইবে ; স্থলে আর জলে। স্থলে মালা, জলে তরঙ্গ। মালা গাঁথিবার সময় হাতের সূতা খসিয়া পড়ে, ঢেউ চলিবার সময় ছোট ছোট তরণী কাঁপে। আমাদের সাহস অনেক। সাগরের তরণীতে বসিয়া মালা গাঁথিতেছি। ঢেউ আসিতেছে, নমস্কার করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া দূরে দূরে বিদায় করিয়া দিতেছি। বেশী যদি আব্‌দার করে, বুকে করিয়া ধরিতেছি। তরঙ্গ ! তুমি একটু সরিয়া যাও। অনেক দিনের অনেক কথা আমার মনে পড়িতেছে। এই নবীন্ আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা জলধিসলিলে ডুবিয়া যাইবেন না। তরঙ্গ ! প্রবাহ ! তোমরা যদি ডুবাইতে চেষ্টা কর, সে চেষ্টা বরং ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু ইহাঁরা ডুবিবেন না। থাক ! থাক ! অতি অল্পক্ষণ সুস্থির হইয়া থাক। জলের ভিতর রত্ন থাকে, শুনিয়াছি, সে সকল রত্ন আমি দেখিয়াছি। এখন সম্মুখে দেখিতেছি, দুটী নির্ম্মল রত্ন। কুমার ভূপেশচন্দ্র আর কুমারী অপ্সরাসুন্দরী।

সাক্ষাতের অবসর আসিতেছে। বহুদিন, পাঠকমহাশয়! আপনাকে আমি বহুদিন অন্ধকারে রাখিয়া আসিয়াছি। অমাবস্যারাত্রে সকলেই অন্ধকারে থাকেন, কিন্তু দেখুন আশ্চর্য্য! পূর্ণিমার রাত্রে আপনাকে আমি অন্ধকারে রাখিয়া আসিয়াছি। আমাদের একটী দিন আসিতেছে, যে দিনের সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মী আকাশে উড়িবেন; সেই দিন আসিতেছে। এক বিভাবরী অবসানে ভূপেশচন্দ্রের প্রাণ যাইবে, এক বিভাবরী অবসানে অপ্সরাসুন্দরী অনাথিনী হইবেন। এই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকা অসাধ্য! অনেক উপকরণে মানবদেহ গঠিত হইয়াছে, অনেক উপকরণে আশা-চপলা গঠিত হইতেছে। কিন্তু পাঠকমহাশয়! একটুতে একটুতে যদি বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলেই আকাশপাতালের অনন্ত বিচ্ছেদ মনে পড়ে। দেখিতে হইবে, ভূপেশচন্দ্র কোথায় যান; দেখিতে হইবে, অপ্সরাসুন্দরী কোথায় থাকেন। অনেক খেলা দেখিয়াছি। সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত দেখিয়াছি, চন্দ্রদেবের উদয়াস্ত দেখিয়াছি, নক্ষত্রের উদয়াস্ত দেখিয়াছি, দেখিতে যেটী বাকী, এইবারে তাহা দেখিব।

বহুদিনের পুরাতন সংসারী,
নূতন কৃপাভিলাষী
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আশা-চপলা।

নবীন নবন্যাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

একষষ্টিতম প্রবাহ।

যমপুরী কত দূর ?

ভাবিয়া ভাবিয়া আমি ভাসিয়া যাইছি।
কোথা হতে আসিয়াছি, কোথা বা যাইব ?
অন্ধকার, অন্ধকার, মহা অন্ধকার !
ওই বুঝি যমপুরী ? নিহারি নয়নে !
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে যত পাপীগণ ;
বিকট ভীষণ নাদ পশিছে শ্রবণে !
আমি কি তাদের সাথে সাথী হব গিয়া ?
তাই কি ডাকিছ মোরে দেব ধর্ম্মরাজ ?

ভারতরত্ন।

বিশ্রাম। মানুষের কি বিশ্রাম আছে ? কতদিনের পরে আবার আমি দেখা করিতে আসিতেছি। পাঠক মহাশয় ! আশীর্ব্বাদ, নমস্কার, প্রণাম ; কিন্তু

কিছু ঘুরাইয়া বলি, প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ। বিশ্রাম নাই। দণ্ডেকের জন্য যদি কিছু বিশ্রাম থাকে, তাহা সমাপ্ত হইয়াছে; নূতন জগতে আমি প্রবেশ করিতেছি। পুরাতন সূর্য্য নূতন হইয়া আমার চক্ষের কাছে বিভাসিত হইতেছেন। যে সংসার অন্ধকার ছিল, সেই সংসার উজ্জ্বল আলো প্রকাশ করিয়া অন্ধকারপথে আমাকে আলো দেখাইতেছে। বিধাতার চরণে প্রণিপাত। আমি আসিতেছি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার আবার অভিলাষ করিতেছি। আমার এই আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা চিরদিনের মত বিচ্ছেদ-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছেন। আর দেখা শুনা হইবে কি না, উভয়ে তাহার কিছুই বার্ত্তাবাষ্পও জানেন না। ভবিষ্যৎ কি বলিয়া দিবে, ভবিষ্যতেরই মনে তাহা আছে। ভূপেশচন্দ্র রাজবিচারে প্রাণ হারাইবেন, ইহা নিশ্চয়। আমরা যদি রাজা হইতাম, বিচারের অগ্রে বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়া সেই নিষ্পাপ রাজকুমারকে মুক্তবাতাসে ছাড়িয়া দিতাম; কিন্তু ভোর। মোগলরাজত্বের অবসান,—ভোর। এখন অনুরোধ উপরোধ চলে না। আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে একটী পুতুল মাত্র। পুতুল কথা কহে না, হাত পাও নাড়ে না। যাহারা পুতুল লইয়া খেলা করে,—পুতুলেরা খেলা করে না,—যাহারা খেলায়, তাহারা মনে করে, পুতুল খেলিতেছে, নাচিতেছে, উঠিতেছে, বসিতেছে, কথা কহিতেছে; কিন্তু তাহা সত্য নয়। পুতুল যেমন নির্ব্বাক নিশ্চল, সেই রকমেই থাকে। যাহারা খেলায়, তাহারা মনে করে, পুতুল যেন সজীব। আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র মনে জানিতেছেন, প্রাণ যাইবে। মনে ভাবিতেছেন, যমপুরীতে যাইতে হইবে; মনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যমপুরী কত দূরে? জীবনের অর্দ্ধাংশরূপিণী অপ্সরার উদ্দেশে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রেমময়ি! আর কি এ জন্মে তোমাকে দেখিতে পাইব না? কাহার কথায় কে উত্তর দেয়? কল্পনা, আকাশ, বাতাস, স্বপ্ন। অজ্ঞানে কত স্বপ্ন আসিয়া দেখা দেয়, স্বপ্নভঙ্গে জ্ঞানের পর মানুষের তাহা মনে থাকে না। যদি থাকে, শুদ্ধ কেবল ছায়ামাত্র। পাঠক মহাশয়! মনে করুন, আপনি আর আমি নৌকা করিয়া ভাসিয়া যাইতেছি, নদীতে তুফান আসিয়াছে, নৌকাখানি ডুবিয়া গিয়াছে, জলে পড়িয়া

আমরা ডুবিয়া গিয়াছি, আপনাতে আমাতে আর দেখা হইতেছে না, কিন্তু আশা-চপলার উপদেশে আশা হইতেছে, দেখা হইবার। আশা-চপলার উপদেশে আশা হইতেছে, পুনর্ব্বার মিলন হইবার। কিন্তু সে মিলন ভবিষ্য-দেবতার আজ্ঞাকারী। ভবিষ্যদেবতা যাহা ঘটাইবেন, তাহাই ঘটিবে; মিলন হইবে কি না, তিনি জানেন। সর্ব্বজ্ঞ দেবতা কি না, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। তুমি আমি জানি না, তুমি আমি বলিতে পারি না। ভবিষ্যতের কথা, ভবিষ্যতের আশা, চুপি চুপি ভবিষ্যতের গর্ভে লুকাইয়া থাকে; লুকাইয়া আছে। লুকাইয়া লুকাইয়া বলিতেছে, ভূপেশচন্দ্র পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবেন, বিবাহের অগ্রে অপ্সরাসুন্দরী অনুমৃতা হইবেন, ইহা যেন কখনই সম্ভবে না। ভবিষ্যতের এই কথা আকাশে উড়িয়া গেল। কথার পালক নাই, কিন্তু কথা উড়িতে পারে। স্বপ্ন আর কল্পনা, এই দুটীতে একত্র হইয়া কথাকে উড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আমাদের এই নবীন-নবন্যাসের নবীন লক্ষ্য। উড়িয়া যাইলেও, কেহ উড়াইয়া লইয়া যাইলেও কিছু কিছু যেন মনে থাকে। প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, এই নবীন প্রবাহে জগৎসংসারকে তাহা আমি দেখাইব।

ভূপেশচন্দ্রের সহিত অপ্সরাসুন্দরীর দেখা হইয়াছে। সেই সময়ের যাহা যাহা কহিবার ছিল, সে কথা হইয়াছে; প্রাণদণ্ড হইবে, ভূপেশচন্দ্র তাহা জানিয়াছেন। অপ্সরাসুন্দরীও তাহা জানিয়াছেন। রজনী জানিয়াছেন কি না, উষা জানিয়াছে কি না, প্রভাত জানিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রভাতে ভূপেশচন্দ্র যমালয়ে গমন করিবেন।

বিপদের রাত্রি শীঘ্র শীঘ্র পোহায় না। যাহারা জাগিয়া থাকে, তাহাদের রাত্রিও শীঘ্র শীঘ্র পোহায় না। ভূপেশচন্দ্র দিবাভাগে অপ্সরাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দিবাভাগে অপ্সরাসুন্দরী বিদায় হইলেন, চপলা আশার কি যেন একটু খেলা ছিল, দিন শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গেল। যেমন হইয়াই থাকে, তাহাই; কিন্তু তাঁহারা যেন ভাবিয়াছিলেন, শীঘ্র শীঘ্র সূর্য্যদেবের অস্তগমন। সন্ধ্যাসতী যেন শীঘ্র শীঘ্র ভক্তবৃন্দের আরতি লইতে আসিলেন। কিন্তু রাত্রি আর পোহায় না। কতই যেন বড় হইয়া আসিয়াছে,—কতই যেন মন্থরগমনে চলিতেছে, দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় তাহা

অনুভব করিতে অক্ষম। পাঠক মহাশয়! দুরন্তসংসারে বড়মানুষের গতিক্রিয়া বুঝেন? সচরাচর সাধারণ লোকে তাঁহাদের বার পায় না। হা-প্রত্যাশা করিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কত লোকে বসিয়া থাকে, বার হয় না। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে,—যাহাদের গহে আদরের বস্তুর সঙ্কট পীড়া, রজনী প্রভাতে যাহাদের কতক সান্ত্বনা পাইবার আশা, তাহারা ক্ষণে ক্ষণে আহ্বান করিয়াও প্রভাতকে দেখিতে পায় না। দুঃখীর পক্ষে সূর্য্য একজন বড়লোক। সুখী তাঁহাকে না ডাকিলেও তিনি উদয় হন; কিন্তু দুঃখীলোক মাথা কুটিয়া, চীৎকার করিয়া মরিলেও উদয়াচলে তিনি উঁকি মারেন না। এটী পরীক্ষাসিদ্ধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ সংঘটন। যত বিলম্ব সম্ভব হইতে পারে, তত বিলম্বে সূর্য্যদেবের উদয় হইবে, ভূপেশচন্দ্র সেই সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ওদিকে আর এক কাণ্ড। রাজা রঘুবর রাও কোথায় কোথায় কতদূর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রান্তক্লান্তভাবে প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়াছেন। রাত্রি দুই প্রহরের সীমায় দাঁড়াইয়া অল্পে অল্পে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে। দেবী যশেশ্বরী একাকিনী রাজার বিরামগৃহে শয়ন করিয়া মহাদুঃখে আকাশপাতাল ভাবিতেছেন। রাজা প্রবেশ করিলেন। নিকটে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চঞ্চলপদে শয্যার নিকটে গিয়া দেখিলেন, অভাগিনী ভগিনী যশেশ্বরী একাকিনী শয়ন করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশি! তুমি কি ঘুমাইতেছ?"

ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া যশেশ্বরী উত্তর করিলেন, "না মহারাজ! আমার ঘুম নাই!"

"আমি ক্ষমা আনিয়াছি। তোমার ভূপেশচন্দ্রের আর কোন শঙ্কা নাই। স্বর্গভূষণ কোথায়?"

"ক্ষমা আনিয়াছ মহারাজ! আমার ভূপেশচন্দ্র তবে বাঁচিয়া থাকিবে? আঃ! মহারাজ! আজ তুমি যেন স্বর্গের দেবতা হইয়া আমার চক্ষের কাছে দেখা দিলে! আমার ভূপেশচন্দ্রকে তুমি বাঁচাইবে? মহারাজ! এতদিনে আমি জানিলাম, এই প্রয়াগধামে তোমার রাজমহিমার যথার্থই উচিত মহিমা আছে।"

"কথায় কথায় কাল হরণ করিবার আর সময় নাই। রাত্রি আর অধিক নাই, স্বর্গভূষণ কোথায়?"

"বোধ করি, স্বর্গভূষণ তাহার জননীর নিকটে আছে।"

পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া রাজা একজন কিঙ্করীকে আদেশ করিলেন, "কুমার স্বর্গভূষণকে ডাক। যদি ঘুমাইয়া থাকে, আমার নাম করিয়া ডাক।"

কিঙ্করী ডাকিতে গেল, দ্বার অবরোধ করিয়া যশেশ্বরীর নিকটে রাজা-বাহাদুর বসিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে দ্বারে আঘাত হইল। রাজা মনে করিলেন, স্বর্গভূষণ আসিতেছে। দ্বার মুক্ত হইল। হতাশে নিরাশ্বাসে রাজা দেখিলেন, নূতন মুর্ত্তি। চক্ষে নূতন না, সে সময়ের প্রত্যাশার পক্ষে নূতন। নূতন পুরাতন বিবেচনা করিবার সময় ছিল না, যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি সেই বিখ্যাত চিকিৎসক চতুর্ভুজলাল।

পরমসমাদরে তাঁহারে অভ্যর্থনা করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ চতুর্ভুজ?"

"সংবাদ কণ্ঠে কণ্ঠে মহারাজ! রজনীপ্রভাতেই কুমার ভূপেশচন্দ্রের প্রাণ যাইবে!"

"সে শঙ্কা নাই। আমি ক্ষমা আনিয়াছি। এই রাত্রের মধ্যেই সেই ক্ষমাপত্র আমি শিবিরে পাঠাইব।"

"কে লইয়া যাইবে?"

"যাহাদের সেনাদল, সেই দলের সেনানায়ক আমার স্বর্গভূষণ।—ডাকিতে পাঠাইয়াছি, স্বর্গভূষণ এখনই আসিবে, স্বর্গভূষণ সেই ক্ষমাপত্র লইয়া এখনই যাইবে।

"তবে ত মহারাজ সমস্তই বিফল হইল! স্বর্গভূষণ বাহির হইলেই ধরা পড়িবে। হাজতের পলাতক আসামী। রাজা বিরাটকেতুর নূতন রাণী জগৎকুমারীকে কুমার স্বর্গভূষণ কুলের বাহির করিয়াছেন। নালিস হইয়াছে, মোকদ্দমা হইয়াছে, সম্ভ্রমের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দাবী। ইহা ছাড়া ফৌজদারী অপরাধ! স্বর্গভূষণ বাহির হইবে কিরূপে?"

"নারায়ণ! নারায়ণ! আমার স্বর্গভূষণ এমন পাপ করিয়াছে? তাহার নামে মোকদ্দমা হইয়াছে? কেহই ত আমাকে কিছু বলে নাই?"

"মহারাজ! তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ। সে দিন আমি ত এক প্রকার সমস্তই বলিয়াছি, যদিও কোন বিশেষ কারণে সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করি নাই, কিন্তু স্থূলতত্ত্ব বলিয়া দিয়াছি। স্বর্গভূষণ বাহিরে যাইতে পারেন না। বিরাটকেতুর মহিষীকে কুলভ্রষ্ট করিয়াছেন।"

"একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য আমার স্বর্গভূষণ লুকাইয়া থাকিবে, ইহা কি আমি চক্ষে দেখিব? তুমি জান চতুর্ভুজ। টাকার জন্য আমি কথনো কাতর হই না। যুবাকালে যুবা ছেলেরা একটু একটু দৌরাত্ম্য করে। বিশেষতঃ বিরাটকেতু বড় বিশ্বাসঘাতক। তাহার স্ত্রীকে যদি—"

"না,—না মহারাজ! যত ছোট তুমি মনে করিতেছ, তত ছোট না। রাজা বিরাটকেতুর নূতন রাণী জগৎকুমারী অপর আর কেহই না, তোমার প্রণয়িনী মহিষী মহালক্ষ্মীর অনূঢ়াকালের গর্ভের ফল সেই মিহিরমোহিনী। দ্বিতীয় নামে কীর্ত্তি, তৃতীয় নামে জগৎকুমারী।"

"কি। কি।—কি। মিহিরমোহিনী!—কীর্ত্তি! জগৎকুমারী! এই তিন এক? চতুর্ভুজ! তুমি আমাকে পাগল করিতেছ! আমি পাগল হইয়া যাইতেছি!" এই কথা বলিতে বলিতে কুমার স্বর্গভূষণ যেন উন্মত্তের ন্যায় সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "স্বর্গভূষণ। ও সকল কথায় কালহরণ করিবার আর সময় নাই। সমস্তই আমি বুঝিয়াছি। তোমার নামে নালিস হইয়াছে, তুচ্ছ কথা! তুমি অবিলম্বে শিবিরে যাও। তোমাদের সেনাপতি বিংশতি সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করে। আমার ভাগিনেয়ের প্রাণের মূল্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা! তুমি লইয়া যাও; পথে যদি কেহ অবরোধ করে, আমার নাম করিয়া নির্ভয়ে তুমি চলিয়া যাইও। আমার অশ্বে আরোহণ করিয়া যাও। প্রভাতে সেই ক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "রাত্রে আমার কোন ভয় নাই। রাত্রে আমি রাজাধিরাজ মহারাজের মত নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করিতে পারি। আদালতের লোকেরা চক্ষে চক্ষে আমাকে দেখিলেও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না। নিকটে অগ্রসর হইতেও তাহারা সাহস করিবে না।

নিষ্কোষিত অসি প্রদর্শন করিয়া আমি তাহাদিগকে ভয় দেখাইব। পাছুপাছু হটিয়া দুই দুই হাতে তাহারা আমাকে সেলাম করিবে। মহারাজ রঘুবর বাহাদুরের পুত্র অসিহস্তে রাত্রিকালে রাজপথে বহির্গত, কাহার সাধ্য মহারাজ, ইহার গতিরোধ করে? ভূপেশচন্দ্রকে আমি রক্ষা করিব। অগ্রে পরিচয় জানিতাম না, সেই জন্য ততদূর ঘটিয়াছে। এখন আমি ভূপেশচন্দ্রের বন্ধু হইলাম, কোন চিন্তা নাই মহারাজ! সেনাদলে আমার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। ভূপেশচন্দ্রের প্রাণরক্ষার জন্য টাকার সঙ্গে আমিও অনুরোধ করিতে পারিব। অনেক কারণে সেখানে আমার অনুরোধ রক্ষা হইবে।"

"দুঃসাহসের কার্য্য করিও না।"—একটু চিন্তা করিয়া রাজা কহিলেন, স্বর্গভূষণ! দুঃসাহসের কার্য্য করিও না। যখন তুমি হাজতের আসামী, তখন এই রাত্রিকালে একাকী বাহির হওয়া সত্যই দুঃসাহসের কার্য্য। সিপাহী সঙ্গে লইয়া যাও। পথে কোন বিপদ ঘটিলে, তাহারা রক্ষা করিবে, কিম্বা সেই দণ্ডে আমাকে সংবাদ দিতে পারিবে।"

"সিপাহী মহারাজ!" পিতৃবাক্যে দম্ভ প্রকাশ করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "সিপাহী মহারাজ! সিপাহী সঙ্গে করিয়া তোমার স্বর্গভূষণ রাস্তায় বাহির হইবে? সে লজ্জা স্বর্গভূষণের ভূষণ হইবে না। বীরপুরুষ আমি, বীরদর্পে একাকী যাইব।"

"যাইবে ত সত্য!" একটু হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "যাইবে ত সত্য, কিন্তু এ সকল কথা ত তোমার মনে থাকিবে? তোমার গর্ভধারিণী কে? মিহিরমোহিনী কে? যাহাকে তুমি কীর্ত্তি বলিয়া জান, সে কুলটাই বা কে? বিরাটকেতুর নূতন রাণী জগৎকুমারীই বা কে? এ সকল কথা ত তোমার মনে থাকিবে?"

"থাক্!—থাক্!—থাক্! আগে আমি ফিরিয়া আসি, তাহার পর তখন উচিত প্রতিফল।"

"উচিত প্রতিফল ত তোমার হইয়াইছে। জগৎকুমারীকে,—তোমার সহোদরা ভগ্নী জগৎকুমারীকে বিরাটকেতুর গৃহ হইতে বাহির করা অপরাধে তোমার বিংশতি সহস্র মুদ্রা ক্ষতিপূরণ, আর তদতিরিক্ত দুই বৎসরকাল কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।"

"বিংশতি সহস্র? আমার,—এই স্বর্গভূষণের এই একটী মাত্র অঙ্গুরীর মূল্যই বিংশতি সহস্র!"

"আচ্ছা! তবে যাও! আমিও বিদায় হই।"

চতুর্ভুজ বিদায় হইলেন। পিতার নিকট হইতে মুদ্রা ও ক্ষমাপত্র গ্রহণ করিয়া কুমার স্বর্গভূষণ পিতার একটী সুশিক্ষিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মুক্ত পথে বহির্গত।

দ্বিষষ্টিতম প্রবাহ।

বধ্যভূমি।

নাচে, ডাকিনী যোগিনীকুল, ভয়ঙ্কর মশানে!
ঝরে, রক্তধারা, মাতোয়ারা, অট্টহাস বয়ানে!!
যেন, সাঁতারিয়া ভাসিতেছে শোণিতের তুফানে!
যথা, শৃগাল শকুনিবৃন্দ মহাভীম শ্মশানে!!

আর্য্যরত্ন।

কেহ কোথাও নাই। আকাশ গম্ভীর, বায়ু নিস্তব্ধ, চন্দ্রসূর্য্য অদৃশ্য, নক্ষত্রেরা চঞ্চল, পশুপক্ষী নীরব, রজনীর অবসান।

প্রভাতের আগমন। বেলা এক প্রহরের সময় ভূপেশচন্দ্রের পার্থিব জীবনের অবসান হইবে। অন্যূন আট শত লোক উৎসাহিত হইয়া দেখিতে আসিয়াছে। শিবিরের মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ সেই সমস্ত লোকের দাঁড়াইবার স্থল হইয়াছে। বাদ্যকরেরা রণবাদ্য বাজাইতেছে। আনেয়ার বখ্ত আপন গৃহে বসিয়া সুধাসম্পৃক্ত আনারের সহিত মুহুর্মুহু আলাপ করিয়া চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। একজন

হাবিলদার সেই সময়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু কি সংবাদ আসিয়াছে?"

"আসিয়াছে এক সংবাদ। বন্দীর মুক্তিপ্রার্থনা।"

"তাহা কি তুমি গ্রাহ্য করিয়াছ?"

"ঠিক্ সময়ে যদি আসে, তাহা হইলে গ্রাহ্য করিব।"

"ঠিক্ সময় কতক্ষণে?"

"বেলা দেড় প্রহরে।"

"যদি একটু বিলম্ব হয়?"

"একটু বিলম্বে মানুষের প্রাণ যায় না।"

"আচ্ছা! তুমি একটু আরাম কর, আমি আসিতেছি।"

হাবিলদার চলিয়া গেলেন, ক্ষণে ক্ষণে সময় ছুটিতে লাগিল, দেড় প্রহর উপস্থিত। হাবিলদার আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কিছু আসিয়াছে?" দীর্ঘফুৎকারে চুরুটের ধোঁয়া উড়াইয়া সেনাপতিসাহেব কহিলেন, "এখনও না।"

একজন সওয়ার আসিল। অনেকগুলি পত্র দিল। একে একে সমস্ত পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেনাপতি কহিলেন, "ইহার মধ্যেও কিছুই না। কিন্তু এখন আমি করি কি? রাজা রঘুবর রাও কহিয়া গিয়াছেন, বিংশতি সহস্র মুদ্রা! সে খাতির আমি কিরূপে অগ্রাহ্য করি? যদিও দান নহে, পুরস্কার নহে, শুদ্ধমাত্র ঋণ; তথাপি বিংশতি সহস্র! সে খাতির আমি কিরূপে অগ্রাহ্য করি? তিনি ক্ষমাপত্র আনিবেন। কিন্তু কতক্ষণে আনিবেন, তাহা ত কিছুই জানিতেছি না। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে বিচারালয়ের হুকুম পালন করিতে হইবেই হইবে। জিজ্ঞাসা কর দেখি, সময় কত?"

হাবিলদার কহিলেন, "বেলা দুই প্রহরের দুই দণ্ড বিলম্ব।"

"তবে রাজার কথা মিথ্যা। সৈন্যগণকে সাজিতে বল। আমার অপরাধ নাই, বধ্যভূমিতে আমি যাইতেছি।"

সৈন্যগণ সাজিয়া আসিল। অভিমন্যুবধের সময় যেমন একটী চক্রব্যূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তেমনি একটী দৃঢ় ব্যূহ বিনির্ম্মিত হইল। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ, ধানুকী, ঢালী, সকলেই সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইল।

বেলা দুই প্রহর হইতে অতি অল্প মাত্র বিলম্ব। তথাপি কোন সংবাদ আসিল না। পঞ্চাশজন গোলন্দাজ মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া গুলিবারুদপূর্ণ বন্দুকগুলি লক্ষ্য করিয়া ধরিল। ভূপেশচন্দ্র সেই ব্যূহমধ্যে সমানীত হইলেন। মুখে যেন কোন ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। প্রাণ যাইবে, ইহাতে তিনি যেন কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। অঙ্গে লাল পোষাক ছিল, অযত্নে খুলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ভূতলে জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া করজোড়ে কহিলেন, "জগদীশ! পৃথিবীর দয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ঐ স্বর্গীয় দয়া এখন আমি ভিক্ষা করি।"

হাবিলদারের সঙ্গে আনোয়ার বখ্‌ত বধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত। উদাসনেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া হাবিলদারকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সময় কত?"

"নিকট।"

"কেহ কি আসিয়াছে? সংবাদ কি আসিয়াছে?"

" না।"

নিশ্বাস ফেলিয়া আনোয়ার কহিলেন, "আবার ভাল করিয়া দেখ দেখি, সময় কত?"

"দুই মুহূর্ত্ত বিলম্ব।"

আকাশপানে চাহিয়া আনোয়ার পুনরায় কহিলেন, "আবার দেখ দেখি, মুহূর্ত্ত কত দূর অগ্রসর?"

"এক ছাড়াইয়া একের কাছে।"

নিশ্বাসের সঙ্গে নাসারন্ধ্র হইতে যেন হতাশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। পতাকাহস্তে চারিদিকে নেত্র ঘূর্ণিত করিয়া ত্রস্তকম্পিতস্বরে আনোয়ার বখ্‌ত পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "দূরে কেহ কি আসিতেছে?"

হাবিলদার উত্তর করিলেন, "কেহই না।"

"ঐ না অশ্বের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে?"

ফটকের দিকে কাণ খাড়া করিয়া হাবিলদার কহিলেন, "কিছুই না।"

মস্তক নত করিয়া আনোয়ার বখ্‌ত নিরুত্তর।

একজন বিমর্ষ সেনানী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া ভূপেশচন্দ্রের দুই

চক্ষে বস্ত্র বন্ধন করিল। কাণে কাণে কহিল, "ক্ষমা কর! হুকুমের দাস আমি।"

কাণে কাণে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "ক্ষমার সঙ্গে ধন্যবাদ! জগদীশ্বর তোমার ভাল করিবেন। আমি ত চলিলাম, কিন্তু যাঁহারা যাঁহারা আমার দুঃখে দুঃখিত হইতেছেন, করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই সুপ্রসন্ন হইবেন।"

লোকেরা চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছে। একজন প্রধানপুরুষ সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সস্নেহসম্ভাষণে কহিলেন, "শেষকালে আর কি তোমার কিছু বলিবার কথা আছে?"

বুদ্ধিকে স্থির করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "পৃথিবী হইতে যাইবার সময় পৃথিবীর কথা কিছু বলিয়া যাওয়া আবশ্যক। তোমরা স্থির হইয়া শ্রবণ কর, আমার কিছু বলিবার আছে :—

"আমি ভূপেশচন্দ্র। পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলাম, পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়া চলিলাম। পৃথিবীর বিচারালয় অপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় যেখানে আছে, সেখানে গিয়া আমি দাঁড়াইব। এখানে যে বিচার হইয়াছে, সে বিচার যে সুবিচার নয়, তাহা আমি সেইখানে জানাইব। ঘোরতর নিষ্ঠুর অবিচারে তোমরা আমাকে প্রাণে মারিলে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিশ্বাস রাখিয়া ক্ষণকাল পরে পুনরায় কহিলেন, "অবিচারে তোমরা আমাকে মারিলে, সেই অনন্তদেবের নিকটে আমি ইহা জানাইব। বন্ধুগণ! সঙ্গিগণ! সৈন্যগণ! হিতৈষী প্রিয়মিত্রগণ! শত্রুগণ! সকলে শ্রবণ কর, আমি পৃথিবী হইতে যাইতেছি, একটী স্থান আছে, যেখানে গিয়া নিষ্পাপ লোকেরা জুড়ায়। আমি সেই দেশে যাইতেছি। যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা, জগতের সাক্ষী, তাঁহার কাছে আমি যাইতেছি। আমার চক্ষু তোমরা বাঁধিয়া দিয়াছ, কিন্তু সেই রাজ্যে আমার এই চক্ষু মুক্ত হইয়া হাসিবে। এই চক্ষু তোমাদের দিকে আবার একবার ঘুরিবে। তোমরা সুখে থাক। বন্ধুগণ! সঙ্গিগণ! শত্রুগণ! তোমরা দেখ! আমি চলিলাম।" ভূপেশচন্দ্র আবার স্তম্ভিত। নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিলেন, "মাতাপিতা জানি না;—মৃত্যুকালে উদ্দেশে

তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করি।—আমার একটী প্রাণের বন্ধু আছে; সে বন্ধুকে আমি কোথায় রাখিয়া চলিলাম, তাহা জানিয়া যাইতে পারিলাম না। যদি কেহ আমার হৃদয়ের বন্ধু থাক, যদি দেখা হয়, বলিও, অনন্তধামে সাক্ষাৎ হইবে। বন্ধুগণ! মিত্রগণ! সঙ্গিগণ! শত্রুগণ! জীবনে তোমাদের কাহারো কাছে আমি কোন অপরাধ করি নাই। মরিতে হইবে জানি,—মরিবার ক্ষেত্রে মরিতে আসিয়াছি জানি, কিন্তু এরূপে মরিতে হইবে, ইহা জানিতাম না।" করজোড়ে মিনতি করিয়া, ঊর্দ্ধদিকে নয়ন উত্তোলন করিয়া ভূপেশচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "জগদীশ্বর! তোমার কাছে আমি যাইতেছি। পৃথিবীর লোকের কাছে দয়া ভিক্ষা করিলাম, দয়া পাইলাম না। চাহি না। কিন্তু দয়াময়! আমার অপ্সরাসুন্দরী যেন তোমার দয়াময় নামের কাছে ভিকারিণী হইয়া দয়া ভিক্ষায় বঞ্চিতা না হয়। গোলন্দাজ! গোলন্দাজ! গুলিবর্ষণ কর! আর আমি কথা কহিতে পারি না!"

অভিমন্যুবধের সময় দ্রোণাচার্য্যের চক্রব্যূহে জয়দ্রথকে সম্মুখে রাখিয়া কৌরবেরা যেমন মায়াযুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষাও বিনাযুদ্ধে এই ব্যূহ ভয়ঙ্কর! অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘেরিয়াছিল, ভূপেশচন্দ্রকে পঞ্চাশজন অস্ত্রধারী পরিবেষ্টন করিয়াছে। পঞ্চাশ দিক হইতে পঞ্চাশজনে গুলি করিবার জন্য পঞ্চাশ বন্দুক উত্তোলন করিয়াছে। নাসিকার নিশ্বাস পড়িতে যত বিলম্ব হয়, ভূপেশচন্দ্রের প্রাণবায়ুকে উড়াইয়া লইবার জন্য তত বিলম্বও আর নাই! কিন্তু আশ্চর্য্য! ভূপেশচন্দ্র যখন থামিলেন, তখন আর কাহারও মুখে একটীও বাক্য উচ্চারিত হইল না। যাঁহাদের হৃদয়ে দয়া আছে, তাঁহারা নীরবে অশ্রুপাত করিলেন, যাহারা মায়াদয়ার ত্যজ্যপুত্র, তাহারা করতালি দিয়া হাসিল। দলের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ভূপেশ-চন্দ্রের দিকে বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গোলন্দাজগণকে গভীর গর্জ্জনে আদেশ করিল, "ঠিক্ করিয়া লক্ষ্য কর। সাবধান হইয়া তাগ কর। লক্ষ্য যেন বিফল না হয়। সমস্ত গুলী যেন এককালে বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হয়।" কোন্ ব্যক্তি এই আদেশ করিল, পাঠক মহাশয় হয় ত অনুভবে তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। সেই ব্যক্তির নাম মহাপাতকী লিঙ্গেশ্বর।

এই স্থলে একটী আভাস রাখা কর্ত্তব্য বোধ হইল। পঞ্চাশ বন্দুকের

মধ্যে উনপঞ্চাশটীতে গুলী পূর্ণ। একটীতে কেবল শূন্যগর্ভ বারুদ। লিঙ্গেশ্বর পুনঃপুন আদেশ করিতেছে, কিন্তু গোলন্দাজদিগের হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে না। তাহারা মনে মনে ভাবিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা বৈরীপক্ষ নিধন করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু এরূপে অকারণে একজন স্বদেশীয় স্বজাতীয় ভ্রাতার জীবন হরণ করা ভয়ঙ্কর পাপের কার্য্য। ছার দাসত্বের অনুরোধে কি আমরা নরহত্যা করিব? বিনা অপরাধে একজন নিষ্পাপ সাধুলোককে খুন করিব? মনে মনে তাহারা এইরূপ ভাবিল, কাজেও হয় ত সেইরূপই করিতে পারিত, হস্তমুষ্টি হইতে হয় ত সেই প্রাণঘাতক সাংঘাতিক অস্ত্র ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে পারিত, কিন্তু সাহস করিল না। তাহাদের হৃদয়ে যে দয়া আছে, বড় বড় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের হৃদয়ে সেরূপ দয়ার যৎসামান্য অণুপরমাণুমাত্র অংশ নাই!

বধ্যভূমি নিস্তব্ধ। ভয়ানক নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধ যে, সেই কঠিন মাটীতে উপর হইতে একটী সূচি পড়িলেও তাহার শব্দ শুনা যাইত। লোকেরা যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আকাশের বাতাস পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ। লোকের নাসিকার নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ। ক্ষণকাল পরেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ। সে ভঙ্গ কি প্রকারে? মানুষের নিশ্বাসে নিশ্বাসে; দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাসে। যে সকল মানুষ, মানুষের প্রাণদণ্ড দেখিতে ভালবাসে, সচরাচর তাহারাই প্রায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে, সকলেই হৃদয়শূন্য, এরূপ অনুমান করা যায় না। ভূপেশচন্দ্রের আসন্ন কাল। লহমামাত্র অপেক্ষা। লহমামাত্রে তাঁহার জীবনবায়ু অগ্নিধূমের সহিত অনন্ত বাতাসে অনন্ত আকাশপথে উড়িয়া যাইতে পারে, তথাপি সেই মৃত্যুকালে তাঁহার প্রশান্ত অটলভাব দর্শনে, অকাতর সতেজ উপাসনার সঙ্গে বক্তৃতা শ্রবণে জনকতক লোক ছাড়া সকলেরই হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইল। অনেকেরই চক্ষে বারিপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। কেহ কেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল, কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সাক্ষাৎ নরকের পিশাচস্বরূপ দুরন্ত লিঙ্গেশ্বর সে অবস্থাতেও তখনও হুকুম দিতেছে, "ঠিক্ করিয়া তাগ্ কর।"

অকস্মাৎ শিবিরের দ্বারদেশে দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ শ্রুতিগোচর

হইল। এক ব্যক্তি উচ্চ চীৎকারস্বরে কহিলেন, "দ্বার মুক্ত কর।" সেনার অধ্যক্ষেরা আদেশের আভাসে বুঝিতে পারিলেন, কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজ-পুরুষের স্বর। তৎক্ষণাৎ শিবিরের ফটকের প্রকাণ্ড কবাট অবাধে উদ্ঘাটিত হইল। অশ্বারোহী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক্ যেন ঘূর্ণাবায়ুর মত কখনও স্তম্ভিত, কখনও বহির্গত হইতেছিল; বাহন অশ্বটী সওয়ার অপেক্ষাও পরিশ্রান্ত। রক্তবর্ণ উচ্চ কলেবর ঘর্ম্মবারিতে অভিষিক্ত; চক্ষু যেন শিবনেত্রের মত সমুত্থান। মুখে রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ। নিশ্বাসে যেন ঝড়। পুচ্ছ ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত, ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত। সেই পরিশ্রান্ত আরোহী ব্যগ্রপদে ভীম তরবারিহস্তে ভূমিতলে অবরোহণ করিলেন। নয়নের ইঙ্গিতে একজন লোক সেই ঘর্ম্মাক্ত ঘোটককে একটু দূরে বিশ্রাম করাইতে লইয়া গেল।

গোলন্দাজেরা তখন মুখামুখী গুলী করিতে প্রস্তুত। পলকমাত্র বিলম্ব হইলেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়। প্রবেশকারী রাজপুরুষ বিমুক্ত তরবারি হস্তে বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতগতিতে বামে দক্ষিণে কোন দিকে নয়ন না দিয়াই দ্রুতবেগে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই দিকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া ভীমস্বরে গোলন্দাজগণকে আদেশ করিলেন, "থাম! আমি দিল্লী হইতে আসিতেছি। এই ভূপেশচন্দ্র নিরপরাধী।"

সকলেই অবাক। কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই নবাগত রাজপুরুষ শীঘ্রগতি নিকটে গিয়া স্বহস্তে ভূপেশচন্দ্রের চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিলেন। সস্নেহে হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। কাণে কাণে কহিলেন, "পরমেশ্বর রক্ষা করিয়াছেন!"—ভূপেশচন্দ্র উদাসনেত্রে সেই আগন্তুক রাজপুরুষের বদন নিরীক্ষণ কবিলেন। ঝন্ঝন্শব্দে গোলন্দাজদলের হস্তের অস্ত্র ভূতলে পড়িয়া গেল। সে সময় কত লোকের মনে যে, কতপ্রকার ভাবের উদয়, তাহা লেখনীমুখে বর্ণনা করা দুরূহ, রসনামুখে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, অনুভবেও বুঝাইয়া দেওয়া সহজ কথা নহে। পূর্ব্বে যেরূপ নিস্তব্ধতা শিবিরের প্রাঙ্গণ অধিকার করিয়াছিল, এখনও অবিকল তদ্রূপ। দৃশ্য দর্শনে যাঁহাদের হৃদয়ে করুণভাবের আবির্ভাব হইতেছিল, তাঁহাদের যে তখন কতদূর আনন্দ, তাঁহারাই তাহা জানেন।

তাঁহাদের আত্মাই তখন তাহা অনুভব করিল। কিন্তু মনে মনে তর্কবিতর্ক, লোকটা কে?

সমারোহ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া সেই লোকটীর পদতলে নিপতিত হইতে যাইতেছিলেন, শশব্যস্তে আলিঙ্গন করিয়া তিনি সস্নেহবচনে কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাই যে, এই ঘটনার সঙ্গে গাঁথা, ক্রমে ক্রমে তাহা আমরা জানিতে পারিব। তোমাকে আর দাসত্বজালে বন্দী থাকিতে হইবে না। এখন চল, তোমার আবাসস্থানে গমন করি। বিরলে অনেক কথা আছে।" আনোয়ার বখ্‌ত আর লিঙ্গেশ্বর কটমট্‌চক্ষে তাহাদের উভয়ের প্রতি বিশাল বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। আগন্তুক রাজপুরুষ তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাচ্ছিল্যভাবে একখণ্ড কাগজ আনোয়ার বখ্‌তের সম্মুখভাগে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আনোয়ার বখ্‌ত সেই পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া তাহাতে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চমকিত হইয়া উঠিলেন। মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। চক্ষু যেন পাগলের চক্ষের ন্যায় বিকৃতভাব ধারণ করিল। একটু নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। ললাটের দিকে বাম হস্তের অঙ্গুলি ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সেই রাজপুরুষ কহিলেন, "আনোয়ার! তোমরা যে কার্য্য করিয়াছ, সে কার্য্যের উচিত পুরস্কার পৃথিবীতে নাই। যদি এমন কোন লোক থাকে, যেখানে নারকী লোকের যাবজ্জীবনের মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে, সেই লোকেই তোমাদের বিচার হইবে। আর এই যে লিঙ্গেশ্বর, যাহাকে তোমরা পঞ্জাবী সিপাহী বলিয়া জানিতেছ, এই লোক তোমার সঙ্গে সেই পুরীতে যাইবে। ইহাকে আমি ভাল জানি। ইহার নাম লেকায়ৎ খাঁ। কান্দাহারী পাঠান। ইহাকে তোমরা বিশ্বাস করিয়া যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছ, সে কার্য্যের উপযুক্ত এই লোকই যথার্থ। গাঁটকাটা অবধি নরহত্যা পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দুষ্কর্ম্মই ইহার বাকী নাই। দিন আসিবে,—আমিও হয় ত,—যদি জীবনে কুলায়,—আমিও হয় ত সেই দিনে সাক্ষী হইয়া এই দুরাত্মার সমস্ত পাপের পরিচয় প্রদান করিতে পারিব। আর তুমি আনোয়ার বখ্‌ত! যে জন্য তুমি চক্ষুভঙ্গী করিতেছিলে, তাহাও আমি বুঝিয়াছি। ঐ দিয়াছি, অপরাধ ক্ষমার পরোয়ানা।

যদি তোমরা অপরাধ বলিতে চাও, বলিতে পার, কিন্তু আমি বলিব, নিরপরাধির ধর্ম্মবলে মুক্তি। শোন আনোয়ার বখত! তুমি আমাকে জান না, আমি তোমাকে জানি। আর একবার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি বাঁচিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত জগতের লোকে দেখিতে পাইবে। মরিও না, আত্মহত্যা করিও না, অহঙ্কারকে ছোট করিও না, যেমন অহঙ্কার, যেমন হিংসা,—যেমন দর্প, তোমার বুকে জলে, তেমনি জ্বলুক, নিবাইয়া দিও না, শেষদিনে আমি দেখিব। তোমাকে দেখিব, লেকায়ৎ খাঁকে দেখিব, আর আর যাহারা যাহারা এই নরকের দাস, তাহাদের সকলকেই দেখিব। তুষানলে পুড়াইব। ভূপেশচন্দ্রকে লইয়া এখন আমি চলিলাম।"

সমারোহ ভঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু লোকেরা বাহির হয় নাই। গোলমাল কিছুই নাই। সমস্ত লোক চক্ষু বিকাশ করিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে। আগন্তুক কহিলেন, "আনোয়ার! তুমি বোধ হয় এই শিবিরের কর্ত্তা, আর একটী অশ্ব দাও, আমার সঙ্গে কেবল একটীমাত্র অশ্ব আছে।"

ক্রোধে অহঙ্কারে আনোয়ার বখত কহিলেন, "আমার অশ্ব নাই।"

"নাই? আচ্ছা! তুমি অশ্ব হও! ভূপেশচন্দ্রকে স্কন্ধে করিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দাও।"

এ আবার কি?—কথা ভঙ্গ হইয়া গেল।—কর্দ্দমাক্তকলেবর আটজন বাহক একখানা তক্তা মাথায় করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে শিবিরের ফটকে উপস্থিত হইল। বিস্ময়াকুল লোচনে শিবিরের সমস্ত লোক সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। বাহকেরা ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, হুকুম না পাইলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া নূতন প্রবেশকারী তাহাদিগকে ভিতরে আহ্বান করিলেন। তাহারা প্রবেশ করিল। আহ্বানকর্ত্তা শান্তভাবে আদেশ করিলেন, "কি আনিয়াছ, এইখানে নামাও।"

লোকেরা আজ্ঞা পালন করিল। আধারের উপরে যাহা ছিল, তাহা বসনাবৃত। বহুজনাকীর্ণ জনপদে কোন প্রকার তামাসা আসিলে লোকে যেমন ভিড় ঠেলিয়া সেই দিকে মুখ বাড়াইয়া থাকে, শিবিরের মহাজনতা

সেইরূপে সেই তক্তার দিকে স্থিরনেত্রে মুখ বাড়াইয়া রহিল। মহাকৌতূহল, মহা আগ্রহ। কি আসিয়াছে, কি আছে, দেখিবার বাসনা। ঘরে আগুন লাগিলে বাহিরের লোকে যেমন ব্যস্ত হয়, সেইরূপ জ্বলন্ত কৌতূহল।

আচ্ছাদনবসন উন্মুক্ত হইল। তিনজন লোক লাফাইয়া উঠিল। "এ কি? এ কে?—কারা এরা?—স্বর্গভূষণ!—কি এ!—স্বর্গভূষণ মরা!—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা!—এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!—এ কি ভয়ানক কাণ্ড!—এমন কাজ কে করিল! আবার এ কে? ইহার বক্ষেও রক্তধারা বহিতেছে! প্রায় অজ্ঞান। কিন্তু হাতপা নাড়িতেছে। মরে নাই। স্বর্গভূষণ মরিয়াছে। কে মারিয়া ফেলিল? এ লোকটা কে?"

স্বভাবতঃ সকলেই এমন স্থলে এই প্রকার বিস্ময়সূচক প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়! আপনি কি এই দুই মূর্ত্তি চিনিতে পারিতেছেন? শুনিলেন, মরামূর্ত্তি স্বর্গভূষণের। স্বর্গভূষণ মরিয়াছে। কে তাহাকে খুন করিয়াছে? তলোয়ারের চোটে মাথার আধখানা যেন ফাটিয়া গিয়াছে। শরীরের ঠাঁই ঠাঁই ত্রিশ চল্লিশ আঘাত। যাহারা অধিক দিন না দেখিয়াছে, সেই খণ্ডখণ্ড দেহ দেখিয়া তাহারা কখনই চিনিতে পারে না যে, এ কে। ভাল পরিচিত ছিল যাহারা, তাহারা চিনিল, স্বর্গভূষণ। কে কি অপরাধে তাহাকে খুন করিয়াছে, কেহই তাহা অনুধাবন করিতে পারিল না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কে? তাহাকেই বা অস্ত্রাঘাত করিল কে? জনকতক লোকের মুখে সবিস্ময়ে উচ্চারিত হইল, "বিতাস্থ, বিতাস্থ, বিতাস্থ! এই লোকটা সেই বিতাস্থ।" দর্শকদলের মধ্যে একজন সেই বিতাস্থর মুখের কাছে হুমড়ি খাইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "কাহার নাম বিতাস্থ? এলোক যে মুসলমান। ইহার নাম বিষবখ্‌ত হোসেন।

সকলেই মহাবিস্ময়াপন্ন। সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে যতদূর বিস্ময়, বিতাস্থর পরিচয় শ্রবণে তদপেক্ষা যেন অধিকতর বিস্ময়। যে লোক নূতন নামে নূতন জাতিতে বিতাস্থর পরিচয় দিল, সেই লোক আরও কহিল, "আমি বোধ করি, এই বদ্‌মাস বিষবখ্‌তই এই লোকটাকে,—তোমরা যাহাকে স্বর্গভূষণ বলিয়াছ,—আমি বোধ করি, এই বিষবখ্‌তই তাহাকে খুন করিয়াছে।" ভিড়কে একটু তফাত করিয়া ভূপেশচন্দ্রের রক্ষাকর্ত্তা সেই নূতন

সমাগত রাজপুরুষ ধীরধীরপদে শবাধারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণভূষণকে তিনি চিনিতেন, চিনিতে পারিলেন। নিকটে যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া তক্তাশায়ী সেই জীবিত লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? তোমার এ দুর্দ্দশা কে করিল? এই রাজ-পুত্রকে কে সংহার করিল?"

ভূপেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। যে লোক অস্ত্রাহত, দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রতি ঘৃণাগরলমিশ্রিত কটাক্ষবিক্ষেপে তাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "তুই? তুই রাক্ষস! তুই মরিতেছিস? মরণ ত ভাল হইতেছে না। এ রকমে যদি তোর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত ধর্ম্মের মহিমা থাকিবে না। বিতাস্থ! তুই কেন এখানে? আমার মরণ দেখিতে বুঝি আসিতেছিলি? কিন্তু দেখ্, সম্মুখে এই দেখ্, আমি রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণশশধরের ন্যায় সুপ্রকাশ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিপ্রকারে হয়, তাহা দেখিবার জন্যই আমি বাঁচিয়া রহিলাম। কালসর্পের বিষাক্ত কবল হইতে আমি তোকে রক্ষা করিয়াছি। আমার অর্থে বিষচিকিৎসক তোকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। তথাপি তুই কৃতঘ্ন! আমার প্রতি দারুণ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত নহিস্। আচ্ছা, দেশের বিচারকর্ত্তা একজন আছেন, তিনিই ইহার সত্য বিচার করিবেন।" সেই অশ্বারোহীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সদর্পস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বীরবর! মিত্রবর! আমার হস্তে তলোয়ার দাও,—না,—দিও না। তুমি বীরকুমার, ক্ষত্রিয়কুমার, তোমার অস্ত্র তোমার কাছেই থাকুক, ঘন ঘন পদাঘাতে এই পিশাচের অঙ্গীকারবাক্য একে একে আমি গ্রহণ করিব।" কথা বলিতে বলিতে সজোরে বিতাস্থর মুখে এক পদাঘাত করিলেন। ঘৃণা যেন চপলা হইয়া, ক্রোধমেঘের সহিত উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করিয়া, অতি চমৎকার খেলা করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিতাস্থ! এখন জানিলাম তুই মুসলমান। মুসলমানের যে ধর্ম্ম, তাহা তুই পালন করিতে জানিস্, আমি এমন কথা বলি না, কিন্তু মুসলমানের যে নিষ্ঠুরতা বিশ্বপ্রসিদ্ধ, তাহা পালন করিতে তুই ভাল জানিস্। বিতাস্থ!—না, তোকে বিতাস্থ বলিব না,—বিষবৃক্ষ! তুই না আমার অপ্সরাসুন্দরীকে পত্র লিখিয়াছিলি? প্রাণান্ত পর্য্যন্ত তুই না আমার চিরবৈরী? এখন

স্মরণ করিয়া দেখ, কোথা হইতে কোথাকার দণ্ড তোর মস্তকে আসিয়া নিপতিত হইল। স্বর্গে একজন দেবতা আছেন, তাঁহার যে কত চক্ষু, কত কর্ণ, পৃথিবীর লোকে তাহা জানেন না। তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী। পাপীলোকেরা দণ্ডে দণ্ডে দেখিতে পায়;—

ভীমকায় ধর্ম্মরাজ যমদণ্ডধারী।

কিন্তু পাপিষ্ঠ! সেই মূর্ত্তি ত তাঁহারি নয়; সে মূর্ত্তি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পরাৎপর জগদীশ্বরের! তিনি ত্রিলোকের রাজা, মহামহেন্দ্র, জগৎপ্রতিপালক, জগতের পিতা, জগন্ময় জগন্নাথ। তাঁহার দণ্ডে মহাপাপীর নিষ্কৃতি নাই। আমি মরিতেছিলাম, সেই সর্ব্বজীবেশ্বর আমারে জীবন ভিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু বিষবখ্‌ত! তুই আমারে যতবার যতপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়াছিস্, বিশ্বাসঘাতক! সব কথা আমার মনে আছে; কিন্তু এখন তোর নিস্তারকর্ত্তা কে? স্বর্গভূষণ আমার শত্রু, তাহা জানি, অনেক দিন জানিতাম,—এখনও জানি; কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারিবার আমার অভিলাষ ছিল না। সেই স্বর্গভূষণ এই অসময়ে আমারই চক্ষের সমীপে শবরূপে দৃশ্যমান। বিষবখ্‌ত! এ গুপ্তহত্যার গুপ্তহন্তা কে? শত্রুকে আমি ক্ষমা করিতে জানি। ইচ্ছা করিলে এক পদাঘাতে কিম্বা এক মুষ্ট্যাঘাতে স্বর্গভূষণকে আমি যমালয়ে পাঠাইতে পারিতাম; কিন্তু বিষবখ্‌ত! এই স্বর্গভূষণ একজন সম্ভ্রান্ত রাজার বংশধর সন্তান। ইহাকে প্রাণে মারিয়া আমার কোন বাসনাই চরিতার্থ হইত না। দুষ্টলোকে যত দৌরাত্ম্য করিতে পারে, করুক, আমি তাহাদের কোন অনিষ্ট করিব না, এই আমার ব্রত। কিন্তু বিষবখ্‌ত! এই রাজকুমারকে খুন করিল কে? একসঙ্গে তোরা সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছিস্, ইহা দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে,—কেবল সন্দেহ নয়—পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে, তুই!—তুই নরহন্তা রাক্ষস। তুই-ই ইহাকে খুন করিয়াছিস্। এখনও সত্যকথা বলিলে আমি তোরে ক্ষমা করিতে পারি। সত্যকথা গোপন করিলে, দুইশত কুকুর আমার আদেশে এই মুহূর্ত্তে তোর ঐ পাপদেহের রক্ত পান করিবে, পাপমাংস, পাপঅস্থি চিবাইয়া খাইবে।"

বিতাস্থ কাঁপিল। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "রাজকুমার।"

"এ কি আশ্চর্য্য কথা? তুই জানিস্ আমি রাজকুমার?" সবিস্ময়ে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তুই জানিস্ আমি রাজকুমার?"

"সব জানি। তুমি আশুতোষ! তোমার উপর আমি অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছি, বুদ্ধির দোষেও করিয়াছি, দরিদ্রতার পীড়নেও করিয়াছি। কিন্তু এখন রাজকুমার! আমার জীবনের গতি কি হইবে?"

"আমি তাহা কিরূপে বলিব? আমি বিদেশী, আমি এদেশের রাজা নই, এখন আর হিন্দুরাজত্ব নাই, মোগলবংশের শেষ রাজা, মহামহিম আকবরশাহের শেষবংশদীপ এখনও দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজমান। মহম্মদশাহ,—না,—কি নাম জানি না,—বাহাদুর শাহ,—না,—আলমগীর শাহ। তিনিই ইহার বিচার করিবেন। সমুদ্রপার হইতে অনেক সাহেব এদেশে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এখনও আকবরের নামে দিল্লীর সিংহাসনের নিকটে সেলাম করেন। আমরা সেই দিল্লীর বাদ্‌শাহের অধীন রাজা। চূড়ান্ত বিচারে আমাদের কোন অধিকার নাই। তথাপি পদাঘাতে পদাঘাতে তোরে আমি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি।"

"রাজকুমার! আমার বুকে রক্ত পড়িতেছে, কুকুরের তলোয়ার আমার এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছে। এখনও আমি বাঁচিয়া আছি। তুমি কি ক্ষমা করিতে পারিবে না রাজকুমার? তুমি কি আমার জীবন ভিক্ষা দিতে পারিবে না রাজকুমার?"

"ক্ষমা করিতে আমি ভাল জানি,—বারম্বার বলিতেছি, ক্ষমা করিতে আমি ভাল জানি; মানুষ মারিতে আমি জানি না। কিন্তু বিষবখ্‌ত! সত্য করিয়া বল্, এই রাজপুত্রকে খুন করিয়াছে কে?"

লাফাইয়া আনোয়ার বখ্‌ত সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তুমি খালাস পাইয়াছ, চলিয়া যাও। বিদেশী লোককে অত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পীড়ন করিবার তুমি কে?"

অশ্বারোহী বীরপুরুষ আরক্তলোচনে আনোয়ারের দিকে চাহিয়া জলদ-গর্জ্জনস্বরে কহিলেন, "খাড়া রও! আনোয়ার! বাদ্‌শাহের আদেশ, তোমাকে কেহ মধ্যস্থ মানিতেছে না। খাড়া রও। আমরা আসামীর একরার লইব। বিচারের কথায় কথা কহিবার তুমি কে? জান তুমি, যদিও

দিল্লীর সম্ভ্রম কমিয়া গিয়াছে, যদিও রাজসিংহাসনে বাবরশাহ নাই, মোগল-বংশের উজ্জ্বল হীরক আকবরশাহ নাই, যদিও সেই কুলের কুলপ্রদীপ জাহাঁগীরশাহ নাই, যদিও দুষ্টদলন সাহজাঁহা এখন আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া নাই, যদিও মহাবলদর্পিত প্রবলপ্রতাপ আলমগীর ঔরঙ্গজেব পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তথাপি হস্তিনাপুরীতে মোগলবংশ আছে।"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বিষবখ্ত! বিচার আসিবে, বিচারের দিন আসিবে। এখনও সত্য করিয়া বল্, রাজপুত্রকে খুন করিয়াছে কে? আমি সত্যের বড় আদর করি। তুমি সত্যকথা কও, ক্ষমা পাইবে। মিথ্যাকথা কও, কুকুরে খাইবে। তোমরা আমাকে এতদিন যত ছোট বলিয়া জানিয়াছিলে, সত্য সত্য তত ছোট আমি নই। তোমাদের আনোয়ার বখ্ত, তোমাদের আরও উচ্চ সেনাপতি, তোমাদের আরও উচ্চ দিল্লীর বাদশাহ আমার নামে একদিন কাঁপিতে পারিবেন। কিন্তু বিষবখ্ত! পাপাশয় দস্যু! সত্যকথা গোপন করিও না। আমার হস্তে তলোয়ার নাই, অন্য কোন বীরপুরুষের তলোয়ার আমি গ্রহণ করিব না ; কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা যে যে অস্ত্রে আমারে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কাছে অন্য অস্ত্র অতি সামান্য। বাঁচিবার যদি সাধ থাকে, সত্যকথা কও।"

"আমি?"

"হাঁ, তুমি।"

"আমি কি সত্যকথা বলিব?"

"ভূপেশচন্দ্রের পদাঘাতকে ভয় কর না?"

"বলিতে বল বলি, কিন্তু কি বলিতে হইবে?"

"বলিতে হইবে এই কথা, একদিকে তোমার মস্তক, একদিকে সত্য। স্বর্গভূষণকে কাটিয়াছে কে? তোমার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে কে?"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে বিতাসু উত্তর করিল, "প্রাণে যদি না মার, তাহা হইলে আমি দুঃখের কথা বলি।"

"দুঃখের কথা? পাপিষ্ঠ পিশাচ! এখনও এতদূর চাতুরী? যম তোরে আহ্বান করিতেছেন। ছলনা শঠতা ছাড়িয়া দে, এখানে হাকিম নাই, কিন্তু একদিন হাকিমান্ত হইবে।"

নীরবে কত কি ভাবিয়া ভাবিয়া বিতাস্থ কহিল, "স্বর্গভূষণ আপনি মরিয়াছে।"

"আচ্ছা! স্বর্গভূষণ আপনি মরিয়াছে, ইহার সঙ্গে তুমি কেন?"

"ইহার সঙ্গে টাকা ছিল।"

"তোমার তাহাতে কি?"

"টাকায় আমার প্রয়োজন ছিল।"

"তবে তুমি সেই জন্যই স্বর্গভূষণকে খুন করিয়াছ?"

"তা কেন? তাহা হইলে আমার গায়ে তলোয়ারের দাগ কেন? আমার বুকে রক্ত কেন? আমি কাহাকেও খুন করি নাই।"

"ফের মিথ্যাকথা? নিশ্চয় জানিতেছি, অর্থের লোভে স্বর্গভূষণকে তুই খুন করিয়াছিস্। নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিলি,—তুইও নদীতে পড়িয়াছিলি, কাদামাখা শরীরে নদীতীরের কৃষকেরা তোদের দুজনকে তুলিয়া আনিয়াছে। তলোয়ার,—তলোয়ার কি হইল? নিহত রাজপুত্রের তলোয়ারের খাপ খালি হইয়া ঝুলিতেছে। কারণ কি? তলোয়ার কোথায় গেল? কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিস্?"

কাঁপিতে কাঁপিতে বিতাস্থ কহিল, "অন্ধকার রাত্রের কথা যদি তোমরা জানিতে পারিয়া থাক, অস্বীকার করিলে তবে আমি ঠকিব। প্রাণে মারিও না। স্বীকার করিতেছি, টাকার লোভে স্বর্গভূষণকে আমিই তলোয়ার মারিয়াছি।"

"টাকা?"

"সেই কথাই ত কথা! টাকা আমি লইয়াছি। তলোয়ার জলে ফেলিয়া দিয়াছি। স্বর্গভূষণ মরিয়াছে, ইহা আমি জানি না। নিশ্বাস দেখিয়াছি।"

"টাকা কোথায়?"

"নদীর ধারে বালীর নীচে।"

"স্বর্গভূষণের উপর তোমার কোন আক্রোশ ছিল?"

"কিছুমাত্র না, বরং বন্ধুত্ব ছিল।"

"তবে এমন হইল কেন?"

"জান না বুঝি? রাণী জগৎকুমারী একদিন আমাকে কহিয়াছিলেন,

স্বর্ণভূষণকে আমার সঙ্গে যদি তুমি দেখা করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

আগন্তুক রাজপুরুষ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগৎকুমারীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? স্বর্ণভূষণের সঙ্গেই বা তাহার কি সম্পর্ক?"

বিভাসু উত্তর করিল না।

ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগৎকুমারী কোথায়?"

বিভাসু কহিল, "পঞ্জাবে।"

"তুমি তাহা কিরূপে জানিলে?"

"আমি তর্কে তর্কে ছিলাম। টাকার লোভে যখন স্বর্ণভূষণকে মারিতে যাই, স্বর্ণভূষণ তখন দুই বার আমার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল। নির্ঘাত প্রহার সহ্য করিয়াও প্রতিহিংসাবশে আমি কহিয়াছিলাম, পত্রখানি দাও,—টাকাগুলি দাও—মিহিরমোহিনী তোমার ভগ্নী—মিহিরমোহিনী কলঙ্কিনী, জগৎকুমারী নামে মিহিরমোহিনীই রাজা বিরাটকেতুর রাণী, সংসারকে আমি ইহা শুনাইয়া দিব। কথা শুনিয়া স্বর্ণভূষণ আবার আমাকে কাটিতে আসিয়াছিল। তলোয়ার কাড়িয়া লইয়া আমি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছি। তাহার পর কি হইয়াছে, মনে পড়ে না। কিন্তু বোধ করি, মরে নাই। যেখানে মারিলে মরে, সেখানে আমি একবারও অস্ত্রাঘাত করি নাই।"

"সব কথা শুনা হইয়াছে; অধিক আর কিছু শুনিবার নাই। এই নরঘাতক বিভাসু আপনার মুখেই স্বীকার করিতেছে, নরহন্তা। স্বর্ণভূষণকে এই দুরাত্মাই খুন করিয়াছে। ইহাতে আর তিলমাত্র,—বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।"

ভূপেশচন্দ্র আরও যেন কি কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, নূতন রাজপুরুষ আরক্তবদনে কিছু যেন বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ একজন অশ্বারোহী প্রবেশ করিলেন। অশ্ব বাহিরে রহিল না, বায়ুগতিতে একবারে শিবিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। মুখে পুঞ্জপুঞ্জ ফেনরাশি। জোর বাতাসের মত নির্শ্বাস। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম। জিহ্বা বহির্গত। অশ্বারোহীও

প্রায় তদনুরূপ পরিশ্রান্ত। নদীতীরে স্বর্গভূষণ যখন অশ্ব হইতে পতিত হন, অশ্ব তখন যেন এক প্রকার পাগল। পৃষ্ঠ হইতে সওয়ার পড়িয়া গেল, রাক্ষসাকার একটা লোক লম্ফ দিয়া সম্মুখে আসিয়া লাগাম ধরিল, মূর্খ ঘোড়া তখন আর কোন্ পথ দেখে; ঘরমুখেই দৌড়।—পাঠক-মহাশয়ের জানা আছে, ঘোড়াটী স্বর্গভূষণের নিজের ছিল না। ঘোড়া তাঁহার পিতার। গরু, ঘোড়া, কুকুর, বেরাল, আর পোষাপাখী, মানুষের মত বাড়ী চেনে। উন্মত্তপ্রায় সেই অশ্ব ভয় পাইয়া সওয়ার ফেলিয়া জোরে লাগাম ছাড়াইয়া রাজা রঘুবরের আস্তাবলে ছুটিয়া গেল। রাজা জানিলেন, একটা অশ্ব ছুটিয়া আসিতেছে। ভূপেশের চিন্তায় আর পুত্রের চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। মহা উদ্বেগ, মহা উৎকণ্ঠা, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার অন্তরাত্মাকে যেন দগ্ধ করিতেছিল, শশব্যস্তে নীচে আসিয়া মন্দুরায় প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, সেই অশ্ব। যে অশ্ব সাজাইয়া তিনি ভূপেশচন্দ্রের উদ্ধারের জন্য স্বর্গভূষণকে সৈনিকশিবিরে পাঠাইয়াছিলেন, সওয়ারশূন্য হইয়া সেই অশ্ব ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে উদ্বেগ তাঁহাকে জ্বালাইতেছিল, সেই উদ্বেগ আরও যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিষাক্ত অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। কবি বলেন, চিন্তানল। আগুনের সঙ্গে চিন্তার উপমা হয়। অনলরূপিণী যে চিন্তা, তাহার আর একটী নাম উৎকণ্ঠা। ইহাও অগ্নি, ইহাও মানুষকে দাহ করিতে পারে। রাজা রঘুবর বাহাদুরের অন্তর-কানন হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এ আগুনের নাম দাবানল। রাজা রঘুবরের সুখের সময় তাঁহার হৃদয়ে একটী শান্তি-সাগর বাস করিত; সেই সাগরে আগুন জ্বলিতেছে। সে আগুনের নাম বাড়বানল। চিন্তা করিবার অবসর ছিল না, কিন্তু আশা-চপলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া একবার চমকিয়া গেল। তিনি মনে করিলেন, তবে হয় ত স্বর্গভূষণ শিবিরে গিয়াছে। তবে হয় ত ভূপেশচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু চপলা কতক্ষণ থাকে? আবার অন্ধকার। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজা রঘুবর রাও তৎক্ষণাৎ শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিবিরে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই রাজা রঘুবর রাও।

অসম্ভব জনতা। অনেক লোক একত্র। সকল লোকের মুখেই বিষাদচিহ্ন

অঙ্কিত। যাহারা দলের লোক, তাহারা সকলেই হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া আছে; যাহারা বাহিরের লোক, যাহাবা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাঁহাবাও গুম হইয়া নিস্তব্ধ।

রাজা রঘুবর কহিলেন, "আমার স্বর্গভূষণ কোথায়?"

কেহ উত্তর কবিল না।

"ভূপেশচন্দ্রের কি প্রাণ রক্ষা হইয়াছে?"

কেহই উত্তর দিল না।

করজোড় করিয়া সম্মুখে গিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু—কিন্তু—"

শঙ্কাকুলচিত্তে রাজা রঘুবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি ভূপেশ?"

"মহারাজ। আপনি মনে করিতে পারেন, বিতাস্থ নামে এক ব্যক্তি আপনার পরমবন্ধু ছিল। আমাকে আপনাবা ঘৃণা করিতেন, যাহাতে আমার অপমান হয়, লোকসমাজে যাহাতে আমি অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ হই, আপনি মহারাজ। সে চেষ্টা করিতেন, জানি। কিছুই ভুলি নাই, সব মনে আছে, সব জানি, কিন্তু মহারাজ। আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল, আপনার পুত্র স্বর্গভূষণ সেই কুচক্রেব সৃষ্টিকর্ত্তা; মহারাজ। মনে আছে, শুনিয়াছি। আকাশের বাতাস আমাকে বলিয়া দিয়াছে। আপনি মহারাজ! সেই আগুনে বাতাস দিয়াছেন, আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ফিনকুটী আগুনে বাতাস পাইলেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। মহাবাজ। আমি মরিলে আপনার আনন্দ হইত। কিন্তু আহা। দেবলীলা কতবড আশ্চর্য্য! আমি মরি নাই। মহারাজ। বড দুঃখের কথা, নিবপরাধীকে অপরাধী করিয়া যাহারা প্রাণে মাবিতে চায়, তাহাদের ভাল হয় না। কখনই মহারাজ!—"

নবাগত রাজপুরুষ দেখিলেন, ভূপেশচন্দ্রের মহা উত্তেজিতভাব। হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পার্শ্বে সবাইয়া রাজা রঘুববের সম্মুখে তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান হইলেন। বিনীতবচনে কহিলেন, "মহারাজ। পরিচয়ে জানিলাম, আপনারই নাম মহাবাজ রঘুবব রাও বাহাদুর। অভিবাদন করি, অপরিচিত হইয়া সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইতেছি, ক্ষমা করুন।

আপনি আমাকে চিনিবেন না, কিন্তু মহারাজ! অনিচ্ছায় আমাকে একটী অপ্রিয় কথা বলিতে হইতেছে। বিনাদোষে যাহারা কোন পবিত্রস্বভাবে কলঙ্কারোপ করিয়া মিথ্যা বৈরনির্য্যাতনে অনুরাগী হয়, সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা অলক্ষিতে থাকিয়া সেই সকল ক্রূরলোকের সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। আপনার পুত্র স্বর্গভূষণ নিরীহ ভূপেশচন্দ্রকে শত্রু ভাবিতেন, কুমার ভূপেশচন্দ্র কিন্তু তাঁহাকে শত্রু বলিয়া জানিতেন না। কিন্তু মহারাজ! সেই স্বর্গভূষণ টাকার অহঙ্কারে পদে পদে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেন; অনেক যন্ত্রণা দিয়াছেন, মিথ্যাকে মাথায় রাখিয়া সত্যকে পদতলে দলন করিয়াছেন। কিন্তু হা! হা স্বর্গভূষণ!—"

রাজা রঘুবর রাও অশ্ব হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে কট্‌মট্‌চক্ষে ভূপেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া কাতরভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূপেশ! ভূপেশ। প্রাণাধিক্! সূর্য্যবংশের সূর্য্য! আদরের বৎস! তোমাকে আমি চিনিতাম না। রাজকুমার! আঃ! ভূপেশ! তুমি আছ। আঃ! তোমার মঙ্গল!—আঃ! তোমার মঙ্গলকামনা করিয়াই আমি—ভূপেশ! কোলে এসো বৎস! জানিতাম না! উঃ! যন্ত্রণা! যন্ত্রণা! ভীষণ যন্ত্রণা! আমার স্বর্গভূষণ কোথায়?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর দিবেন দিবেন মনে করিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। চক্ষের জল তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক করিল। পূর্ব্বপ্রবেশকারী নবাগত রাজপুরুষ রাজাকে ভূতল হইতে তুলিয়া আশা-চপলার উপদেশে সান্ত্বনাবচনে কহিলেন, "মহারাজ! ভূপেশচন্দ্রের জীবন রক্ষা হইয়াছে। তোমার অন্তরে বেদনা দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিধাতার খেলা! যাহাকে যন্ত্র করিয়া তুমি এই নিরীহ ভূপেশচন্দ্রকে নিধন করিবার বাসনা করিয়াছিলে, সেই পরমহিতৈষী উপকারী বন্ধু, ছদ্ম-রাক্ষসবেশী বিতাস্থ, নূতন সত্য পরিচয়ে যবনকুলাঙ্গার বিষবখ্‌ত হুসেন গতরাত্রে তোমার স্বর্গভূষণকে খুন করিয়াছে! স্বর্গভূষণ নাই! সম্মুখে চাহিয়া দেখ, এই তাহার মৃতদেহ!— সম্মুখে চাহিয়া দেখ, এই তোমাদের ষটচক্রের প্রধান যন্ত্র নরহন্তা বিতাস্থ। মিত্রহস্তে, মিত্র অস্ত্রে সজ্ঞানে রক্তধারাবাহী আহত। স্বর্গভূষণ নাই!"

"কি!—কি!—কি শুনিতেছি! স্বপ্ন!—তুমি!—না,—স্বর্গভূষণ!

ভূপেশচন্দ্র ! বিতাস্থ ! উঃ ! কি। কহারা কি বলে ? আকাশে ও কে উড়িয়া যাইতেছে ? আবার ও কে কথা কহিতেছে ? স্বর্গভূষণ নাই ? ভূপেশচন্দ্র নাই ? আমার অশ্ব নাই ? বিতাস্থ মরে ? বিতাস্থ আহত ? তবে রঘুবর আর কাহার জন্য বাঁচিবে ? আমার টাকা ?"

"টাকা রাজা ? টাকা তোমার নদীতীরের বালীর নীচে আছে। জগৎ-সংসারে সকলের অপেক্ষা তুমি যে টাকা ভালবাস, তাহা আমি জানি। পুত্রশোক অপেক্ষা তোমার যে টাকার শোক অধিক তাহা, আমি বুঝিলাম। কিন্তু দেখ ! এই দেখ,—স্বর্গভূষণ জীবনশূন্য। তোমার হিতৈষী বন্ধু বিতাস্থ তাহাকে খুন করিয়াছে।"

বুক চাপ্‌ড়াইয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া পাগলের মত রক্তনয়নে চাহিয়া রাজা রঘুবর রাও কহিতে লাগিলেন,—কহিতে লাগিলেন আর নাচিতে লাগিলেন,—নাচিতে নাচিতে পুনঃপুন কহিলেন, "হইয়াছে ? হইয়াছে ? সমস্তই ফুরাইয়াছে ? ভূপেশচন্দ্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ? ইহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে ? স্বর্গভূষণ পৌছিতে পারে নাই ? আমার টাকা এখানে আসিতে পারে নাই ? আমার টাকা ! উঃ ! কে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ ? স্বর্গভূষণ ! তুই বাছা একবার কাছে আয়। না,—আমার ভূপেশচন্দ্র কোথায় ? দুঃখিনী অভাগিনী যশেশ্বরীসতীর সেই সর্ব্বস্বধন ভূপেশচন্দ্র কোথায় ? যবনের সেনারা অবিচারে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে ? হা ! তবে আর এ হৃদয়ে ক্ষত্রিয়শোণিত কেন বহমান হয় ? নাম রাখিব না ! ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিব না ! ক্ষত্রিয়বংশে এই রঘুবরের জন্ম হইয়াছিল, লোকে যেন ইহা জানিতে না পারে,—লোকে যেন নাম না করে,—না,—না,—তা কেন ? কে তোমরা ? বিষ দাও ! কুমারী কৃষ্ণকুমারীর মত,—কৃষ্ণকুমারী ত মেয়ে, আমি পুরুষ, বিষ দাও ! আমি কাপুরুষ। বিষ দাও ! বিষ খাইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় হই। উঃ ! ঐ বুঝি সেই ? তাই ত ! আর বিলম্ব সহে না। এই তলোয়ার আমার জীবনান্ত করুক। না,—তাহা করিতে দিব না। ক্ষত্রিয়-তরবারি আত্মহত্যা-কারীর শোণিতে কলঙ্কিত হইবে না। পাপের সহায়তা করিবে না। স্বর্গভূষণ ! হা ! বৎস স্বর্গভূষণ ! তুমি কোথায় গেলে ?"

"কেন তুমি আপনাআপনি পাগল হও রাজা! কপালে যাহা থাকে, তাহাই ফলে। দুষ্টবুদ্ধি তোমাকে এতকাল দুষ্টচক্রে ঘুরাইয়া আসিতেছিল, এতদিনে তাহার ফল ফলিল। দুষ্টফাঁদ পাতিয়া পাপের পথে তুমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছ। যাহারা কিছুই জানে না, তাহাদের উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছ। কিন্তু রাজা! তুমি জান না, সকলের মাথার উপর অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্বামী এক অনন্তব্রহ্ম আছেন। কথা ছাড়িয়া দাও, তোমার স্বর্গভূষণ মরিয়াছে, তোমার পরমবিশ্বাসী বন্ধু বিতাসু যবনের হস্তে তাহার জীবন গিয়াছে। আর যদি কিছু সৌভাগ্যের আশা থাকে, ভগবানকে স্মরণ করিয়া চরমসময়ে সে আশার শরণাগত হও। কিন্তু মনে যেন থাকে রাজা আশা চপলা।"

ত্রিষষ্টিতম প্রবাহ।

পরিতাপিনী।

ছিনু মোরা দুখে সুখে মুখামুখী করি।
আমার সে পোষা পাখী কে লইল হরি!

আর্য্যারম্ভ।

স্বর্গভূষণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইল। শিবিরের লোকেরা আহত বিষবথ্‌তকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী জানিয়া আপততঃ চিকিৎ-সার জন্য শিবিরমধ্যেই রাখিয়া দিলেন। সর্পবিষে যাহার প্রাণ যায় নাই, কিসে তাহার প্রাণ যাইবে, অনেক লোকেই সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়কে অনেক সময়ে গোলমালে থাকিতে হইতেছে। কোথা হইতে কোথাকার কথা কোথায় যাইতেছে, কোথা হইতে কোথাকার কথা কোথায় আসিয়া পড়িতেছে, তাহা তিনি অবিচ্ছেদে বুঝিতে পারিতেছেন না। সে দোষ আমাদের! কিন্তু কি করিব, আমাদের এই আখ্যায়িকার জন্মই এইরূপে। কোন্ সূত্র হইতে কোন্ মাল্য গ্রন্থিত হয়, কোন্ বৃন্তে কোন্ ফুল ফুটিয়া থাকে, তাহা অন্বেষণ করিতে অনেক বিলম্ব হয়। অপরাধী আমরা! পাঠকমহাশয় হয় ত বিরক্ত হইতেছেন, এক সূত্রের এক ফুল সূত্রে সূত্রে লাফাইয়া যাইতেছে। কোন্ দিক হইতে কোথা আসিয়া মালা গাঁথিবার উপকরণ সাজাইতে হয়, প্রথমেই গাঁথিতে বসিয়া তাহা স্থির করা যায় না। পাঁচরঙা মালায় কোন্ রঙের কাছে কোন্ রঙ মানায়, কোন্ ফুলের কাছে কোন্ ফুল সাজে, গাঁথিয়া গাঁথিয়া তাহা দেখিতে হয়। মিল না হইলে খুলিয়া ফেলিতে হয়, ছিঁড়িতে হয় না। রঙে রঙ মিলাইয়া আবার আবার গাঁথিতে হয়। স্বর্গভূষণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইযা গেল। শোকাতুর রাজা রঘুবর শ্মশান পর্য্যন্ত সঙ্গে যান নাই। ভূপেশচন্দ্রও না! রক্ষাকর্ত্তা রাজপুরুষও না! অন্যান্য লোকেরা শ্মসানভূমি পর্য্যন্ত অনুগামী হইয়াছিলেন। সংসারের খেলা বড় বিচিত্র! কোথা হইতে অকস্মাৎ আসিয়া মিলিযা সেই চিকিৎসক চতুর্ভূজলাল সেই সময় সেই ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন। শ্মশানে স্বর্গভূষণের সৎকার হইল। যাঁহাদের সহিত মিত্রতা ছিল, তাঁহারা কাতর হইযা ফিরিযা আসিলেন। তখন রজনীর অন্ধকার আবরণে পৃথিবী অন্ধকার। অন্ধকারেই তাঁহারা ফিরিলেন।

পাঠকমহাশয়! ইহাঁরা এখন এই অবস্থায় এইখানেই থাকুন। একটী অভাগিনী পরিতাপিনী একাকিনী কোথায় বসিয়া কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, একবার তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। যে দিন প্রাতঃকালে ভূপেশচন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রতিপালিত হইবার কথা, তাহার পূর্ব্ব রজনী হইতেই অপ্সরাসুন্দরী নিতান্তই ম্রিয়মাণা। রজনীপ্রভাতে তিনি যে, কত কি চিন্তা করিতেছেন, তাদৃশ চিন্তাকুল হৃদয় ভিন্ন অন্য হৃদয়ে তাহা অনুভূত হইতে পারে না। সংসার যেন তিনি শূন্যশূন্য দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি হইল। যে প্রাণপুত্তলীকে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া-

ছিলাম. সে পুতুলীটী কে চুরি করিল? কেন চুরি করিল? হায়! হায়! হায়! আর আমি ভূপেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইব না! এ জন্মে আর একটীও দুঃখের কথা তাঁহার কাণে কাণে বলিতে পাইব না! এ জন্মে আর ভূপেশ-চন্দ্রের মধুময় বাক্য শুনিতে পাইব না! এ জন্মে আর আমার সেই হৃদয়শশী ভূপেশচন্দ্রের রূপশশী আমার নয়নের কাছে উদয় হইবে না! আর আমি এ জন্মে সেই রূপসুধা পান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিব না! হায়! হাসিমুখে আর এ জন্মে ভূপেশচন্দ্র আমার অন্ধকার হৃদয় আলো করিতে আসিবেন না। আমি আর তবে কাহার জন্য. কাহার আশায়, কাহার অনুরোধে এই ভারবহ জীবন বহন করিয়া ভূপেশশূন্য বিজন সংসারবিপিনে বাস করিব? জন্মাবধি পিতা জানিতাম না, মাতা জানিতাম না. কোথায় জন্ম হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত জানিতাম না. শৈশবাবধি রাজা বিরাটকেতুকেই পিতা বলিয়া জানিতাম। শৈশবে জনকজননীকে দর্শন করিয়াছিলাম, স্নেহ পাইয়া-ছিলাম, কিন্তু কিছুই মনে ছিল না। পিতা আমার স্বর্গবাসী হইয়াছেন, জননী আমার স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, ইহাই আমার জানা ছিল। অকস্মাৎ বিধাতার অনুগ্রহে আমার জন্মদাতা পিতার চরণ দর্শন পাইয়াছিলাম। আমি যে মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা, অঙ্গুরিসংযুক্ত শ্লোকে তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সেটী কেবল আভাস মাত্র। মহারাজ আমারে চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে ভূপেশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া কোথায় যে চলিয়া গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না! সন্ধানও পাই-লাম না, সংবাদও পাইলাম না! ওঃ! এই অভাগিনীর কি দুরদৃষ্ট! এ জন্মে জন্মদাতাকে আর দেখিতে পাইব কি না, এ অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য আর উদয় হইবে কি না, কিছুই বলিতে পারি না। ওঃ! সংসারে আসিয়া আমি এত কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার কপালে এত যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে! রাজা বিরাটকেতু আমারে পরমযত্নে প্রতিপালন করিয়া যথার্থ কন্যার মত স্নেহ করিতেন; তিনিও আমারে অবাধ্য জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনিও এখন আমারে আশ্রয় দিতে চাহেন না। আশাবারিসিঞ্চিত একটী আশ্রয়তরু আমার ছিল, সেই তরুতে পিতা আমার এই লতাটীকে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ওঃ! আর যে প্রাণ ধারণ করিতে পারা যায় না!

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার আত্মগত কহিলেন, হায় হায়! যে তরুর আশ্রয় লইয়াছিলাম, আমার সেই আশ্রয়তরু কোথায় গেল! উঃ! মহাঝড়! ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মহাঝড়! সেই ঝড়ে আমার আশ্রয়তরু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি! আশ্রয়শূন্য হইয়া এই আশ্রিত লতা ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। পবনদেব! ইহা তোমার কেমন বিচার ঠাকুর? গাছটী ভাঙ্গিয়া দিলে, লতাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে না! বায়ুদেব! অবলা বলিয়া দয়া কর! তুমি ঝড়ের দেবতা, তরঙ্গের দেবতা, সংসারের লোককে আশ্রমপীড়া দিবার উপযুক্ত দেবতা। কিন্তু সকল সময় ত নিষ্ঠুর নও! জলের যেমন একটী নাম জীবন, তেমনি তোমারও একটী নাম জীবন। প্রভঞ্জন! আমি তোমার কাছে জীবনভিক্ষা করিতেছি না, কেবল এই ভিক্ষা, আর একবার ঝড় আন। সেই ঝড় আমারে শূন্যপথে উড়াইয়া লইয়া যাক্। সূর্য্যতাপে শুষ্ক হইয়া আমি দগ্ধ হইব, ইহা কি তুমি দেখিতে ভালবাস? ছি! তাহা হইলে যে তোমার নামে কলঙ্ক হইবে ঠাকুর! বায়ুদেব! উড়াইয়া লইয়া যাও। পৃথিবী হইতে অভাগিনী অপ্সরার নাম বিলুপ্ত হউক। এ কি! এ কি! সম্মুখে কাহাকে দেখিতেছি! কৈ! না ত! কেহই ত না! হাঁ! ঐ যেন কে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ভূপেশচন্দ্র! উঃ! তাই ত! ভূপেশচন্দ্র এমন হইয়াছে? এত তেজ তাঁহার শরীরে? না,—ভূপেশচন্দ্র না! এই মায়ার সংসারে,—এই পাপের সংসারে, এই অবিচারের সংসারে, ভূপেশচন্দ্র আর জীবিত নাই!

পাগলিনীর মত এই সকল কথা বলিতে বলিতে দুঃখিনী অপ্সরাসুন্দরী ধরাশায়িনী। কিন্তু জ্ঞান গেল না; রসনা বাক্যশূন্য হইল না, নেত্রপুট নিমেষশূন্য হইল না, শ্রবণপুট শ্রুতিশক্তিকে বিদায় দিল না। চীৎকার করিয়া কহিলেন, ভূপেশচন্দ্রের আত্মা! উঃ! যাহাকে চক্ষে দেখিয়া আমার হৃদয়সাগরে আনন্দতরঙ্গ খেলা করিত, আজ তাহার আত্মাকে দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে! ভূপেশ! ভূপেশ! ভূপেশ! কেন আসিয়াছ? যাও,—আমার চক্ষের নিকট হইতে সরিয়া যাও! কখনও ত ভয় দেখাও না প্রাণেশ্বর! অনাথিনী দেখিয়া আজ কেন ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

সরিয়া যাও! দেখা হইবে, মিলন হইবে, আমি যাইতেছি জীবনপ্রদীপ! আমার জীবনের আলো ফুরাইয়াছে! আশাদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে! অন্ধকার! উঃ! ঘোর অন্ধকার! উঃ! মহাঘোর! এমন অন্ধকার জন্মেও আর কথনও আমি দর্শন করি নাই। চক্ষু! তথন তথন তুমি ঘন ঘন মুদ্রিত হইতে; আজ কেন বল দেখি এমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছ! মুদ্রিত হও! এই ভয়ানক দৃশ্যের দর্শন হইতে আমারে নিস্তার কর! মূর্চ্ছা! মা! কতবার তুমি আমারে কোলে করিয়াছ; আজ কেন মা তুমি এত নিদয়া? দয়া কর,—দয়া করিয়া এই দুঃখিনীকে কোলে লও! চৈতন্য হরণ কর! আমার ভূপেশচন্দ্র নাই! জ্ঞান রাখিয়া কেন আর নিদারুণের উপর নিদারুণ যন্ত্রণা দান কর মা! দগ্ধ হইতেছি,—জ্বলন্ত বিষানলে দগ্ধ হইতেছি, তাহার উপর আর কেন দগ্ধ কর মা! কোলে কর! আমি একটু জুড়াই। পরিতাপিনী আমি,—মহা পরিতাপিনী। জ্ঞান আছে বলিয়া সেই পরিতাপানল আমারে স্তবকে স্তবকে দগ্ধ করিতেছে। কোলে কর! আর একটা ভিক্ষা আছে মা! আশা যেমন চপলা, তুমিও তেমনি চপলা। এক ঠাঁই অধিকক্ষণ থাক না; কিন্তু জগৎসংসারের সর্ব্ব-ত্যাগিনী অভাগিনী তোমার আশ্রয় চাহিতেছে। অনন্ত আশ্রয়। কোলে কর! সেই সুকোমল কোল হইতে আর নামাইও না। এ জন্মে আর যেন চৈতন্য পাইয়া আমারে জাগিয়া উঠিতে না হয়! আসিতে পারিলে না বুঝি? তা আসিবে কেন? দুঃখিনী দেখিলে সকলেই ঘৃণা করে। অনেকবার তুমি অনেক রাজরাণীকে ক্ষণেকের জন্য কোলে করিয়া বসিয়াছিলে। আমার ভূপেশচন্দ্র যথন পৃথিবীতে ছিলেন, তথন তথন এক একবার তুমি যেন নিশাচরীবেশে আমারে গ্রাস করিতে আসিয়াছিলে। আমি ডাকি নাই, অনাহূতা হইয়া আসিয়াছিলে! কোলে করিয়া বসিয়াছিলে। সে দিন ত আর এথন নাই! আমি কাঙ্গালিনী, আমি অনাথিনী, এথন আর মনে পড়িবে কেন? এথন আর আমার কাছে আসিবে কেন? উঃ! যন্ত্রণা! যন্ত্রণা!—যন্ত্রণা!—অসহ্য যন্ত্রণা!—বিষানল! ভূপেশচন্দ্র নাই!

মূর্চ্ছা কথা শুনিলেন না। ক্ষণকালের জন্য অপ্সরাসুন্দরীর রসনা যেন কণ্ঠের বাষ্পবেগে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হৃদয়ে যথন যন্ত্রণার বেগ অধিক

প্রবল হয়, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য হয় না। স্থির হইয়া বসিয়া থাকাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব। অপ্সরা-সুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরচরণে গৃহের উত্তরদক্ষিণে, পূর্ব্বপশ্চিমে, পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মন কিছুতেই শান্ত হইল না। শান্ত হয় কে কখন?—সুখের সময়। অপ্সরার মনে তখন কিছুমাত্র সুখের সঞ্চার ছিল না;—সম্পূর্ণ বিপরীত। ভ্রমণ করাও অসাধ্য হইয়া উঠিল। নয়নে করাবরণ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঊর্দ্ধদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া, নয়নাবরণ উন্মোচন করিয়া জোড়হস্তে জগৎপিতার স্তুতি আরম্ভ করিলেন।ঃ—

দয়াময়! দাসী তব অপ্সরাসুন্দরী—
চলিল এ মায়াধাম, পরিহার করি॥
বিমল ভূপেশচন্দ্র, হৃদয়ের ধন।
দুরন্ত বিপক্ষকরে, হয়েছে নিধন॥
আর কেন শূন্যধামে, থাকিবে অপ্সরা।
যায় দেব! অন্তধামে। সর্ব্বসুখহরা—
ধরণী তাহার নেত্রে ভাতিবে না আর।
যায় দাসী দীননাথ! শত নমস্কার—
তোমার চরণপদ্মে। অনাথের নাথ!
জনমের মত এই, শেষ প্রণিপাত!!

গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ। অকস্মাৎ দ্বারে আঘাত। এ সময় আঘাত করিবে কে?—কে আসিয়াছে?—আর ত আসিবার কেহই নাই;—তবে কে?—শত্রু না মিত্র?—মিত্র তখন কে হইবে? দুরবস্থার সময় মিত্রও শত্রু হয়। অপ্সরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সেই পরমশত্রু স্বর্গভূষণ। এই মহাবিপদে উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই দুরাত্মাই আগমন করিয়াছে। কিম্বা হয় ত সেই দুষ্ট বিতাসু আসিয়াছে।—অত্যন্ত ভয় হইল। বক্ষঃস্থল

ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল। উদাসভাবে আপনা আপনি একটু হাস্য করিয়া মনে মনে কহিলেন, আর আমার ভয় কি? আমি ত জগৎসংসার হইতে জন্মের মত বিদায় হইতেছি। এখন মিত্রই হউক, আর শত্রুই হউক, কিছুতেই ভরসা রাখি না, কিছুতেই ভয় করি না। স্বয়ং যমরাজ আসিলেও অপ্সরা এখন আর ভয় করে না। দ্বার খুলিয়া দিলেন।

পূর্ব্ব শঙ্কা,—পূর্ব্ব অনুমান মিথ্যা হইল। দুটী লোক প্রবেশ করিলেন। একটী লোককে দেখিয়াই বিষাদিনী পরিতাপিনী অপ্সরাসুন্দরী ধরাতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। মুখে কেবল একটীমাত্র কথা ফুটিল, "মূর্চ্ছা! এইবার এসো! এই তোমার উত্তম অবসর, এই আমার উত্তম অবসর।"

আর মুখে কথা নাই। চৈতন্য যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিঃসাড় নিস্পন্দ। নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল না, কিন্তু জ্যোতিশূন্য। লোক দুটী সেই অবস্থা দর্শন করিয়া কিছু ভয় পাইলেন। স্পর্শ করিতে পারেন না, চৈতন্যসম্পাদনের উপায় করিতেও পারেন না, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান।

একজন দাসী প্রবেশ করিল। সেই দুই মূর্ত্তির প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চঞ্চলভাবে কহিল, "তোমরা কে গা? কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলে? আমাদের বিপদ তোমরা জান না। বেশভূষা দেখিয়া মানীলোক মনে হইতেছে, কিন্তু এমন অসময়ে,—এমন বিপদসময়ে, এমন সর্ব্বনাশ কেন করিলে?—এ সময়ে অকস্মাৎ কুলকামিনীর গৃহে প্রবেশ করাতে মানীলোকের মত কার্য্য করা হয় নাই। যদি পথ ভুলিয়া আসিয়া থাক,—যদি ঠিকানা জানিতে না পারিয়া একের পরিবর্ত্তে অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া থাক, আমি দাসী, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, পথ দেখাইয়া দিতেছি, যেখানে যাহার অন্বেষণ কর, নাম বল, যদি জানা থাকে, তাহাও দেখাইয়া দিতেছি, এখান হইতে বাহির হও। আমাদের বড় বিপদ।"

উভয়ের মধ্যে একজন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তোমাদের বিপদ আমাদের বিপদ অপেক্ষা বড় নয়। তুমি অপ্সরাসুন্দরীর মুখে জল দিয়া, গাত্রে বাতাস করিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ কর। ভয় পাইও না। আমরা পর নই, মন্দ অভিপ্রায়েও আসি নাই, পথ ভুলিয়াও যাই নাই, অপর কাহারো তল্লাস

করি না. শুভ সংবাদ আনিয়াছি, অপ্সরাসুন্দরীকেই দেখিতে আসিয়াছি। পথ দেখাইয়া অপরের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তোমার যে কষ্ট হইবে, সে কষ্ট আমরা দিতে চাহি না। অপ্সরাকে সচেতন কর।"

সন্দেহ ঘুচিল না, ভয় ঘুচিল না, তথাচ সেই সশঙ্কিতা কিঙ্করী ধীরে ধীরে বারিবায়ুসংযোগে অনেক কষ্টে অপ্সরাকে সচেতন করিল।

এলোচুলে রক্তবর্ণ নয়নে অপ্সরাসুন্দরী উঠিয়া বসিলেন। দুইজন আগন্তুকের প্রতি বিস্ফারিত নেত্র নিক্ষেপ করিয়া নিরাশস্বরে কহিলেন, "আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন?"

একজন উত্তর করিলেন, "তোমাকে দেখিবার জন্য।"

একবার মাথা হেঁট করিয়া আবার ঊর্দ্ধমুখে সম্ভাষণকারীর আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "রাজা রঘুবর রাও! এই কর্ম্ম তোমাকেই শোভা পায় বটে! আমারে দেখিবার জন্য তুমি আসিয়াছ! আঃ! ঠিক্ সময়েই ত আসিয়াছ! আমি পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছি, আমার ভূপেশচন্দ্র যে পথে গিয়াছেন, আমি সেই পথেই যাইতেছি। অবলা বলিয়া ঘৃণা করিও না। রাজা রঘুবর রাও! তুমি নিশ্চয় জান, তোমার অপেক্ষা এই অবলা-হৃদয়ে অধিক সাহস আছে। আমার ভূপেশচন্দ্র নাই, কিন্তু আমার অসি আছে। এ অসি,—এই রক্তময়ী অসি, এখন আর অপর কাহারো রক্তে কলঙ্কিত হইবে না। আমারই হৃদয়ের রক্ত!—ছোট ছেলে যেমন জননীর স্তনদুগ্ধ পান করে, অভাগিনী অপ্সরার এই অসি তেমনি অপ্সরার হৃদয়-শোণিত পান করিয়া চিরদুঃখিনী অপ্সরাকে,—জান রাজা, এই চিরদুঃখিনী অপ্সরাকে ইহার হৃদয়চন্দ্র ভূপেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিবে। রাজা রঘুবর রাও! মনে করিয়া দেখ, তুমিই আমার সমস্ত হতাশের, সমস্ত বিপদের নিদান। তোমার পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার পুত্র স্বর্ণভূষণ আমারে অনাথিনী করিয়াছে! আমার ভূপেশচন্দ্রকে প্রাণে মারিয়াছে! কিন্তু রাজা! এই অবলার প্রাণে সব সহে,—সব সহিল। এই অবলা তোমাদের বংশকে ক্ষমা করিল। কিন্তু যিনি ক্ষমার ক্ষমা, সহের সহ, জগৎজীবের সাক্ষী, পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ডদাতা, তিনি তোমাদের ক্ষমা করিবেন কি না, বলিতে পারিলাম না।"

এই শেষকথা উচ্চারণ করিয়া বীরকুমারী বীরাঙ্গনা অসিকোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া আপন বক্ষে আঘাত করিবার জন্য উপক্রম করিলেন। ঠিক্ পাগলিনী, ঠিক্ উন্মাদিনী, ঠিক্ রণকালীমূর্ত্তি। ভীমা উগ্রচণ্ডারূপিণী।

ভীমা উগ্রচণ্ডা যেন ভীম খাণ্ডা হাতে।

বীরাঙ্গনার হস্তে রক্তপিপাসিনী অসি ঘনঘন ঘুরিতেছে। বীরাঙ্গনার হৃদয়ে প্রবেশ করে করে, ঠিক্ তেমনিভাবে ঘুরিতেছে। অসি ঘুরাইয়া অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার কহিলেন, "রাজা রঘুবর রাও! তোমরা ঘরে যাও। আমার জীবনের সমস্ত আশা ভাল হইয়াছে। আশাকে আর আমি হৃদয়ে জাগাইতে পারি না। যাই চলিয়া সেই লোকে, যে লোকে লোক শান্তি পায়; যে লোকের নাম শান্তিধাম, যাই আমি সেই লোকে। তোমরা ঘরে যাও।"

"দেবি! দেবি! আমি কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা লইতে ইচ্ছা করি। অঙ্গস্পর্শ করিতে শঙ্কা হয়, নিকটে যাইতে শঙ্কা হয়, কিন্তু আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি শান্ত হও। তলোয়ার পরিত্যাগ কর। ভূপেশচন্দ্রের কোন অমঙ্গল হয় নাই।"

এক মূর্ত্তি দুই প্রকার। যে মূর্ত্তি এতক্ষণ অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া যেন রণবেশে নৃত্য করিতেছিল, সেই মূর্ত্তি আর এক প্রকার। হস্তমুষ্টি হইতে অসি খসিয়া পড়িল না, কিন্তু যে হস্তে অসি, সেই হস্ত সোজা হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিল। মুখের বর্ণ আরও রক্তবর্ণ হইল। চক্ষু দুটী যেন প্রভাতকালের পদ্মফুলের মত একটু একটু রক্তবর্ণ হইয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। প্রখর ভাস্করের প্রখর প্রভা যেমন করিয়া দিগ্‌দাহ করে, ঠিক্ সেই প্রকারে অপ্সরার নয়নদীপ্তি সেই উভয় আগন্তুকের প্রতি পুনঃপুন বর্ষিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আগন্তুক সচকিতভাবে কহিলেন, "দেবি! অসি পরিত্যাগ কর। তোমার ভূপেশচন্দ্রের কোন অমঙ্গল হয় নাই।"

অপ্সরা কহিলেন, "বীরবর! তোমারে আমি চিনি না, আমি একাকিনী অবলা, দুঃখের জ্বালায়,—শোকের জ্বালায়,—চিন্তার জ্বালায়,—জ্বলিয়া মরিতেছি। ক্ষত্রিয়কুমারী না হইলে হয়ত আমার মত অবস্থায় অন্য কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন পথে পদার্পণ করিতে পারিত; আর কোন

পতিপ্রাণা সতী হইলে হয় ত জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারিত, বাঙ্গালীর মেয়ে হইলে হয় ত গলায় দড়ী দিয়া মরিত, আর কোন মেয়ে হইলে হয় ত কাটবিষ খাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত। কিন্তু বীরবর! আমি ত তাহা পারিব না; পারি যদি, তাহাও ত আমি করিব না। আমি ত তাহা পারিব না। আমার অসি আছে, যদি মরিতে হয়,—আমি ক্ষত্রিয়কুমারী,—যদি মরিতে হয়, এই অসি আমার যম। যদি বাঁচিতে হয়, এই অসি আমার সঞ্জীবনী মহৌষধি। তোমারে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু তবুও যেন একটু একটু চিনিতে পারিতেছি। দাসীকে যদি ক্ষমা করিতে পার, তাহা হইলে দাসী জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তোমার পরিচয় কি?"

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া আগন্তুক কহিলেন, "পরিচয় দিবার একটু বিলম্ব আছে। এই রাজা তোমাকে লইতে আসিয়াছেন, তুমি ইহাঁর প্রাসাদে চল। ইহাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র। ইহাঁর প্রাসাদে তুমি পরমসুখে বাস করিতে পারিবে।"

"ইহাঁর প্রাসাদে? ওঃ! আমার ভূপেশচন্দ্রের চিরশত্রু স্বর্গভূষণের পিতা রঘুবর রাওয়ের প্রাসাদে? সে প্রাসাদ নরকে ডুবিবে। যাহাদের কুচক্রে আমার ভূপেশচন্দ্রের প্রাণ গিয়াছে, তাহাদের আলয়ে আমি বাস করিতে যাইব, আশ্রয় লইতে যাইব? আঃ! কেন? আমার কি প্রাসাদ নাই? অনন্তধামে এক প্রাসাদ আছে, যে প্রাসাদে আমার ভূপেশচন্দ্র আছেন, সেই প্রাসাদ আমার শান্তিপ্রাসাদ। ওঃ! এরা আবার কে? তোমরা বুঝি দুঃখিনী পাইয়া এই অবলারে ছলনা করিতে আসিয়াছ? রাজা রঘুবর রাও! এখনও কি তোমার মনের অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় নাই? কেন তুমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছিলে? অবলার প্রতি এই অত্যাচার?"

"না বৎসে! আমার ত কিছুই নাই। চল, তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী হইবে। কুমার ভূপেশচন্দ্রকে সেইখানে তুমি দেখিতে পাইবে। আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, বিতাম্বু নামে যে ব্যক্তি এদেশের সমস্ত লোককে বঞ্চনা করিতেছিল, যে দুরন্ত ডাকাইত তোমাকে আর ভূপেশচন্দ্রকে বারংবার ঠকাইয়া ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখন পরিচয় পাইয়াছি, সেই জুয়াচোরটা মুসলমান। নাম তার বিতাম্বু নয়, তিন নাম,

এক নাম বিতাস্থ ;—যখন হিন্দু, তখন তাহার নাম বিতাস্থ ; যখন সত্য প্রকাশ, তখন বিষবখ্ত হোসেন ; আরো যখন আরো সত্য প্রকাশ, তখন তাহার নাম সৈয়দ মীর নসীম উদ্দীন। সেই পাপাশয় যবন এক নিশাকালে আমার স্বর্গভূষণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছে! আমার স্বর্গভূষণ মরিয়া গিয়াছে! তোমার ভূপেশচন্দ্র কুশলে আছেন। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। তুমি ঘরে চল।"

অপ্সরাসুন্দরী অনেক ভাবিলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি না, সেইটাই বড় শক্ত কথা। নূতন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্র! তোমাতে আমি এক নূতন রূপের ছবি দেখিতেছি। মন যেন তোমারে বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে। কিন্তু বীরবর! কখনও ত চক্ষে দেখি নাই। বীরপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা স্ত্রীজাতির স্বভাব-বিরুদ্ধ; নিয়মবিরুদ্ধ।"

"দেবি! তোমার পক্ষে তাহা নহে। কিন্তু আমার নাম শুনিলে তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহা মিথ্যাকথা নহে। টাকার লোভে সেই পাপাত্মা বিতাস্থ কুমার স্বর্গভূষণকে কাটিয়াছে; খণ্ড খণ্ড করিয়া স্বর্গভূষণকে উষ্ণশোণিতে,—উষ্ণ কিম্বা শীতল, তাহার এখনও বিচার হয় নাই, কিন্তু খুন করিয়াছে। হত্যাকারীর চিকিৎসা হইতেছে। আরাম হইলেই বিচার হইবে। তুমি রাজবাড়ীতে চল। তুমি রাজকন্যা। এমন কুৎসিত স্থানে তোমাকে দেখিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে।"

"কষ্ট হইতেছে? কিন্তু কাহার জন্য? আমার আর কষ্টের বাকী কি বীরবর! যিনি সর্ব্বসহা পৃথিবী, তাঁহার নিকটে আমি বিদায় লইয়াছি।"

"বিদায় লইতে হইবে না। ভূপেশচন্দ্রের ধর্ম্মবলে সমস্তই মঙ্গল।"

"তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমারে চিনিতে পারিতেছ, তুমি আমার ভূপেশচন্দ্রের নাম করিতেছ, জানি জানি করিয়াও জানিতে পারিতেছি না। আশা বলিতেছে, ভূপেশচন্দ্রের মঙ্গল; তুমি বলিতেছ, ভূপেশচন্দ্রের মঙ্গল। আশা আবার বলিতেছে, সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু বীরেন্দ্র! কিন্তু সাধু! তোমার সঙ্গে কথা কহিতে আমার বড় লজ্জা হয়।

আশার সঙ্গে কথা কহিতে পারি, কিন্তু কপাল ভাল নয়; কেবল আমার পক্ষে নয়, সকলের পক্ষেই সমান, আশাকে আমি ভালবাসি,—তোমরাও বাস, আমিও বাসি।—কিন্তু তথাপি—তথাপি—তথাপি, আশা চপলা।"

রাজপুত্র কহিলেন, "অপ্সরাসুন্দরি! আমার কথায় আর অবিশ্বাস রাখিও না। ঘরে চল। সেইখানেই ভূপেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবে।"

ঊর্দ্ধদিকে হাত তুলিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পাইব? তবে কি সমস্তই স্বপ্ন? ভূপেশচন্দ্রকে তবে কি তাহারা মারিয়া ফেলে নাই? পরমেশ্বর! তবে কি তুমি এই অবলার কথা শুনিয়াছ?"—অসিকোষে অসি রাখিয়া, আবার খুলিয়া অপ্সরা কহিলেন, "আমি যাইব না। যাহার জন্য আমি পাগলিনী, তাহাকে যদি এইখানে আনিয়া দেখাইতে পার, তাহা হইলে যাইব। তোমার নাম কি? তুমি আমারে অপ্সরাসুন্দরী বলিয়া কিরূপে চিনিলে?"

"চিনিবার সম্পর্ক আছে। দেবি! যখন সময় আসিবে,—আসিবার কথাই বা কেন,—সময় আসিয়াছে, পরিচয় পাইবে,—পরিচয় পাইলে রাজবংশ হইতে আমি দূরে থাকিব না। বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের হিতাভিলাষী বিদেশী পরিব্রাজক বন্ধু, আমার নাম হরবিলাস।"

"হরবিলাস? এ নাম ত আমি নূতন শুনিলাম, কিন্তু তুমি আমারে কিরূপে চিনিলে?"

"সে পরিচয় ভূপেশচন্দ্র দিবেন।"

"তোমাদের মায়া যদি মিথ্যা না হয়, ভূপেশচন্দ্র যদি বাঁচিয়া থাকেন,—না,—সে সব কথা এখন না। রাজা রঘুবর রাও! তুমি আমারে কি বলিতে আসিয়াছ?"

"পুত্রহীন হইয়াছি, সমস্ত সম্পত্তি তোমারে দান করিব, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

"রঘুবর রাও! তুমি মনে জান, এখনও আমার মুখে শোনো, আমার ভূপেশচন্দ্র নাই। সত্য যদি আমার ভূপেশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকেন, তুমি আর এই হরবিলাস যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিয়া থাক, তোমাদের আমি সহস্র সহস্র নমস্কার করি। কিন্তু রাজা! উদয়পুরের অধীশ্বর মহারাজ

উদয়সিংহের কন্যা আমি। আমারে তোমরা প্রতারণা করিতে পারিবে না। তোমরা জান, উদয়পুর-রাজবংশের সূর্য্যবংশীয় রাজমহিষীরা,—সেই বংশের রাজকুমারীরা এই পৃথিবীতে কত প্রকার বিচিত্র খেলা দেখাইয়া স্বর্গে গিয়াছেন? ইচ্ছা করিলে আমিও তাহা দেখাইতে পারি। আমার ভূপেশ-চন্দ্র বাঁচিয়া নাই। রাক্ষসের কবল হইতে সেই নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্ররূপী রাজ-কুমারের কোন প্রকারেই পবিত্রাণলাভের সম্ভাবনা ছিল না। আমার শঙ্কা হইতেছে, সত্যই যেন তোমরা আমারে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, আর কেন যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা! আমি মরিতে যাইতেছি। ভূপেশচন্দ্র যেখানে গিয়াছেন, সেইখানে যাইবার জন্যই সজ্জিত হইয়া আমি প্রস্তুত হইতেছি। আমারে আর তোমরা ছলনা করিয়া বাধা দিও না।"

কাতর হইয়া রঘুবর রাও কহিলেন, "অপ্সরাসুন্দরি! বৎসে! তুমি কি পাগলিনী হইলে? রাজা বিরাটকেতুর কন্যা তুমি, ইহা কি ভুলিয়া গেলে? মহারাজ উদয়সিংহের নাম করিতেছ। মহারাজ উদয়সিংহের সহিত রাজা বিরাটকেতুর কোন সম্পর্ক নাই। অকারণ মিথ্যাশোকে তোমার মতিভ্রম হইতেছে। তুমি আমার গৃহে চল। আমি তোমাকে কন্যার মত আদরে রাখিব। ভূপেশচন্দ্রকেও আশ্রয় দিব। কোন সন্দেহ না করিয়া তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দশহাত তফাতে দাঁড়াইয়া সদর্পস্বরে অপ্সরা-সুন্দরী কহিলেন, "রাজা রঘুবর রাও! কত মায়া জান তুমি? দিব্যচক্ষে আমি দেখিতেছি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এখন আবার আশ্রয় দিবার কথা কহিতেছ? এই আমি আশ্রয়ের নামে পদাঘাত করিলাম। তোমার সেই মহাপাপ-কলঙ্কিত আশ্রমের একবিন্দু ধূলা এই অপ্সরার চরণ কখনই স্পর্শ করিবে না। তোমার রাজভোগ, তোমার অট্টালিকা, তোমার রাজত্ব, তোমার ঐশ্বর্য্য, মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা বর্ষাকালের কর্দ্দম অপেক্ষাও তুচ্ছজ্ঞান করে।" অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বীরাঙ্গনার সমুচিত দর্পভরে এই প্রকার সতেজবাক্য উচ্চারণ করিয়া বীরাঙ্গনা অপ্সরা-সুন্দরী বার বার ধরাতলে পদাঘাত করিতে লাগিলেন; ভুজঙ্গিনীর মত

গর্জ্জন করিয়া পুনরায় কহিলেন, "দেখ রাজা রঘুবর রাও! এখনও বলিতেছি, শোন তুমি। আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে। জনপ্রবাদে সংসারে অনেক ভূতপ্রেত নৃত্য করে, তাহাতে যেমন বিশ্বাস করিতে হয়, তোমার কথাতেও যদি আমি তেমনি বিশ্বাস করি, দুরন্ত রাহুগ্রাস হইতে আমার হৃদয়ের পূর্ণচন্দ্র ভূপেশচন্দ্র যদি যথার্থই মুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি,—তথাপি রাজা রঘুবর রাও। যদি তুমি তাঁহার আশ্রয়,—আমার নিরাশচক্ষের সমীপে যদি তুমি তাঁহারে একবার দাঁড় করাও,—ঘোর নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আমার ভূপেশচন্দ্র যদি তোমার কাছে একবিন্দু পিপাসার জল প্রার্থনা করেন, সুশীতল বারিপূর্ণ করিয়া তুমি যদি তাঁহার হস্তে সুবর্ণপাত্র প্রদান কর,—বিষ দিবে কি সুধা দিবে জানি না, জানিব না, বিচার করিব না, বিবেচনা করিব না, সেই মুহূর্ত্তে পিপাসার্ত্ত ভূপেশচন্দ্রের হস্ত হইতে সেই বারিপাত্র আমি কাড়িয়া লইব। পৃথিবীর যদি তৃষ্ণা থাকে, সেই জলে সে তৃষ্ণা নিবারণ করিব। তৃষ্ণায় যদি ভূপেশচন্দ্রের প্রাণ যায়,—বুক যদি ফাটিয়া যায়, নির্জ্জলচক্ষে তাহা দর্শন করিব। তথাপি, তুমি রাজা রঘুবর রাও! তোমার মহাপাপ-কলঙ্কিত কলুষিত হস্তের বারিবিন্দু আমার প্রাণাধার ভূপেশচন্দ্রকে পান করিতে দিব না। একসঙ্গে দুইজনেই অনন্তলোকে প্রস্থান করিব, ক্ষুধাপিপাসা ভুলিয়া যাইব, গ্রাহ্য করিব না। কিন্তু রাজা রঘুবর রাও! তোমার আশ্রয়, তোমার সাহায্য! উঃ! বিষ! বিষ! হলাহল! সে আশ্রয়, সে সাহায্য কখনই আমি গ্রহণ করিব না। ভাবিয়া দেখদেখি রাজা! তুমি আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য কত ফাঁদ পাতিয়াছিলে! আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য তোমার কুলাঙ্গার পুত্র স্বর্গভূষণ কত কুচক্র সৃজন না করিয়াছিল! লজ্জা হয় না? আমি আবার তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিব? সে ভিক্ষার পূর্ব্বে মৃত্যু কি এই অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরীকে আদর করিয়া কোলে লইবেন না? মৃত্যুরাজ মায়ারাজ কেন তবে ধর্ম্মরাজ নাম ধারণ করেন? মনে করিয়া দেখ, তোমরাই আমার সমস্ত সুখের, সমস্ত শান্তির, চির নির্ব্বাসনের একমাত্র মূলীভূত কারণ। আমি স্ত্রীজাতি, সকল সময় সব কথা স্মরণ করিয়া অন্তরের চিরতাপানল শীতল করিয়া মনের কথা বুঝাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু যিনি প্রাচীন

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদি অনন্তপ্রভু, তিনি বুঝাইতে পারিবেন। তুমি রাজা, ক্ষমা কর! আর এই অভাগিনী, কাঙ্গালিনী, পরিতাপিনীকে আরও অধিক জ্বলন্ত পরিতাপানলে দগ্ধ করিও না। দেখিতেছ, আমার খাঁড়া কেমন ঘন ঘন কাঁপিতেছে! সূর্য্যকিরণে কি অগ্নিকিরণে কিছুই জানি না, কিছুই অনুভব নাই; কিন্তু দেখিতেছ, কেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া চক্‌মক্ করিতেছে! কালসর্প। এই খাঁড়া আপনার স্বভাবে নির্জ্জীব হইয়াও সজীব সর্পের মত আমার হৃদয়ে দংশন করিবে। আর তোমরা আমারে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু রাজা! তুমি কেন এখানে থাকিয়া কষ্ট পাও। তোমার রাজত্ব আছে, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, তোমার পাটেশ্বরী রাণী আছেন, কুলোজ্জ্বল রাজকুমার স্বর্গভূষণ আছেন; আমি অনাথা, আমার প্রতি তোমার এত দয়া, এত স্নেহ, অকস্মাৎ কেন আসিল? তুমি রাজা, ঘরে যাও! অপ্‌সরাসুন্দরীর কপালে যাহা আছে, কপালেই তাহা ফলিবে, কপালেই তাহা ফলুক, কপালেই তাহা ফলিয়াছে। আর কেন বিষবাণ?—দর্পণ দেখিতে চাও? দেখাইতে পারি, সে দর্পণ আমার হৃদয়দর্পণ, সেই দর্পণে আমি অদর্শনেও ভূপেশচন্দ্রকে দেখিতাম। ভূপেশচন্দ্র নাই!—আহা!—এখনও বুক ফাটিয়া যায় না কেন? এখনও আমি:—

এখনো এখনো আমি মোহিতেছি মায়াঘোরে।
কে যেন কি কহিতেছে ছলনা করিছে মোরে॥
তোমার চাতুরী বাণী ভুলাইতে না পারিবে।
হৃদয়ে সে রূপশশী নিরন্তর বিরাজিবে॥
ভুলাইতে চাহ যদি ভুলিতে নাহি পারিব।
হৃদয়দর্পণে সদা সেই রূপ নিহারিব॥

রাজা! তুমি ঘরে যাও! আমি কাহারো আশ্রয় চাহি না। যদি চাই, তবে সেই সর্ব্বজীবের শাস্তিদাতা ধর্ম্মরাজ যমরাজের।”

রাজা রঘুবর রাও আর কথা কহিতে পারিলেন না। এককালে যেন সহস্র বৃশ্চিক,—সহস্র কালসর্প তাঁহার বক্ষঃস্থলে দংশন করিল। পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া তিনি প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরবিলাস কহিলেন, "রাজকুমারি! আমাকে তুমি বিশ্বাস করিতে পার? আমার একটী গৃহ আছে, সেই গৃহে আমি তোমাকে চিরদিনের মত বিরামস্থান প্রদান করিতে পারি। আমার যাহা যৎসামান্য সম্পত্তি আছে, তোমাকে তাহা প্রদান করিতে পারি। সহোদরা ভগিনীকে,—গর্ব্ভধারিণী জননীকে, যে প্রকার স্নেহভক্তিতে লোকে প্রতিপালন করে, আমি সেই রূপে তাহা পারিব। ভূপেশচন্দ্রের সহিত সচ্ছন্দে নিরাপদে সেই শান্তি-কুটীরে তুমি আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে।"

ভূতলে নেত্রনিক্ষেপ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার সত্য পরিচয় আমি পাইলাম না। কিন্তু যদি সত্য সত্য ভূপেশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমার অনুগ্রহে আমি চরিতার্থ।"

"ভূপেশচন্দ্রের জীবন রক্ষা হইয়াছে। আমি বলিতেছি, রাজা বলিতেছেন, এখনও সন্দেহ কর কেন দেবি!"

"তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয়। আমি যেন মনে করি, তুমি যেন স্বর্গীয় দেবকুমার, কিম্বা কোন দৈবক্ষমতাপ্রাপ্ত দেবদূত; তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু এই রাজা রঘুবর রাওকে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মত ভয় হয়। তোমার নাম কি?"

"ভুলিয়াছ?—নাম আমার ভুলিয়া গিয়াছ? সতি!—আমার নাম হরবিলাস।—আমি তোমার আর তোমার ভূপেশচন্দ্রের অকপট বন্ধু। এই বিপদক্ষেত্রে বিপদের রক্ষাকর্ত্তা যদি কোন বন্ধু থাকিতে পারে, দেবী অপ্সরাসুন্দরি! সেই বন্ধু তোমাদের আমি। অকপট বন্ধু।"

"অকপট বন্ধু!—সুখে থাক। করপুটে আমি তোমাকে নমস্কার করি। একজন ভক্ত একটী গীত গাইয়াছিল, গীতের আরম্ভ ছিল ঃ--

দীনবন্ধু!

আমার সেই দিনে হে! দেখ্‌বো কেমন বন্ধু তুমি!
(বন্ধু!) যে দিন শমন রাজার ডরে, এ ভবসংসারে,
করে করে বন্ধন পোর্‌বো হে আমি॥"

সেই কথা আমার মনে হইতেছে। যে হও তুমি, তুমি কি আমার সেই প্রকারের বন্ধু হইতে পারিবে? যদি সেই প্রকারের বন্ধু হও, বিপদে বন্ধুর কার্য্য কর। এখন সত্য করিয়া বল দেখি, সত্যই কি আমার ভূপেশচন্দ্রের জীবন রক্ষা হইয়াছে?"

"হইয়াছে।—কেন সন্দেহ কর দেবি! আমি বঞ্চনা করিতে আসি নাই। যে সকল দুষ্টলোক কুচক্রজাল বিস্তার করিয়া ভূপেশচন্দ্রকে বিনাদোষে খুন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা ধরা পড়িয়াছে। যমালয়ে গমন করিবার পূর্ব্বেই নিকটে তাহাদের শাস্তি আছে। অবিলম্বে কেহ কেহ সে শাস্তি ভোগ করিয়াছে; বাকী আছে যাহারা, চক্ষের নিকটেই তাহারা অনন্তশাস্তি ভোগ করিবে।"

"প্রভাতে সরোবরে পদ্মফুল ফুটিলে দলগুলি যেমন ছড়াইয়া পড়ে, উষাকালে উড়িবার পূর্ব্বে শাখীবাসী পাখীদের পালক যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপে পদ্মচক্ষু বিকাশ করিয়া আমাদের পরিতাপিনী নায়িকা অপ্সরাসুন্দরী কপোতগুঞ্জিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিচয় ছিল না, পরিচয় নাই, নাম শুনিলাম হরবিলাস, কিন্তু হরবিলাস! আমি বুঝিতেছি, অকারণ বন্ধু তুমি।—যথার্থই অকপট বন্ধু। যদি সদয় হইয়া তুমি এই অভাগিনী পরিতাপিনী কাঙ্গালিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আসিয়া থাক, সত্য পরিচয় প্রদান কর।—সত্যই তুমি কি ক্ষত্রিয়পুত্র?"

"দেবি! কি লক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়পুত্র জানিতে পার?"

"জিজ্ঞাসা করিয়া বড় লজ্জায় পড়িলাম। দয়ায়, ধর্ম্মে, বীরত্বে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দানে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। তোমাতে তাহা আছে।"

"যদি আমি নিজমুখে স্বীকার করি, তাহা হইলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে। কিন্তু দেবি!—"

"আর বলিতে হইবে না। অপ্সরাসুন্দরী ক্ষত্রধর্ম্ম ভাল জানে। রাজা দশরথের,—রাজা রামচন্দ্রের,—রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরাণবর্ণিত ইতিহাস এই দুঃখিনী অপ্সরাসুন্দরীর পাঠ করা হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি, তুমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার।"

"তাহা আমি বুঝাইতে আসি নাই। ভগবান যখন দিন দিবেন, তখন তোমার সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক,—ভূপেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক, আমাকে জানাইয়া দিতে হইবে না, বিশ্ববিধাতা জগৎপিতাই তাহা জানাইয়া দিবেন।"

"আমি যেন আরও কিছু বুঝিতেছি। অবলা আমি, তোমাদের কুলের কুলাঙ্গনা আমি, কিন্তু এখন গ্রহচক্রে অনাথা। পিতা যাঁহার হস্তে আমারে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই প্রাণাধিক ভূপেশচন্দ্রকে রাক্ষসে খাইয়াছে। আমার পিতা একটীবার মাত্র দর্শন দিয়া, অন্ধকার রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়াছেন। রাত্রি যেন একটী পর্ব্বত, অন্ধকার যেন তাহার একটী গুহা; সেই অন্ধকার গুহার অন্ধিসন্ধি তোমরা কি কেহ জান?"

"আমি জানি।" অপ্সরাকে হাসি না দেখাইয়া অন্যদিকে হাসিতে হাসিতে হরবিলাস কহিলেন, "অন্ধিসন্ধি আমি জানি। আমার আশ্রমে তুমি চল। শান্তিদেবী সেখানে শান্তিকুম্ভ কক্ষে লইয়া তোমাকে বরণ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তোমার ভূপেশচন্দ্র রাহুমুক্ত হইয়া আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীরে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছেন।"

"হরবিলাস! যে কেন হও না তুমি —হরবিলাস! আমি যেন বুঝিতেছি, সূর্য্যবংশে তোমার জন্ম। উঃ! রাজা উদয়সিংহের বংশে তোমার জন্ম! কিন্তু আছ তুমি কালসর্প! সূর্য্যবংশে কালসর্পের উদ্ভব! রাজকুমার! দেখিয়া চিনিতে পারিতেছ না? সূর্য্যবংশের অলঙ্কার এক সময়ে বানরে চিনিয়াছিল। তুমি রাজপুত্র, অপ্সরাসুন্দরীকে চিনিতে পারিতেছ না?"

হাস্য করিয়া হরবিলাস কহিলেন, "সূর্য্যবংশের শোণিত নিতান্ত ক্ষুদ্র ধারে বহিতেছে। উদয়পুরের মহারাণা বিপক্ষ যবনভয়ে বনপর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছেন। রাজা প্রতাপসিংহ পূর্ব্বেই এক প্রকার আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু তুমি সুরসুন্দরি! সেই বংশের কুললক্ষ্মী। কুললক্ষ্মীকে মস্তকে ধারণ করিতে কাহার না অভিলাষ হয়?"

"সব কথা তুমি বুঝি আমাকে ভুলাইয়া দিতেছ? তুমি রাজকুমার হরবিলাস! তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক রঘুবর রাও—"

"দেবি! রাজা রঘুবর রাও বিশ্বাসঘাতক নহেন। তোমাকে চিনিতেন না, ভূপেশচন্দ্রকে চিনিতেন না, সেই জন্যই—"

"জন্য তুমি কাহাকে বল রাজকুমার! চিনিতে না পারিলে লোকে কি কখনও কাহারও জীবনের উপর হস্তারক হয়?"

"ক্ষমা কর দেবি! ক্ষমা কর!" জোড় কর করিয়া রঘুবর রাও কহিলেন, "দেবি! অপ্সরাসুন্দরি! আমি তোমাকে চিনিতাম না। বিরাটকেতুর কন্যা তুমি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ হইবে,—এই মাত্র পরিচয় জানি। দেবি! আমার সহস্র অপরাধ, সে অপরাধের কি ক্ষমা নাই?"

"আছে রাজা! অনেক অপরাধ আমি ক্ষমা করিয়াছি, অনেক অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে জানি! কিন্তু যাহারা আমার ভূপেশচন্দ্রের প্রাণের বৈরী, তাহাদের নামে যে কি ক্ষমা আছে, তাহা এখনও আমি শিক্ষা করি নাই।"

হরবিলাস কহিলেন, "অপ্সরাসুন্দরি! তুমি বড় উত্তেজিতা হইতেছ। কথায় কর্ণ দিতেছ না, আমি কহিতেছি, ভূপেশচন্দ্র বাঁচিয়া আছেন। শীঘ্রই মিলন হইবে।"

"যদি হয়, তোমাদের সঙ্গেও দেখা হইবে, যদি না হয়, এ জন্মে আর কেহ এই অপ্সরাসুন্দরীকে পৃথিবীতে পৃথিবীর জনকোলাহলমধ্যে দেখিতে পাইবে না। যদি পায়, কেবল নামমাত্র শুনিতে পাইবে।"

"আমরা যদি ভূপেশচন্দ্রকে আনিয়া দিতে পারি?"

"অপ্সরাসুন্দরীকে দেখিতে পাইবে। এখন বিদায় হও; রোদন করিবার অবসর আসিয়াছে। আমি রোদন করি, তোমরা গৃহে যাও!—না,—আমি রোদন করিব না, আমার বজ্রচক্ষে জল আসিবে না। রাজা রঘুবর রাও! রঘুবর রাও! স্বর্গভূষণ! স্বর্গভূষণ! হরবিলাস! আঃ! আমি কোথায়? ভূপেশচন্দ্র! প্রাণাধিক! সত্য কি তুমি এই অভাগিনীকে ছাড়িয়া দুরন্ত রাক্ষসের হস্তে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছ? অঃ! প্রাণাধিক! আর ত সহ্য করিতে পারি না। জীবনের প্রদীপ! জীবনের সেই ক্ষুদ্র আলোটী কোথায় নিবিয়া গেল? ভূপেশ! আর কি এজন্মে তোমাতে আমাতে দেখা হইবে না? আর কি ভূপেশ বলিয়া আমি তোমারে ডাকিব না?

আর কি অপ্সরা বলিয়া তুমি আমারে ডাকিবে না? জীবনের সকল সাধ, সকল খেলা, সকল আশা, সকল আনন্দ, একেবারেই কি ফুরাইয়া গেল? ভূপেশ! দুঃখিনী অপ্সরা বলিয়া আর কি তুমি আমাবে দেখিতে আসিবে না? ভূপেশ! ভূপেশ! ভূপেশ! এজন্মে তুমি কি আমাবে আর অপ্সরাসুন্দরী মূর্চ্ছিতা।

চতুঃষষ্টিতম প্রবাহ।

বিতাস্থ, ওরফে বিষবখ্ত।

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকে যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

ববরুচি।

এক মাস গিয়াছে। বিতাস্থর ক্ষতস্থান প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। টাকাগুলি যেখানে ছিল, তাহার অঙ্গীকারপ্রমাণে স্বর্গভূষণের পিতা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনোয়ার বখ্ত হতাশ হইয়াছেন। এখন কেবল ফৌজদারী বিচারের প্রতীক্ষা। আমরা আর নূতন নূতন নাম করিয়া পাঠকমহাশয়কে গোলে মালে রাখিব না। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, যতই নাম সে ব্যক্তি ধারণ করুক, এক নামে পরিচয় দেওয়া যত ভাল, শতনামে পরিচয় দেওয়া ততই মন্দ। বিতাস্থ, বিতাস্থ নামে অনেক দিনের পরিচিত। বিষবখ্ত হোসেন নূতন কথা; মীর নসীম উদ্দীন নূতন কথা। দুষ্টলোকের অনেক নাম থাকে। এই দুষ্টলোকেরও হয় ত আরও অনেক নাম আছে, আমরা সে সকল ছাড়িয়া দিয়া বিতাস্থকে বিতাস্থ বলিয়াই এখন পরিচয় দিব। ফৌজদারী বিচার। সাক্ষী ভিন্ন ফৌজদারী বিচারক

সত্য অপরাধীকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করেন না। ফৌজদারীতেও না, দেওয়ানীতেও নয়। এখানে ফৌজদারী, সাক্ষীর মুখেই বিচার। আমরা এখন সাক্ষী কোথায় পাইব? যাহারা শবাধারে বহন করিয়া আনিয়াছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কিন্তু শুন ! ধর্ম্মের খেলা কেমন চমৎকার।—না,—চমৎকার কেন? যে মোকদ্দমায় সাক্ষী নাই, সে মোকদ্দমায় আসামীর জবাব চূড়ান্ত কথা। ফরিয়াদী বাদশাহ। বাদশাহের উকীল আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম বিতাস্থু, তোমার নাম বিষবখ্‌ত, তোমার নাম মীর নসীম [illegible] কি যথার্থ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে বিতাস্থু উত্তর করিল, "যে নামে তোমরা আমাকে ডাকিতে চাও, তাহাই আমি।"

"বেস্ কথা! এমনি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া আমার সকল কথার উত্তর করিতে পারিবে?"

"দুঃখী মানুষ আমি।—তোমরা —"

"সুখদুঃখের বিচার এখানে হইতেছে না। তুমি স্বর্গভূষণকে খুন করিয়াছ কি না?"

"কে বলে আমি খুন করিয়াছি। আমি গরিব।"

"গরিবের সঙ্গে আমাদের কথা হইতেছে না। বিচারের কথা। সেখানে যাহা বলিয়াছিলে, এখানে তাহা অস্বীকার করিতে পাইবে না।"

"আমার টাকা?—যে জন্য আমি পাপ করিয়াছিলাম, সে জন্য আমার কোথায়? আমার টাকা?"

"টাকা পাইলে তুমি সত্যকথা বলিবে?"

"আমার মত অভাগা দরিদ্র টাকা পাইলে সত্যকথা বলিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, ইহা কি তোমরা মনে করিতে পার?"

হাস্য করিয়া বাদশাহের উকীল একটু সিস্ দিয়া কহিলেন, "হস্! হস্! চুপ! চুপ! সেই টাকা স্বর্গভূষণের পিতার গৃহে। হাকিমের কাছে ছলনা চাতুরী খাটিবে না। এখনও সত্য করিয়া বল, সেখানে যাহা বলিয়াছিলে, তাহা কি সত্য? স্বর্গভূষণকে তুমি খুন করিয়াছ?"

"আমি ?—আমি কাহাকেও খুন করি না। যাহারা খুন করে, তাহারা বাচিয়া থাকে না! আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি; মন্দ কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা কর।"

"তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ করা অতিথি নও, তোমার পরিবার কেমন আছে, তুমি কেমন আছ, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। মানুষে সাক্ষী হয়, বানরে সাক্ষী হয়, পাখীতে সাক্ষী হয়, আর তা ছাড়া—"

"অত কথা তোমরা বলিতেছ কেন? আমার বুক কাঁপিতেছে, চতুর্দ্দিকে আমি যেন রক্তমাখা স্বর্গভূষণকে দেখিতেছি। তোমরা বুঝি সেই রঘুরাও রাজার দুষ্ট পুত্র স্বর্গভূষণের সাথী ?"

"সাথী হই আর না হই, ধর্ম্মাসনে বিচার আছে।"

"আছে? প্রথমেই স্বর্গভূষণ আমাকে তলোয়ার মরিয়াছিল। তাহার ঘোড়াটা পাগল হইয়া ছুটিয়া পলাইল।"

"আড়ম্বর করিতেছ কেন ? ঘোড়া পাগল হইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল, তোমার কি তাহাতে? সে ঘোড়া আমরা দেখিয়াছি। যাহার ঘোড়া, তাহার বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহারা বাড়ী চেনে, কিন্তু কথা কহিতে জানে না। রাজা রঘুবর রাও যে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া শিবিরে উপস্থিত হন, সেই ঘোড়াই সেই পাগলা ঘোড়া। মুখে ফেনপুঞ্জ বিনির্গত। কিন্তু এ প্রমাণে তোমার সাফাই প্রমাণ কি ?"

"সাফাই? সাফাই? আমার সাফাই আমি নিজে। স্বর্গভূষণ আমার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, তাহার উপকারের জন্য আমি অনেক খেলা খেলিয়াছিলাম।"

"স্বীকার করিতে পার ?"

"পারিতাম, কিন্তু যখন তোমরা আমাকে বিচারে আনিয়াছ, তখন আর সে সকল কথা আমার মুখ হইতে বহির্গত হইবে না। আমি বোবা হইয়া থাকিব।"

"দলের মধ্য হইতে একজন লোক উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মুণ্ডু কি বলে ?"

আর একজন প্রতিধ্বনি করিল, ঐ কথা।—আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সেই লোক সুধাইল, "মুণ্ডু কি বলে?"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "ডাকাত বুঝি মৃত্যুকে ভয় করে?"

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, "মুণ্ডু কোথায় গড়াগড়ি যায়?"

পঞ্চম ব্যক্তি উত্তর করিল, "যাইবার হইলে সেই নদীতীরেই আমরা সমাধি দিতে পারিতাম। কিন্তু ধর্ম্মসাক্ষী, এখনও আকবর শাহের সিংহাসন দিল্লীতে আছে। ফরাসী দেখাও, দিনামার দেখাও, ইংরেজ দেখাও, পর্ত্তুগীজ দেখাও, দেখাইতে পার। আমরা আর্য্যবংশের আর্য্য রাজার আর্য্য রাজত্বের ছায়া হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এখনও ধর্ম্মের আলো আমাদের বুকে জ্বলে। মিথ্যাকথা কহিতে পারিব না। রামচন্দ্রের নামকে পূজা করি, যুধিষ্ঠিরের নামকে নমস্কার করি, বিক্রমাদিত্যের মহিমাকে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্যান করি, হুমায়ুন বাদশাহের প্রতাপকে সেলাম করি, মহাপ্রতাপ আকবর শাহের নিরপেক্ষ রাজপ্রতাপকে গড় করি, মিথ্যা কথা কহিতে পারিব না। এই পাপিষ্ঠ বিতাস্থ আমাদের চক্ষের অর্দ্ধলক্ষিতে রাজকুমার স্বর্ণভূষণকে খুন করিয়াছে, দেখিয়াছি।"

বিতাস্থর দিকে কুটিল ভ্রূভঙ্গী করিয়া উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুরী "এই সুস্পষ্ট প্রমাণে তুমি কি বলিতে চাও বিতাস্থ?"

মাথা ঘুরাইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া, পলকে পলকে থামিয়া থামিয়া বিতাস্থ উত্তর করিল, "অস্বীকার করিবার আমার কিছুই নাই। কিন্তু আমার একজন সাক্ষী আছে, চতুর্ভুজ।"

"চতুর্ভুজ কে?"

"নামলব্ধ চিকিৎসক।"

"তিনি কি তোমাকে নির্দ্দোষী করিতে পারিবেন?"

"পারিবেন কি না পারিবেন, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাঁহাকে আমি অনেক সময়ে অনেক কথা শিখাইয়া দিয়াছি। অনেকবার অনেক রকমে, অনেক সাজে তাঁহাকে আমি সাজাইয়া দিয়াছি। আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্তই তিনি অবগত আছেন।"

"চতুর্ভুজ এখন কোথায়?"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া,—মাথা নীচু করিয়া আসামী জবাব করিল, "আমি কি করিয়া জানিব, তোমরা অন্বেষণ কর।"

"স্পষ্ট পরিচয় দিয়া যাও, অন্বেষণে—"

"না,—অন্বেষণে পাইবে না,—চতুর্ভুজ সত্য সত্য চতুর্ভুজ নয়। অনেক নাম। সেই চতুর্ভুজ আমারই মন্ত্রণায় বারে বারে বহুরূপী সাজিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ বল, নিবিড় অরণ্যের রঘুনন্দনই বল, আর আর যে যে নামে তোমরা নূতন লোক দেখিয়াছ, চিনিতে পার নাই,—চিনিবার আবশ্যকও হয় নাই, এখনও হইতেছে না, কিন্তু তাহারা সকলেই এক।"

যাহারা স্বর্গভূষণের মৃতদেহের সহিত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ বিতাস্থকে সৈনিক-শিবিরে আনয়ন করিয়াছিল, বিতাস্থ মরিলে তাহারা অত কথা কখনই বলিতে পারিত না। কেবলমাত্র সাক্ষ্য দিত, নরহন্তা বিতাস্থ রাজকুমার স্বর্গভূষণের হত্যাকারী।

বিচারাগার প্রায়ই নিস্তব্ধ হইয়া থাকে না। পাঁচ জনের কথায়, পাঁচ জনের পরামর্শে, ছোট ছোট কথা হইলেও হাটবাজারের গণ্ডগোলের ন্যায় মহা কলরব শুনা যায়। শান্তিরক্ষকেরা হুস্ হুস্ করিয়া গোল থামাইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু বৃথা। মানুষেরা কি কাক্, হুস্ হুস্ শব্দ শুনিয়া কি তাহারা উড়িয়া যাইবে? পাগলেও এমন কথায় বিশ্বাস করে না। বিতাস্থ অচঞ্চল। প্রাণের ভয় নাই। যৌবনের আরম্ভ অবধি আসন্নকাল পর্য্যন্ত,—এই তাহার আসন্নকাল,—এই আসন্নকাল পর্য্যন্ত যেখানে যত প্রকার মহাপাতকের অভিনয় করিয়া জগৎবাসী নিরীহ জীবকুলকে নিদারুণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়াছে, একে একে তাহা স্বীকার করিল। কিন্তু কেন যে স্বীকার, সে কালের কথায় পাঠকমহাশয়কে তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না। একালে সেকালে অনেক তফাৎ। এখন আমাদের দেশে ইংরাজের রাজত্ব। পায়ে পায়ে থানা। যদিও সেই সকল থানাকে লোকে পায়ে পায়ে মাড়াইয়া চলিয়া যায়, তথাপি বিলাতী রাজশাসনকে নমস্কার! থানার লোকেরা দুষ্ট বদ্‌মাস লোকের একবার লইতে ভাল জানেন। যে সময়ের কথা, সে সময়ে এমন সুন্দর প্রথা ছিল কি না, কিম্বা ইহা অপেক্ষা বাদশাহী কোতোয়াল আরও সুন্দর প্রথা জানিত কি না, ইতিহাস পাঠক

তাহা বুঝিবেন, আমি তাহা বুঝাইব না। দুরাচার নরহন্তা, জগতের সর্ব্ব পাপের একাধার, মহাপাপী বিতাস্থ মনে মনে বুঝিয়া, পাপজীবনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, একে একে সত্য সত্য সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিল। আমাদের ভাষায় আমরা যাহাকে স্বীকার বলিলাম,—আমাদের অপেক্ষা উচ্চদরের কবি বাবু বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা মিষ্টার রমেশচন্দ্র আরো অধিক উচ্চতর ভাষায় যাহাকে অঙ্গীকার বলেন, যবনের এবং সাহেবের আদালতের ভাষায় তাহার নাম একরার।

একরারী আসামী বিতাস্থ জীবনদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। এক দিনে ত জীবনান্ত হয় না; জীবনদাতার প্রদত্ত জীবন মানুষে অপহরণ করিবে, বড় শক্ত কথা। উঃ! প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ! পাঠকমহাশয়! বিশ্বপ্রাণময় বিশ্বেশ্বর যে প্রাণ দিয়াছেন, পার্থিব ক্ষমতাবলে বিশ্বজীব মানুষ সেই প্রাণ হরণ করিবে, ইহা কি অতি ছোট কথা? জগদীশ! মানুষকে কি তুমি এমন অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ?

জগৎ যেন নিস্তব্ধ। সব যেন কাল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে জগৎসংসার যেমন অন্ধকার হয়, ঘোর গভীর নিশীথসময়ে বিশ্বসংসার যেমন নিস্তব্ধ হয়, তেমনি নিস্তব্ধ। ঝিঁঝিঁ পোকা পর্য্যন্ত রাগরাগিণী ভুলিয়া গিয়া অন্ধকারের কোলে যেন নিদ্রাগত। মায়াদেবীর কি মায়াময়ী খেলা! একটা মানুষ মরিবে, যে মানুষ মরিবার জন্য আসিয়াছে, সেই মানুষ মরিবে; ইহার নিমিত্ত প্রকৃতিসতীর এমন নিস্তব্ধ বিমর্ষভাব কিসের জন্য?—জন্য কিছু আছে। ধার্ম্মিকের জীবন যদি অবিচারে যায়,—জীবন ত যাইবেই যাইবে,—যদি অবিচারে যায়, তাহা হইলে তুমি আমি কাঁদিব, প্রকৃতি দেবী কাঁদিবেন; সে রোদনধ্বনি মানুষের কর্ণে প্রবেশ করিবে, বাতাসে মিশাইবে, আকাশে উঠিবে, সাগরের তরঙ্গের সহিত প্রবাহিত হইয়া দূরে দূরে,—কত দূরে, কেহ জানে না,—তত দূরে ভাসিয়া যাইবে। তাহার নাম উচ্চ রোদনধ্বনি। কিন্তু যখন পাপী মরে, তখনও তুমি কাঁদ, আমিও কাঁদি, প্রকৃতিও কাঁদেন। সে ক্রন্দন কিন্তু বাতাসের সঙ্গে মিশায় না। আমাদের লোকের কথা দেবলোকে পশে না। নিস্তব্ধ। এই বিচারক্ষেত্র গভীর নিস্তব্ধ। মহাপাপী বিতাস্থর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা। বিচারালয়ে

যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে বিচারের বন্ধু, আমাদের আশা চপলা তেমন কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন না। দুষ্টলোকের দণ্ডে কেহ কেহ তুষ্ট, কেহ কেহ রুষ্ট। কিন্তু হইলে কি হয়, পাপীকে আমরা উপযুক্ত শাস্তি দিবই দিব। ফাঁদ পাতিয়া ধরিব না, লুকাইয়া রাখিব না, গোপনে দণ্ডদান করিব না, খোলা বাতাসে দশজনের সম্মুখে সুবিস্তৃত অনন্ত সংসারক্ষেত্রে পাপীর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই আমরা দর্শন করিব।

এক পক্ষ গেল; আরও এক সপ্তাহ গেল। কোন দিক হইতে অনুকূল প্রতিকূল কোন কথাই আসিল না। হাজতঘরে বসিয়া জীবনান্তদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী দুরাশয় বিতাস্থ মনে মনে অনেক পাপ ভাবিল, অনেক পাপের নূতন ভূমিকা হৃদয়ে আনিল; দুরন্ত বুদ্ধিতে আশা করিল, বাঁচিবে। *আমাদেরও ইচ্ছা ছিল, বাঁচাইব; পাপী জীবকে শীঘ্র বিনাশ করিব না।* কিন্তু উপায় নাই। কাণের কাছে মৃত্যুরাজ আসিয়া হুহুঙ্কারে গর্জ্জন করিতেছেন। গুম্‌গুম্‌শব্দে যমদূতেরা আসিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এখন আর রক্ষা করিতে পারে কে? ধর্ম্মরাজ! তোমার বিচারে কি ক্ষমা আছে? অল্পদিনের জন্য এই পাপাত্মাকে কি তুমি ক্ষমা করিতে পার? মরিলে ত সকলই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু যাহারা ঘোর নারকী, ঘোর পাতকী, তাহাদের কি শীঘ্র শীঘ্র নিধন করা ভাল? যমরাজ! একটু দাঁড়াও দেখি, আমি তোমাকে একটী কথা বলি। সূর্য্যদেবের পুত্র তুমি। তোমার নাম ধর্ম্মরাজ। কিন্তু ধর্ম্মরাজ! তোমার পিতার তেজ অপেক্ষা তোমার তেজ কিছু বেশী নয়। মনে করিলে তিনি নেত্রপলকে এই বিনশ্বর বিশ্ব-সংসারকে দগ্ধ করিতে পারেন। তুমি তাহা পার না। তিনি তাহা করেন না। কেন জান? তাঁহার অগ্নিময় দেহে দয়া আছে। তুমি ধর্ম্মরাজ! রণমদে মত্ত হইয়া মহিষে চড়িয়া ভ্রমণ কর। কিন্তু এস দেখি আমার সম্মুখে; আন দেখি তোমার মহিষকে! বিতাস্থ মরে মরুক, কিন্তু বিশ্ব-সংহারক! তোমাতে আমাতে দুটী কথা হইবে। শুনিতে চাও, শান্তমূর্ত্তিতে দেখা দাও। অগ্রাহ্য কর, রাহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও। কল্পনা তোমাকে দুটী কথা বলিবেন :—

যমরাজ! ভালবাসি অন্তরে তোমারে।
ধর্ম্মের বিচারকারী তুমি হে সংসারে॥
কিন্তু বল দেখি দেব! কত অবিচার—
হইতেছে তব রাজ্যে, জান কিছু তার?
তোমারে ভকতি করি অভয় অন্তর।
জ্ঞান হয় আমি যেন অক্ষয় অমর॥
পাপপথে মতি নাই ধর্ম্মপথে আছি।
রাখিব ধর্ম্মের মান যত দিন বাঁচি॥
ধর্ম্মরাজ! কর তুমি ধর্ম্মের বিচার।
অধর্ম্ম যেখানে থাকে দণ্ড দেহ তার॥
জানি আমি, রবিসুত! মহিমা তোমার।
পাপের উচিত শাস্তি, পুণ্যে পুরস্কার॥
এই যে বিতাসু দস্যু দস্যুতা ছলনে—
বধিয়াছে নিশাকালে রাজার নন্দনে॥
আরো কি করেছে কত, নাহি মম মনে।
শেষের বিচার হবে তোমার সদনে॥
যাবে না কি তব পুরে দুরাত্মা পামর?
পাবে না কি যমদণ্ড হবে কি অমর?
ধর্ম্মরাজ! ভিক্ষা মাগি কৃতাঞ্জলি করি।
দেখিব পাপীর দণ্ড। আগে যদি মরি,
তথাপি দেখিব দেব! প্রতাপে তোমার।
মহাপাপী মহাপাপী হবে ছার খার॥

আকাশে আকাশে ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। শান্তহৃদয়ে সান্ত্বনা আসিল।

পাপীলোকের পাপহৃদয় অদৃশ্য আগুনে পুড়িয়া গেল। গাছে দুটী পাখী আছে। পাখী বলে কি? পাখী বলে:—

"বউ! বউ! বউ! বউ! বউ কথা কও!
লাজে, লাজে, লাজে কেন নীরবেতে রও?"

পাখী আবার এ কি কথা বলে? প্রকৃতিসতি! স্বভাবসুন্দরি! তুমিকি মা পাখীদের বউ হও? তুমি চুপ করিয়া রহিয়াছ, তোমাকে কথা কহাইবার জন্য পাখীরা নূতন সুরে গীত গাইতেছে। আর তুমি চুপ করিয়া থাক কেন মা? তোমার খেলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। শান্ত শান্ত পাখী-গুলির কথার উত্তর দাও, দুরন্ত পাপাচারী দস্যুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। সুবিচার কি অবিচার, তুমি বিবেচনা করিতে পারিবে, আমিও হয় ত বিবেচনা করিতে পারিব। কিন্তু মা! জগৎজননী প্রকৃতিসতি! তোমার স্নেহমমতা এই ভবধামে সর্ব্বাগ্রে কাহাকে কোলে করে? (শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু!) কি বলিতে কি বলিলাম!

বদ্‌মাস অনেক প্রকার আছে। কিন্তু ব্যবসায়ী বদ্‌মাস এক প্রকার নূতন জগতের সৃষ্টি। তাহারা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, কালাকাল বিবেচনা করে না, প্রলোভনের দাস হইয়া শুদ্ধ কেবল নরসংসারকে প্রতারণা করিবার অভিলাষে পথে পথে বিচরণ করে। গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া তামাকে রূপা করা; সোণা করা, ফন্দী জানায়। বন্ধ্যা-নারীর ছেলে করা ঔষধ শুনায়। ভ্রান্ত সংসার তাহাতেই অক্ষয় অনন্ত বিশ্বাস করিয়া মোহচক্রে ঘুরিতে থাকে। মায়ার সঙ্গে আমার দেখাশুনা আছে। মায়া কিন্তু কথা কহে না। অনেক লোক মায়াকে জাল বলে। যাহারা জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা জাল বলিবে না ত কি বলিবে? বাদুড় ধরিবার জন্য দেবদারুগাছের শাখায় শিকারীরা জাল পাতিয়া রাখে। সকালে অনেক বাদুড় ধরা পড়ে। প্রয়াগধামের ফৌজদারী আদালতে আজ একটা প্রকাণ্ড বাদুড় ধরা পড়িয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের মহিমা বুঝিবার সময় আমাদের অনেক কথা মনে পড়ে। ব্যবসায়ী বদ্‌মাস মানুষ হইতে পারে, বাঘ হইতে পারে, বিড়াল হইতে পারে, ইন্দুর হইতে পারে, ছার্‌পোকা, জোঁক, মশা, মাছী, ডাঁস, সমস্তই হইতে পারে, কিন্তু ব্যবসা

বন্ধ থাকে না। বিলাতে একবার ঘড়ী চুরির মোকদ্দমা হইতেছিল, চোরের দুই বৎসর মেয়াদ হইবার হুকুম হইল। লোকেরা কলরব করিয়া জয়ধ্বনি দিল। কিন্তু সেই অবসরে আর একটা চোর একজন রাজপুত্রের ঘড়ীর পকেট হইতে ঘড়ী তুলিয়া লইতেছিল, ধরা পড়িয়া গেল। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন লোক গা? এই সাক্ষাতে দেখিতেছ, ঘড়ীচোরের দুই বৎসর মেয়াদ। আবার ঘড়ীচুরী?"

চোর উত্তর করিল, "হইল বা দুই বৎসর। হইলই বা ঘড়ীচুরী! ব্যবসা কি কখনো বন্ধ থাকে?"

বিতাস্থ হয় ত সেই কথা বলিতে পারে; দুষ্টলোকের ব্যবসা বন্ধ থাকে না। বিশেষতঃ তাহার বুক বাড়িয়া গিয়াছে। চুরী করিয়াছে, ডাকাইতি করিয়াছে, মানুষ মারিয়াছে, কুলবালা সতীর সতীত্ব বিনাশের উকীল হইয়াছে, আরও যত যত দুষ্কর্ম্ম জগতে আছে, বিতাস্থর দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতে বাকী নাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কখন আসে, পাপীলোকে তাহা জানিতে পারে না। তাহাদের যখন উন্নতির অবস্থা, তখন তাহারা এক প্রকার পাগল হয়। বিতাস্থ যেন পাগল হইয়াছে। শিবিরে স্বীকার করিয়াছিল, খুন! আদালতে অস্বীকার করিতেছে, মিথ্যা! কিন্তু সত্য কি কখনও ঢাকা থাকে? আগুন কি কখনও ছাই দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায়? যদি যায়, গুমিয়া গুমিয়া সেই আগুন আরও প্রবল হইয়া উঠে। বিতাস্থর পাপ ছাইঢাকা আগুন। সে পাপ এখন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দ্বিতীয় দিবসে পূর্ব্ব হুকুম সমালোচন করিবার জন্য বিচারাসনে যিনি বসিয়াছিলেন, বিতাস্থকে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাওকে খুন করিয়াছ? টাকা চুরী করিয়াছ?"

বিতাস্থ কহিল, "সে কথার উত্তর দিতে আমি এখানে আসি নাই। যাহা যাহা আমার বলিবার ছিল, সকল লোকের কাছে আমি তাহা বলিয়াছি। ভূপেশ সিংহের চিরশত্রু আমি। কিন্তু হা! তাহাকে পাইলাম না। বন্দুকের আগুনে তাহার প্রাণ যাইবে শুনিয়াছিলাম, ভারি আহ্লাদ হইয়াছিল। আহ্লাদে আহ্লাদে আমি দেখিতে আসিতেছিলাম, টাকার লোভে স্বর্গভূষণকে খুন করিয়াছি।"

"তবে আর বেশী কথা নাই. টাকার লোভে খুন করিয়াছ! এখন জ্ঞানকৃত পাপের উচিত শাস্তি ভোগ কর।"

যে সকল লোক বিচার দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সাধুশান্ত লোকেরা নীরবে আকাশের দিকে হাত তুলিলেন। যাহারা দুষ্কর্ম্মের সখা, তাহারা নীচুদিকে মুখ করিল। বিচারপতি কহিলেন, "দিল্লীর বাদশাহের নামে আমি আজ্ঞা পাঠ করিতেছি, এই নরহন্তা বিতাস্থ যে স্থান হইতে আসিয়াছে, সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে, সেই স্থান হইতে পুনরায় বধ্য ভূমিতে আনীত হইবে। যতক্ষণ না মরে, ততক্ষণ ঘাতুকের খড়্গ ইহার মস্তকের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে।"

যিনি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, বিচারাসনে তিনি আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করেন না। বিচারপতি উঠিয়া গেলেন। রক্ষিবর্গ আসামীকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া চলিল। যে লোক নিজমুখে নরহত্যা অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, বিচারকালে তাহার আর সাফাই সাক্ষী প্রয়োজন করে না। ফলকথা, সেই লোক যে জীবনকালের মধ্যে কেবল এই একটী মাত্র খুন করিয়াছে, ইহা কেহ মনে করিবেন না। তাদৃশ প্রকৃতির অর্থলোভী নীচাশয় অবশ্যই অনেক লোকের জীবনধন হরণ করিয়াছে। কিন্তু পাপকার্য্য সর্ব্বদা অপ্রকাশ থাকে না; সর্ব্বদা প্রকাশও পায় না; কখনও না কখনও প্রকাশ হইয়া পড়েই পড়ে। রামায়ণের অঙ্গদরায়বারের সময় ইন্দ্রজিতকে সম্বোধন করিয়া অঙ্গদ বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।" এটী মহার্থজড়িত যথার্থ কথা। বিতাস্থর পাপবৃক্ষের ফল যথোপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রেই ফলিয়াছে। বিতাস্থ এখন নির্জন কারাগৃহে বন্দী। একপক্ষ পরে প্রাণান্ত।

এই প্রবাহের শিরোনামে আমরা বধুরূপী কবিবর বররুচির বাক্যে পাঠক মহাশয়কে জানাইয়া রাখিয়াছি, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, এই তিনপ্রকার লোক অনন্ত নিরয়গামী হয়। যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকেন, ততকাল সেই সকল পাপীর নরকবাস হইয়া থাকে। নরহন্তা বিতাস্থ এত দিন ছদ্মভাবে হিন্দু সাজিয়া ছিল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকাশিত নাম বিষবখত হুসেন, ওরফে নসীম উদ্দীন।

একপক্ষ অতীত। ষোড়শ দিবসের প্রভাত। অভাগা বন্দী জন্মের মত পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়া যাইতেছে। ষোড়শ প্রভাতের সূর্য্য তাহার চক্ষে শেষ দর্শন দিলেন। ইহ জগতে ইহজন্মে তাহার চক্ষে আর তিনি দর্শন দিবেন না। পৃথিবীর রাজাদের বিচারে এক এক সময় ধাঁধা লাগে। এক এক সময় নির্দ্দোষী লোকে দণ্ড পায়, দোষী লোকে খালাস পাইয়া যায়। আশা চপলা যে সময়ের আখ্যায়িকা, সে সময় ভারতবর্ষে মোগল-বংশের শেষ রাজত্ব। মুসলমানের দণ্ডনীতি যেপ্রকার ছিল, এখনকার ইংরাজের দণ্ডনীতি সেপ্রকার নহে। ইংরাজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের জীবন এই যে, উনশত অপরাধী যদি অব্যাহতি লাভ করে, করুক, কিন্তু একজন নির্দ্দোষ লোক যেন দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়। কথাটী শুনিতে একপ্রকার ভাল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মহিমাও রক্ষা হয় না। এখন আমরা ইংরাজী বিচারের কথা উত্থাপন করিয়া মোগল-রাজত্বের অপমান করিব না। বধ্যভূমিতে তিন নামের এক নামে নরহন্তা দস্যু বিতাসু প্রহরীবেষ্টনে সমানীত। হাতে পায়ে শৃঙ্খল, গলদেশে শৃঙ্খল, পরিধান নীলবর্ণ জাঙ্গিয়া, মাথায় কালো কাগজের উচুঁ টুপী; চতুর্দ্দিকে মানুষের হাট। বেলা দুই প্রহর অপেক্ষা দুই এক দণ্ড বেশী। যে সকল লোক দেখিতে আসিয়াছে, তাহারা অশ্রান্ত কৌতূহলের দাস। এমন অবস্থায় এমন স্থানে অনেক প্রকার লোক থাকে, অনেক প্রকার লোকের অনেক প্রকার মনের ভাব। যখন কোন ভাল লোকের দণ্ড হয়, ভাল লোকেরা তখন সে দণ্ড দেখিতে আসেন না। বঙ্গদেশে নীলবাঁদরের দৌরাত্ম্যের সময় বঙ্গহিতৈষী পাদরী লঙসাহেব যখন কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের আসামী, তখন কলিকাতা রাজধানীর অনেক বড় বড় লোক কৌতূহলপরবশ হইয়া গঙ্গাতীরের সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যতিরেক উদাহরণ। দয়াপরবশ হইয়া কেহ উপস্থিত হইয়া-ছিলেন কি না, এক সময়ে তাঁহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জোড়াসাঁকো সিংহবংশের অল্পদিনের জন্য উজ্জ্বল দীপ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সকলের মাথার উপর মাথা হইয়া সেই বঙ্গবন্ধু লঙসাহেবকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থে যতদূর হয়,—ক্রোরপতিরা যাহা

পারেন নাই, বিচারক্ষেত্রে তিনি তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতিরিক্ত একমাস কারাবাস। গীত উঠিয়াছিল,—

"অসময়ে হরিশ মোলো, লঙের হলো কারাবাস!"

সেই এক ব্যতিরেক উদাহরণ। প্রজালোকের হিত করিতে গিয়া বিদেশী লঙ সাহেব একমাস কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কাহাকে আমরা কাহার কথা বলিতেছি? দীনবন্ধু দীনবন্ধু মিত্র অসময়ে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। হুলুস্থূল ব্যাপার একপ্রকার যেন থামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের রাজধানী যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে মরিয়া মরিয়া আমরা পুরাতন মোগলরাজত্বের কথা আনিতেছি। যখন কোন ভাল লোকের দণ্ড হয়, ভাল লোকেরা তখন সে দণ্ড দেখিতে আসেন না। অদর্শনে স্থানান্তরে থাকিয়া বিচারের নামে,—বিচারকের নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করেন;—অভিসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে নেত্রবারি বর্ষণ করেন। যখন যথার্থ পাপীলোকের দণ্ড হয়, ভাল লোকেরাও সেই সময় আর এক প্রকার কৌতূহলে দণ্ডস্থলে উপস্থিত হন। কৌতূহল দুই প্রকার।— আশ্চর্য্য দেখিবার, আর অনাশ্চর্য্য দেখিবার। এখানে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। হত্যাকারীর সাজা। তথাপি কিরূপ পরিণাম, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত অনেক লোক সমাগত হইয়াছে। দলের মধ্যে অনেকেই অনাশ্চর্য্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী। যাঁহারা দণ্ডনায়ক, তাঁহারা দণ্ডক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম, ভীম, ভীমনিনাদে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজা রঘুবর রাও, রাজকুমার হরবিলাস, রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র, ভিড় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। যাঁহার আদেশে অপরাধীর প্রাণ দণ্ড, ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে শ্লথপদে তিনি অগ্রসর হইয়া আসামীকে কহিলেন, "তুমি এখন কি রকমে মরিতে চাও? তোমার চরমকাল উপস্থিত, তোমার বাসনা পূর্ণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, যদি এক খড়্গাঘাতে আমরা তোমার মস্তক ছিঁড়িয়া ফেলি, তাহা হইলে উচিত শাস্তি হইবে না। দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট আকবর শাহের বংশধর আলমগীর এখনও স্তিমিত প্রদীপের ন্যায় দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। বিচার আছে, অবিচার হইবে না। মনের

অভিলাষ প্রকাশ কর, কি প্রকারে তুমি মরিতে ইচ্ছা কর? বিচারপতি তোমার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিবেন।"

বিতাসু কথা কহিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে কাঁপিতে লাগিল। চক্ষু দেখা গেল না, তথাপি যেন সেই চক্ষু জলে আগুনে একত্র হইয়া মনের ভয়, প্রাণের ভয়, দেখাইয়া দিতে লাগিল।

রাজা রঘুবর রাও রোদন করিতে করিতে অতিক্ষীণস্বরে,—ক্ষীণ অথচ গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমার স্বর্গভূষণ মরিয়াছে। আমার স্বর্গভূষণের জীবনহন্তা এই বধ্যভূমিতে উপস্থিত। আমি দেখিতেছি। না,—না,—না,—আমি দেখিতেছি না, আর দেখিব না। উহার বন্ধন খুলিয়া দাও, শৃঙ্খল খুলিয়া দাও, উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না। অস্ত্রাঘাত যে কি ভীষণ দৃশ্য, স্বর্গভূষণের শরীরে তাহা আমি দর্শন করিয়াছি। অস্ত্রাঘাত করিও না! অস্ত্রাঘাত আমি দেখিতে পারিব না। কুকুর, ডাকো,—হাজার হাজার কুকুর ডাকো! সেই সকল কুকুর,—শিকারী কুকুর উহার মাথার উপর লাফাইয়া উঠুক্। স্কন্ধে চড়িয়া টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলুক্। হস্তের উপর,—যে হস্ত আমার স্বর্গভূষণের প্রাণ লইয়াছে,—সেই হস্তের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিষদন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করুক্! পদাঙ্গুলী হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত,—নাভিস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত, বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠস্থল পর্য্যন্ত,—কণ্ঠস্থল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত, বিষাক্ত দশনাঘাতে এককালে বিদীর্ণ করিয়া ফেলুক্।"

হরবিলাস কহিলেন, "না রাজা! সে ইচ্ছা আমার নয়। কুকুরে দংশন করিয়া কুকুরকে মারিতে পারে না। বন্দুকের গুলিতে ঐ পাপাত্মার পাপ-আত্মাকে বাতাসে বাতাসে উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

লোকেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। দণ্ডনায়ক কহিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা, সে ইচ্ছার অধীন হইয়া আমি কার্য্য করিতে পারি না। স্বর্গ-ভূষণ আমার পরমবন্ধু ছিলেন। অকারণে রাত্রিকালে নির্জ্জনে খণ্ডখণ্ড করিয়া বিনাদোষে যে ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, তাহাকে,—আচ্ছা, আপনারা চুপ করুন, যাঁহার নিকটে সত্য অভিপ্রায় পাওয়া যাইতে পারে, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব। দেখিতেছি, আপনারা অত্যন্ত উত্তেজিত

হইয়াছেন। কুকুর আনিতে বলিতেছেন, বন্দুক আনিতে বলিতেছেন, এ সকল যেন হিংসাবিদ্বেষের উপদেশ। রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র চির দিন নিরপেক্ষ। শত্রুর প্রতিও তাঁহার অক্ষুণ্ণ দয়া। আপনারা একটু শান্ত হউন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, হত্যাকারীর প্রতি সদয় নির্দ্দয়, দুই ভাবের কোন্ ভাব তাঁহার মনে আছে, অপক্ষপাতে তাহা জানিতে পারিলে পুনর্ব্বার চূড়ান্ত হুকুম প্রদান করিতে পারিব। বিচারাসনের আদেশে যাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, কোন অনুরোধেই তাহার ত প্রাণরক্ষা হইতে পারে না, তথাপি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, ভূপেশচন্দ্রের অভিপ্রায়।" ভূপেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া দণ্ডনায়ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার! কি প্রকারে এই নরহন্তা দস্যুর প্রাণদণ্ড হইলে ভাল হয়?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "শত্রুকে আমি ক্ষমা করিতে জানি। অশেষ বিশেষে বিধিমতপ্রকারে বিতাস্থ আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। চিরশত্রু বলিয়া অপ্সরাসুন্দরীকে পত্র লিখিয়াছিল। লিঙ্গেশ্বরের সঙ্গে, স্বর্ণভূষণের সঙ্গে, আনোয়ার বখ্তের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পঞ্চাশ জন গোলন্দাজের গুলির আগুনে আমাকে দগ্ধ করিবার ষড়্যন্ত্র করিয়াছিল। সেই বিতাস্থ এই। সব আমার মনে আছে, কিন্তু তথাপি আমি ইচ্ছা কবি, ইহাকে ছাড়িয়া দিলে ভাল হয়।"

"সাধু! সাধু!! সাধু ভূপেশচন্দ্র!!! যদি তোমার এমন উদার প্রকৃতি না হইবে,—এমন দয়াশীল ক্ষমাশীল যদি তুমি না হইবে, তাহা হইলে ততবড় ততবড় মহা মহা বিপদ হইতে নিস্তার পাইলে কিসের প্রতাপে? সত্যপথ তুমি জান। সত্যের মহিমা তুমি জান। ধর্ম্মের গৌরব তুমি জান। ধর্ম্ম তোমার পবিত্র হৃদয়ের অলঙ্কার। জগদীশ তোমারে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজকুমার! এই জগৎবৈরী পিশাচকে আমরা ক্ষমা করিতে পারিব না। তুমি পার, তোমার মহত্ত্বের পরিচয়; কিন্তু আমরা পারিব না। দিল্লীর সিংহাসন এখনও দিল্লীতে আছে। একজন চোর,—কি নাম, জানি না,—কে একজন নাদের শা,—সম্রাট সাহজাঁহার ময়ূরাসন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যত দিন যতক্ষণ মোগলের রক্ত দিল্লীতে থাকিবে, ততদিন বিশ্ববিখ্যাত আকবর শাহের নাম বিলুপ্ত হইবে না। তুমি রাজ-

কুমার ক্ষত্রিয়কুলে দয়ামায়ার আদর্শ। তোমাকে আমরা ভাল জানি। ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমার অনুরোধ আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। ঘাতুক্! ঘাতুক্! কে আছিস্! ক জন আছিস্! আয়! শীঘ্র শীঘ্র শত শত তরবারি ধারণ কর্! এই পাপিষ্ঠ নরহত্যাকারী দুরাত্মা বিতাসু, দুরাত্মা বিষবৎ্ত, দুরাত্মা নসীম উদ্দীন, তিন নামে এক। বাদ্শাহের আদেশে এই কলুষিত আত্মাকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিতে হইবে।"

দ্বাদশ তরবারিহস্তে দ্বাদশজন ঘাতুক আসিয়া উপস্থিত হইল। আদেশকর্ত্তা পুনর্ব্বার ভূপেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বিনীতস্বরে কহিলেন, "রাজকুমার! আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তুমি ক্ষমা জান, কিন্তু আমি ক্ষমা করিতে পারিলাম না। ক্ষমার পাত্র, অপাত্র তুমি হয় ত বিবেচনা করিতে জান না, দয়ার শরীর তোমার। কিন্তু রাজ-কুমার! রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণ যেরূপ আদেশ করেন, তাহার অন্যথাচরণ করিলে অপরাধী হইতে হয়।" হরবিলাসের দিকে চাহিয়া তিনি আবার কহিলেন, "তুমি রাজকুমার বড় হিংসাপরবশ। তোমার কথায় আমি সায় দিতে পারিলাম না; ক্ষমা করিও।" রাজা রঘুবরবাহাদুরের দিকে চাহিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! তুমি একজন দেশমান্য নরপতি। তোমার কথাতেও আমি বাদ্শাহের হুকুম অমান্য করিতে পারি-লাম না। পুত্রশোকে হয় ত তুমি পাগল হইয়াছ, পুত্রশোকে হয় ত তুমি জ্ঞানহারা হইয়াছ। মহারাজ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এক দিকে নরহত্যাকারী ফৌজদারী আসামী, অন্য দিকে তোমাদের বড় বড় অনুরোধ। কিন্তু কি করি মহারাজ! বাদ্শাহ না থাকিলেও বাদশাহের আসন আছে। আকবর শাহ না থাকিলেও দিল্লী রাজধানীর নাম আছে; নামের সঙ্গে রাজধানীর মাটী আছে। সেই মাটীকে চুম্বন করিয়া রাজদণ্ডাজ্ঞা আমি পালন করি।" চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "শোন তোমরা সকলে। আমার এক হুকুম আছে। ঘাতুক্! প্রস্তুত হও। একবারে না,—একবারে ইহার মস্তকচ্ছেদন করিও না। এককালে মস্তকচ্ছেদনে ঈদৃশ মহাপাপীর মহাপাপের উচিত শাস্তি হয় না।

সাবধানে শোন।—প্রথমতঃ দশ কোপ্। এক এক কোপে, একটী একটী করিয়া উহার পায়ের দশাঙ্গুলী ছেদন কর। আবার তরবারি উত্তোলন কর। আবার দশ কোপ্! সেই দশ কোপে উহার দুই হাতের দশাঙ্গুলী ছেদন কর। তাহার পর জানুজঙ্ঘা উহার কলুষিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। উদরে তরবারি প্রহার কর। উদরে যত পাপ লুকাইয়া আছে, বাহির করিয়া দাও। একজনে না, একত্রে দ্বাদশ জনে। আবার অসি ধারণ কর। বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কর। তাহার পর বাহু।—যে বাহু বহুতর নিরপরাধীর দেহ ছেদন করিয়াছে, খণ্ডে খণ্ডে সেই বাহু খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া কুকুর শৃগালকে ভক্ষণ করিতে দাও। যখন দেখিবে নিশ্বাস পড়িতেছে, সে নিশ্বাসে যখন সংসারের ধর্ম্ম পুড়িয়া যাইতেছে দেখিবে, তখন এক কোপে নাসিকা ছেদন কর। যখন দেখিবে, ধার্ম্মিকের দিকে দারুণ যন্ত্রণায় কুটিল কটাক্ষে রক্তচক্ষু ঘুরাইতেছে, চক্ষে তলোয়ারের খোঁচা মার। তারাপুত্তলী ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া যাউক্। যখন দেখিবে, আমার এই হুকুম তাহার পাপকর্ণে প্রবেশ করিতেছে, বিলম্ব করিও না,—অসি যেন নিশ্চেষ্ট থাকে না, নেত্রের পলক পড়িতে না পড়িতে অবিলম্বে কাণ কাটিয়া দাও। এই আমার হুকুম।”

হুকুম তামিল হইয়া গেল। পাপীর জীবন শীঘ্র যায় না, কোথায় দূর দূরান্তরে নরক আছে, কেহই জানে না। আমি একটী কথা জানি। কোথা হইতে কোথা আসিয়াছি, তাহা জানি না, কিন্তু যেখানে আসিয়াছি, সেই খানেই স্বর্গ আছে, সেই খানেই নরক আছে। খাঁদা, বোঁচা, হাতকাটা, পা কাটা, চক্ষু কাণা, বিদীর্ণবক্ষ, বিদীর্ণ উদর, চৈতন্যশূন্য দেহকে খচ্চরে চড়াইয়া সাতবার নগরপ্রদক্ষিণ করাইয়া আনা হইল। আবার সেই বধ্য-ভূমি। “আর কেন?’ দণ্ডনায়ক কহিলেন, “আর কেন? কুমার ভূপেশ-চন্দ্র! কুমার হরবিলাস! রাজা রঘুবর রাও! এ মহাপাতকীর মুখে তোমরা আর একটী কথাও শুনিতে পাইবে না। তবে আর কেন?”

ভূপেশচন্দ্র যেন কোন আকস্মিক কারণে বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভিড়ের মধ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। দ্বাদশ খড়্গের এক খড়্গ মহাপাতকীর কণ্ঠদেশে সজোরে বিনিক্ষিপ্ত হইল। মুণ্ডটা অনর্গল রক্তবমন করিতে

করিতে পাঁচহাত তফাতে ছুটিয়া পড়িল। ধুপুস্ করিয়া মস্তকশূন্য দেহ ভূতলে নিপতিত। পুরাণের কথাপ্রমাণে আগে আগে কাটামুণ্ড কথা কহিত, কিন্তু এ মুণ্ড কথা কহিল না। দর্শকচক্রমণ্ডলী এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া, বাদশাহের নামে সেলাম করিয়া পূর্ব্বের বিভাগমত বিভাগে কেহ কেহ আনন্দে, কেহ কেহ ক্রোধে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বেলা কত? কে বা জিজ্ঞাসা করে, কে বা উত্তর দেয়? কিন্তু আমি আছি। রক্তবাস পরিধান করিয়া অস্ত্রশূন্য হস্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমি উত্তর করিতে পারি, বেলা নাই। বিশ্বচক্র প্রভাকর রক্তবর্ণ হইয়া অস্তাচলে যাইতেছেন। নীলাম্বর পরিধান করিয়া নীলাম্বরী সন্ধ্যাদেবী নীলাম্বর হইতে ধরাধামে আগমন করিতেছেন। ও মা! তুই কে মা? কালো কাপড় পরিয়া বিকটবেশে, বিকটবদনে আমাদের ভয় দেখাইতে আসিতেছিস্, তুই কে মা? অগ্নি! অগ্নি! অগ্নি! সন্ধ্যাদেবি! তোর মুখে কি অগ্নিবর্ষণ হয়? মানবক্ষেত্রে সে অগ্নি কি মানুষকুলকে দগ্ধ করে? না ত!—না ত! শান্তি! শান্তি! শান্তি। তবে থাক তুমি মা! সকলকে শান্তি প্রদান কর। মানুষ মরিয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে যেন মানুষের হাত পা আসিয়া আমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে! আমি আর এখানে থাকিব না। দেবি! নমস্কার তোমার চরণে, আমি বিদায় হইলাম।

———

পঞ্চষষ্টিতম প্রবাহ।

তুমি কি আমার মা ?

আঁধার আছিল বিশ্ব আজি কিবা সুপ্রকাশ।
এতদিনে মহাদেবি ! পূর্ণ হলো অভিলাষ ॥
মাতাপিতা নাহি জানি উদাসী সন্তান।
শান্তিময়ী তুমি দেবি ! কর শান্তি দান ॥

বঙ্গরত্ন।

রাজা রঘুবর বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ। রাজা রঘুবর, কুমার হরবিলাস, কুমার ভূপেশচন্দ্র, একস্থলে উপবিষ্ট। দুটী মর্ম্মান্তিক বেদনায় রাজা রঘুবর রাও নিতান্ত ম্লান, নিতান্ত ম্রিয়মাণ। সে দুটী কারণ যে কি, পাঠকমহাশয় তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন। প্রথম কারণ, তিনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, যাহাকে এখন রাণী বলিয়া পরিচয় দিতে হইতেছে, সেই নারী কুমারীকালে ব্যভিচারিণী। কুমারী অবস্থায় সে একটা কন্যা প্রসব করিয়াছে। সেই কন্যা আবার গুরুজী অশ্বানন্দস্বামীর ঔরসজাতা।—এ মর্ম্মান্তিক বেদনা মানীলোকের পক্ষে একান্তই অসহ্য। দ্বিতীয় কারণ, নিদারুণ পুত্রশোক। বিশ্বাসঘাতক দস্যুহস্তে স্বর্গভূষণের নিধন। কুমার হরবিলাস অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিতেছেন, ভূপেশচন্দ্রও দুটী একটী কথা বলিয়া বুঝাইতেছেন; কিন্তু রাজা প্রবোধ মানিতেছেন না। ভূপেশচন্দ্র অল্পকথা কহিতেছেন, তাহার কারণ আছে। রাজা রঘুবর রাও তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন। পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে গেলে, অসংশয়ে নিশ্চয়ই প্রতীত হয়, তিনিই সমস্ত কুচক্র, সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলীভূত কারণ। তিনি আর তাঁহার পুত্র স্বর্গভূষণ রাজ্যের বদমাস লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া নিরীহ, নিরপরাধ, ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর প্রতি যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। কতক কতক

গোপনে, কতক কতক প্রকাশ্যে। আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক যদি অকপট ধর্ম্মশীল না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারই হস্তে স্বর্গভূষণের জীবনান্ত হইত। কেবল তাঁহারই মাত্র নয়, কুচক্রিদলে যাহারা যাহারা সংশ্লিষ্ট, তাহাদের সকলেরই জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন হইত, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

রাজা রঘুবর রাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া কুমার হরবিলাসকে কহিলেন, "রাজকুমার! আমি সমস্তই বুঝিতে পারি; কিন্তু কে যেন আমাকে সংসারের সমস্ত কথা ভুলাইয়া দিতেছে। আমি যেন অমূল্য জ্ঞানবস্তু হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমি যেন চৈতন্যহারা হইতেছি। ভূপেশ-চন্দ্র! উঃ! ভূপেশচন্দ্র! তুমি আমাকে যে দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছ, তাহাই আমার উপযুক্ত।—তোমার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলিতেছে, আগুন আমাকে পুড়াইবে, সেই আগুনই আমার উপযুক্ত। আমি পাপী। বৎস! উঃ! পূর্ব্বে যদি ইহা আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে বৎস! কখনই তোমাকে ততদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। বৎস! এখন তুমি নিরাপদ হইয়াছ, আর কেহ তোমার উপর অত্যাচার করিবে'না। আমি হতভাগ্য; পৃথিবীতে আমার বাঁচিয়া থাকিবার অতি অল্পদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। জীবনান্তে নিরয়গামী হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে ঘোর নরকে বাস করিতে হইবে। সংসারে আর আমার অভিলাষ নাই। এই রাজ্যসম্পদ তোমারই। কুমার হরবিলাস বাহাদুর আমার প্রতিনিধি হইয়া সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। এই ক্ষেত্রেই তুমি আরও একটী নিগূঢ় পরিচয় জানিতে পারিবে। কে তুমি, কাহার পুত্র, কিছুই তুমি জান না। এই ক্ষেত্রেই সমস্ত নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ। কুমার। কুমার! রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র! আর আমি কথা কহিতে পারিতেছি না। বক্ষঃস্থল ভারী হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠরন্ধ্র যেন নিবিড় ধূমপুঞ্জে অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভূপেশচন্দ্র! ভূ—পে—শ—চ—"

রাজার চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। একবার ভূপেশচন্দ্রের দিকে, একবার হরবিলাসের দিকে সজলচক্ষু বিনিক্ষেপ করিয়া তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

ভূপেশচন্দ্র ভাবিতেছেন, এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছেন সত্য, চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে সত্য, একমাত্র পুত্রশোকে লোকে পাগল হয়, ইহাও সত্য, কিন্তু আমার প্রতি এ প্রকার সম্ভাষণ অতীব আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য অপেক্ষাও আশ্চর্য্য! আমাকে ইনি বৎস বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন! রাজ্যসম্পদ আমারে সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন, এ সকল কি কথা? এখনও কি বঞ্চনাছলনা ইহাঁর হৃদয়ে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে? এত আঘাত সহ্য করিয়াও এখনও কি ইনি কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না? এখনও কি আমাকে আরও বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিতে ইহাঁর অভিলাষ আছে? আর আমার সহ্য করিতে বাকীই বা কি? কোন কষ্টকে, কোন যন্ত্রণাকে, আমি ভয় করি না। প্রাণান্ত হইতেছিল, একজন সাধুপুরুষের অনুগ্রহে,—আর যদি যথার্থই স্বীকার করিতে হয়, বাদ্‌শাহের অনুগ্রহে প্রাণরক্ষা হইয়াছে। রক্ষা না হইলেই ভাল হইত। বাঁচিবার ইচ্ছা আমার কিসের জন্য? দেহের মায়ার জন্য নয়, সংসারের সুখভোগের জন্য নয়, পৃথিবীর আমোদবিলাসের জন্য নয়, কেবল সেই মাত্র প্রাণময়ী অপ্সরাসুন্দরীর জন্য। আমার জন্য যে অভাগিনী পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পিতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছে, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে, ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, সেই অপ্সরাসুন্দরীর জন্য আর কিছুদিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার আমার ইচ্ছা হয়। যদিও জানি, রাজা বিরাটকেতু আমার অপ্সরাসুন্দরীর জন্মদাতা পিতা নহেন, কিন্তু শৈশবাবধি অন্নদাতা পালনকর্ত্তা যিনি, জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা তিনি নিতান্ত ছোট হইতে পারেন না। রাজা বিরাটকেতু আমাকেও প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি আমার শত্রু ছিলেন না, অকস্মাৎ কেন যে শত্রু হইলেন, তাহাও বুঝিলাম না। আমি অভাগা, মাতাপিতা জানি না, লোকে অনুমান করে, আমি সামান্য লোকের পুত্র, সেই নিমিত্তই বিরাটকেতু আমাকে অপ্সরা দানে অসম্মত। ইহা হইতেই পারে, ইহাকে অস্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না। রাজার মেয়ে, সামান্য লোকের হস্তে কেনই বা অর্পিত হইবে? আমার যদি সত্য পরিচয় কিছু থাকিত, তাহা হইলে আমি বিরাটকেতুকে কিছু বুঝাইতে পারিতাম। বুঝাইবার

কোন সুখই নাই। কেহ কেহ আমাকে বলে রাজকুমার। কিন্তু সে কেবল উড়াভাষা কথা। ওঃ! কেন এত ভাবি? অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ত ফলিতেই চায়। ফলিয়াছেও অনেক। এখনও ফলিতেছে। কেন তুমি অভাগিনী? অপ্সরা! কোথায় তুমি? অভাগিনি! কেন আমাকে ভালবাসিয়াছিলে? উঃ!—বক্ষে করাঘাত করিয়া রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র আবার আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, অপ্‌সরাসুন্দরীকে আর দেখিতে পাইব না! কোথায় দেখিতে পাইব? আর কি আমার অপ্‌সরাসুন্দরী জগতে আছে? শেষ বিদায় দিয়াছি, আমার প্রাণময়ী দয়াময়ী জানেন, আমি মরিয়া গিয়াছি। আর কি আমার অপ্‌সরাসুন্দরী বাঁচিয়া আছেন! অকৃত্রিম প্রণয়ের বন্ধন, সে বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলে, কাহার সাধ্য! যম ছিঁড়িয়া দিতে পারেন, তবুও একটু একটু সূতা টানে। জ্ঞান হয়, মরিলেও যেন বিচ্ছেদ হয় না। দুষ্ট রাহুচক্রে পড়িয়া অবিচারে আমার প্রাণ গিয়াছে, নিশ্চয়ই অপ্‌সরাসুন্দরী ইহা জানিয়াছেন। তবে কি সে সতীলক্ষ্মী,—না ত! উঃ! এই হরবিলাস আমার পরমহিতৈষী বন্ধু। কোথা হইতে ইনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? অকস্মাৎ অকারণে ইহাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ইনি আমার বন্ধু হইবেন, ইহা ত জানিতাম না! তবে কেন?—তবে কেন ইনি আমার প্রতি এত সদয়? তবে কেন ইনি এখানে? না,—হইল না, হইল না,—মীমাংসা হইল না। বোধ করি, ইহার মধ্যে আরও কিছু গুপ্তকথা আছে। সেই কথাই কথা। মুখ দেখিয়া বুক নাচে কেন? হরবিলাসরঘুপৎ অতি দয়ালু সওদাগর। এক নামে নয়, দুই নামে। প্রথম নাম হরবিলাস, দ্বিতীয় নাম রঘুপৎ।

ভূপেশচন্দ্র ভাবিতেছেন। রাজার চক্ষু ঘুরিতেছে। হরবিলাস সুস্থির। কতক্ষণ তিন জনে একত্র, তাহা আমাদের ঠিক মনে হয় না। নিকটের লোকে যখন শোকে দুঃখে কাতর হয়, তখন তাহাদের শোকদুঃখের সঙ্গে আমরাও যেন জড়াইয়া পড়ি। যাঁহারা একটু ভাল করিয়া সংসার দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথায় অমিল দিতে পারিবেন না। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি। পাখী আকাশে উড়িয়া যায়, কিন্তু বাসা ভুলিয়া যায় না। আমি বাসা ভুলিয়া যাইব না। ভূপেশচন্দ্র

আবার ভাবিতেছেন। এই হরবিলাস ত আমার অনেক দিনের পরিচিত সওদাগর বন্ধু। আজ অকস্মাৎ এ কি কথা শুনিলাম? রাজা রঘুবর ইহাঁকে বারম্বার রাজকুমার বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন; সওদাগর হরবিলাস তবে কি রাজকুমার? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কত অভাবনীয়, অচিন্তনীয় বাক্য আমার কর্ণের কাছে আসিতেছে, কত অভাবনীয়, অচিন্তনীয় দৃশ্য আমার চক্ষের নিকট আসিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ উদয় সিংহ! আর কি তুমি দেখা দিবে না? আমার মানসের অন্ধকার কি চিরদিন এমনি অন্ধকার হইয়া থাকিবে? মহারাজ! মহারাজ! অপ্সরা! অপ্সরা!"

ভূপেশচন্দ্র বসিয়া ছিলেন, লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া গগনপানে হাত তুলিয়া ঠিক্ যেন পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অপ্‌সরা! অপ্‌সরা! প্রাণাধিকা তুমি—"

পশ্চিম দিকের একটা দরজা খুলিয়া গেল। "ভূপেশ! ভূপেশ! ভূপেশ! প্রাণাধিক! আয় বাছা কোলে আয়! আমি পাগলিনী, দেখ্ এসে! ভূপেশ!—" আর কথা ফুটিল না। একটী নারীমূর্ত্তি স্তম্ভিতে স্তম্ভিতে ছোট ছোট কথায় এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে মূর্চ্ছাগতা।

"কি হইল কি হইল!" বলিয়া কুমার হরবিলাস সেই মূর্চ্ছিতা রমণীর নিকটে সচঞ্চলে ধাবিত হইলেন। দুই হস্তে চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে রাজা রঘুবর রাও সেই মূর্চ্ছাপন্না রমণীর নিকটে,—কেবল নিকটে না, দক্ষিণ হস্তের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হরবিলাস দেখিলেন, মহাবিভ্রাট। কাহাকে তুলিবেন, কাহাকে সচেতন করিবেন, নির্ণয় করিতে না পারিয়া অকষ্টবদ্ধে পড়িলেন। গাছের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে গাছ যেমন কথা কহিতে না পারিয়া পত্রপুষ্পশূন্য হইয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, ভূপেশচন্দ্র সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি যে কি, কেন যে কি, কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। চমকিতভাবে কেবল অস্ফুট বাক্যে থামিয়া থামিয়া উচ্চারণ করিলেন, "ইহারা করে কি?" হরবিলাসের দিকে চাহিয়া কম্পিত—কম্পিত—বিকম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা করে কি?"

হরবিলাস অন্যমনস্ক ছিলেন, সে প্রশ্নে উত্তর করিলেন না। দুইজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল। এমন সময়ে দাসী আমাদের প্রয়োজন। যেখানে মূর্চ্ছা, সেখানে স্ত্রীজাতি ভিন্ন শুশ্রূষাকারিণী শান্তিদায়িনী আর কেহই হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি মায়াদয়ার আধার, বিপদক্ষেত্রে করুণাময়ী দেবী। যখন যেমন সময়, তখন ঠিক্ তেমনিভাবে নারীজাতি মূর্ত্তিমতী দেবী হইয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। রাজার চৈতন্য হইল। বারিবায়ু সঞ্চালনে রাজা রঘুবর রাও উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু সে মূর্ত্তি তখন কেমন মূর্ত্তি?— দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথার উপর দুই হাত, হাতেরা কি অচঞ্চল? কখনই সম্ভবে না। বাতুলালয়ে বাতুল যেমন হাসিয়া খেলিয়া নৃত্য করে, মনের উল্লাসে গীত গায়, রাজা রঘুবর রাও ঠিক যেন সেই প্রকার উন্মত্ত। দুই হস্তে মাথার দুই দিকের চুল ছিঁড়িতেছেন। নারীমূর্ত্তির চৈতন্য নাই। মূর্ত্তি দেখা গেল না, লোক আসিল না, ছায়া পড়িল না, কিন্তু একটী স্বর শুনা গেল, সুস্পষ্টস্বর। স্বর বলিতেছে,—

"এমন যাতনা বুঝি আর নাই এ সংসারে।
দারুণ বাড়বানল যেন দহিছে আমারে॥
মরি মরি মনে করি, ভবমায়া পরিহরি,
তবু দয়াময় হরি রাখিছেন ইহ পারে॥
মহামায়া পারাবার, নাহিক তাহে নিস্তার,
নিস্তারের তরি বিনা, কে তারে ভবদুস্তারে॥"

রাজকুমার হরবিলাস চরণ ধারণ করিয়া অনেক প্রকারে শুশ্রূষা করিলেন, একটু একটু যেন জ্ঞান হইল, আরক্ত নয়নে এলোকেশে এলো-কেশী যশেশ্বরী দেবী উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু যেন ঘুরিতেছে। মস্তক যেন ঘুরিতেছে, ঘূর্ণিত চক্ষের কাছে পৃথিবী যেন ঘুরিতেছে, অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছে, বক্ষঃস্থল কাঁপিতেছে, ললাট, কপোল, ওষ্ঠ কাঁপিতেছে, ঝড়বাতাস নাই, চুলেরাও কাঁপিতেছে। রুক্ষচুল। দেবী যশেশ্বরী যদি রাজকুমারী না হইয়া সামান্য ঘরের কুমারী হইতেন, তাহা হইলে দেখাইত, ঠিক যেন

রাক্ষসী। কিন্তু তাহা ত না, রাজকুমারী রাজকুমারীই থাকিবেন, থাকুন্; তাহাই আমাদের ইচ্ছা। আশা-চপলার ইচ্ছা যে, যে যেভাবে থাকিতে ভালবাসে, সে সেই ভাবেই থাকুক্। স্থান হইয়াছে, স্থানের একটু কথা আছে। পূর্ব্বস্মৃতি। যশেশ্বরী পাগলিনীর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন, "ভূপেশচন্দ্র! প্রাণাধিক্ ভূপেশচন্দ্র। যাদু! প্রাণের অধিক প্রাণ। সর্ব্বস্ব তুই আমার! আয় বাছা কোলে আয়! গর্ভে ধারণ করিয়াছি, প্রসববেদনা সহ্য করিয়াছি, শাস্ত্রীয় বিবাহের প্রথম ফল তুই। তথাপি লোকলজ্জার ভয়ে সূতিকাগার হইতে তোরে আমি বিদায় করিয়াছিলাম। হা বৎস! হা ভূপেশচন্দ্র! সে দিন আমার কি দুর্দ্দিন ছিল, আজ আমার কি দিন! বাছা! সব আমি জানি বাছা। কিন্তু কি করি, আমি আজীবন কুমারী। কুল-লজ্জা, লোকলজ্জা। গান্ধর্ব্ববিবাহ এখন আমাদের নাই, রাজা রঘুবর রাও আমারে স্নেহ করেন সত্য, কুমারীব্রতাচারিণী বলিয়া আদর করেন সত্য, কিন্তু এই সত্য যদি এতদিন অপ্রকাশ না থাকিত,—আয় বাছা কোলে আয়! আমি তোর গর্ভধারিণী জননী।"

"মা! মা! তুমি কি আমার মা? লোকে আকাশ হইতে পৃথিবীতে আইসে, পৃথিবী হইতে নরকে যায়, আমি কি নরক হইতে স্বর্গে উঠিলাম? মা! পৃথিবীতে কি আমার মা আছে? জানিতাম না ত। তুমি কি পৃথিবীতে ছিলে? না ত, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছ। এতদিন জানিতাম না, এখন জানিতেছি, আমার জননী স্বর্গদেবী। আর কেন প্রতারণা! আর কেন প্রতারণা কর মা! এই অভাগা সন্তানকে যত যন্ত্রণা দিতে হয়, দিয়াছ, যত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা আমি সহ্য করিয়াছি। কিন্তু দেবি! এতকাল লুকাইয়াছিলে কি অপরাধে? চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া রাখ দেখি, পুরাণের বাক্য প্রমাণে পর্ব্বতের আড়ালে লুকাও দেখি, পর্ব্বত ভেদ করিয়া তোমার স্তনক্ষীর আমার মুখে আসে কি না দেখিব।"

"ভূপেশ! ভূপেশ! প্রাণাধিক্ প্রাণ! এই অভাগিনীর জীবনের একমাত্র প্রদীপ! আমার কপালের দোষে তোমার কপালে যে তত যন্ত্রণা ছিল, জানিতাম না।"

ভূপেশচন্দ্র কতক্ষণ যে ধ্যানমগ্ন হইয়া কত কি চিন্তা করিলেন, আমরা

যদি মুনিঋষি হইতাম, তাহা হইলে হয় ত কিছু কিছু বুঝা যাইতে পারিত। কিন্তু যৎসামান্য মানুষ আমরা, স্বভাবতই ভ্রান্তচিত্ত। এই দেখি এই আছি, এই ভাবি আর কিছু। কাজে কাজে পদে পদে ভুল হয়। রাজকুমার হরবিলাস মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজাকে নিস্তব্ধ হইতে বলিয়া ভূপেশ-চন্দ্রকে তিনি কহিলেন, "রাজেন্দ্রকুমার! শ্রবণ কর! এই দেবী যশেশ্বরী তোমার জননী। ইনি আজীবন কুমারী নহেন। মহারাজ মহানন্দ বাহাদুরের সহিত গান্ধর্ব্ববিধানে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। সেই বিবাহের ফল তুমি। মহারাজ মহানন্দ বাহাদুরের বংশফল তুমি। এই যশেশ্বরীদেবী রাজা রঘুবরের সহোদরা ভগ্নী। শোচনীয় অভাগা স্বর্ণভূষণের পিসীমা। ইহাঁর চরণে তুমি প্রণাম কর। এখনও হয় ত তুমি চিনিতে পারিতেছ না, অতি শৈশবে ইনি তোমাকে ধাত্রীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, কেহই তাহা জানে না। এখন প্রকাশ হউক, রাজা মহানন্দ বাহাদুরের পুত্র তুমি, দেবী যশেশ্বরীর পুত্র তুমি, শ্রীমান্ রাজা রঘুবর রাও বাহাদুরের অবিবাহিতা কুমারী ভগ্নীর—"

"হরবিলাস! তুমি আমাকে কি কথা বল? অবিবাহিতা কুমারীর পুত্র আমি? ভূপেশচন্দ্র অবিবাহিতা কুমারীর পুত্র? হরবিলাস! অন্তরের সহিত তোমারে আমি স্নেহ করি। সেই জন্য এখনও আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতেছি। তুমি হরবিলাস, কি বলিয়া উচ্চারণ করিলে অবিবাহিত পুরুষের ঔরসে, অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভে ভূপেশচন্দ্রের জন্ম?"

"না রাজকুমার! তা না। তুমি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র জান না। যদিও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তথাপি তোমাকে আমি হিন্দুশাস্ত্র শিখাইতে পারি। রাজকুমার! সত্যই তুমি রাজকুমার। তুমি অজ্ঞাত, আমি জ্ঞাত। আমাদের শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। তুমি রাজকুমার গান্ধর্ব্ববিবাহের বংশধর। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।"

"সেই জন্য তুমি বুঝি—"

যশেশ্বরীদেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকারের সঙ্গে যদি সৌদামিনীর খেলা থাকিত, তাহা হইলে গোয়ালিয়রের রাজা, ইন্দোরের

রাজা, জয়পুরের রাজা উদয়পুরের রাণা, একটু একটু ভয় পাইতেন। কিন্তু সৌদামিনী তখন আকাশে ছিল না। সৌদামিনী বড় দুষ্টমেয়ে। বারমাসের মধ্যে কোন্ মাসে কখন আসে, কখন যায়, সকল মনুষ্য তাহা দেখিতে পায় না। সৌদামিনী যেমন হাসিতে পারে, আমাদের নায়ক-নায়িকারাও প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে সেইরূপ হাসিতে পারেন।

অপর কাহারও সঙ্গে আর কাহারও কথা হইল না। পাগলিনীর মত যশেশ্বরী দেবী কহিতে লাগিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! আমার স্তনদুগ্ধে তোর শরীর পরিপুষ্ট হয় নাই; কিন্তু বাছা! তুই যে দিবানিশি আমার অন্তরে জাগিস্! দেখিতেছি ঝড়ি, দেখিতেছি লিঙ্গেশ্বর, দেখিতেছি বিতাস্থ, শুনিতেছি বিচার, শুনিতেছি প্রহার, শুনিতেছি কয়েদ, শুনিতেছি দাগ, ঘরে বসিয়া সব শুনিতেছি। শেষে শুনিলাম, তাহারা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে! যাদু! জীবনের সর্ব্বস্ব! প্রাণের আধার! হৃদয়ের দীপ! ভূপেশ-চন্দ্র! তাহারা তোমারে মারিয়া ফেলিবে!—উঃ! তাই বুঝি? ভূপেশ! ভূপেশ! তাই জন্য বুঝি আমার প্রাণ কেমন করিতেছে! তাই জন্য বুঝি আমার ডানচক্ষু নাচিতেছে! আয় বাছা কাছে আয়! আর আমি সম্বরণ করিতে পারি না। ভূপেশ! সত্য! সত্য! সত্য! তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান। হাতে তোমার অসি আছে। দাও! সেই অসি ঘুরাইয়া আজ আমি শত্রুকুল নির্মূল করিব। রাজা রঘুবর! কাঁদিতেছ কেন? ক্ষত্রিয়সন্তানেরা কি পুত্রশোকে কাঁদে? অস্ত্র ধারণ কর, কে তোমার পুত্রের শত্রু, তাহার মস্তক আনিয়া আমার পদতলে দাও! হরবিলাস! তুমিও রাজার সঙ্গে যাও। আমার ভূপেশচন্দ্র আমার কাছে থাক্। জীবন জুড়াইবার এমন ধন আর সংসারে কিছুই নাই।"

"মা! তুমি কি আমার মা? মাতৃস্নেহ যদি পাইতে হয়, তোমার কাছে তাহা কি আমি পাইব? মা! ভূপেশচন্দ্র বাঁচিবে, ইহা কি তুমি জানিয়াছিলে? জননি! আমাকে বাঁচাইবার জন্য তুমি কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে? এখনও আমি অন্ধকারে আছি, এখনও কিছুই জানিতেছি না। ইচ্ছা করিলেই যে জানিতে পারিব, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। জননি! সদয় হইয়া আমাকে বল, আমি কে?—

কে আমি কাহার আমি কহ সুরেশ্বরি!
ভক্তিভাবে পাদপদ্মে প্রণিপাত করি॥
বাঁচিতে আসিয়া থাকি বাঁচিয়া থাকিব।
ভক্তিভাবে মা তোমারে মা বোলে ডাকিব॥
জননী আমার তুমি, নাহি জানিতাম।
জানিয়াছি, আজি হতে দাস হইলাম॥
মাতৃহারা পুত্র আমি। তরবারি করে,
দিনে দিনে ভ্রমিতেছি বিশ্বচরাচরে॥
উদাসী সন্ন্যাসী নই বীরেন্দ্রকুমার।
মা তুমি জানিনু এবে সংসারের সার॥"

"বাছা!" কাঁদিয়া কাঁদিয়া আনন্দা দেবী কহিলেন, "বাছা! তোর কথা ফুটিয়াছে? বাছা! তুই বেঁচে আছিস্? কারা?—কারা?—উঃ! কারা? কারা তারা? কারা আমার এই প্রাণের পুত্তলীকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছিল? ভূপেশচন্দ্র! আহা! নাম শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এ নাম তোরে কে দিয়াছিল যাদু? আমি,—আমিই দিয়াছিলাম। এই অভাগিনীর গর্ভে তোর জন্ম হইয়াছে। ভূপেশ! আমার জীবনের সর্ব্বস্বধন! হৃদয়ের সর্ব্বস্ব! আমিই তোর অভাগিনী জননী। কেন বাছা তুই এই অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি? আমি হয় ত কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই পাপের ফল,—বৎস! সেই পাপের ফল, আমি হয় ত ভোগ করিলাম না,—আমি ভোগ করিলেই ভাল হইত। বৎস! এই পাপিনীর গর্ভে জন্ম বলিয়া,—ভূপেশ!—আহা! কি চমৎকার নাম!—এই পাপিনীর গর্ভে জন্ম বলিয়া, এই নবীন বয়সে তোরে বাছা এই পাপসংসারের এত যন্ত্রণা! সহ্য করিতে হইল। ভূপেশচন্দ্র! আয় বাছা একবার কোলে আয়! যখন সেই দাসীর হস্তে তোরে আমি সঁপিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, কিছুই জানা ছিল না, কোন জ্ঞান ছিল না, নির্ব্বাক চক্ষু ঘন ঘন আমার দিকে চাহিয়া যেন কত কি কথা বলিয়াছিল, মনে পড়ে আর বুক ফেটে যায়!

যাহারা বলে, চক্ষু কথা কহিতে জানে না, তাহারা মূর্খ। চক্ষু যত কথা কহিতে জানে, রসনা তত কথা কহিতে জানে না। ভূপেশচন্দ্র! ছেলেবেলা তোর ঐ দুটী চক্ষু আমার কাছে অনেক কথা কহিয়াছে! ভূপেশ! আমি তোরে প্রসব করিয়া পরের হাতে সঁপিয়াছিলাম; নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম না, লুকাইয়া লুকাইয় দেখিতে যাইতাম। তুমি অজ্ঞান, তোমার মুখে কথা ছিল না, ঝাঁপাইয়া কোলে আসিতে, আমি কাঁদিতাম, আমার চক্ষে জল পড়িত, তুমি হাসিতে, তুমি কাঁদিতে, চক্ষের জল মুছাইয়া দিতাম, বুকে, রাখিয়া বিধুমুখে চুম্বন করিতাম। বাছা! বাছা! ভূপেশচন্দ্র! কিছুই তুমি জানিতে না। এখন তুমি এত বড় হইয়াছ! চক্ষের নিকটে আমি তোমারে দেখিতেছি; এখনও বুক ফাটিয়া যাইতেছে কেন বাছা? দুরন্ত সংসারের দুরন্ত লোকেরা তোমারে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে, আমি সব জানি। দাসীপুত্র, দাসপুত্র বলিয়া তোমারে অপমান করিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি, কুকুর বলিয়াছে, শূয়োর বলিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তাহাও জানি। কিন্তু ভূপেশ! না,--বাছা আমার! রাজপুত্র হইয়া তুমি পথের কাঙ্গালী হইয়াছ! ঝুড়ী মাথায় করিয়া মাটী বহিয়া লইয়া গিয়াছ! পাঁচ কড়া কড়ীর জন্য কুলীর সঙ্গীদের সঙ্গে সঙ্গে তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়াছ! মানুষে তোমাকে গালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, তুমি চক্ষের জলে ভাসিয়াছ! সব আমি দেখিয়াছি। বুক যদি ফাটিয়া যাইবার হইত, ফাটিয়া যাইত; আর তোমারে দেখিতে পাইতাম না, তুমিও আর আমারে দেখিতে পাইতে না। সমস্তই আমি জানিতাম, কিন্তু তুমি কিছুই জানিতে না। বুড়ীর ঘরে যখন আগুন লাগিয়া গেল, তখন তুমি নিরাশ্রয় হইলে, আমার বক্ষে যেন সহস্র বজ্রের আঘাত হইল। ভূপেশচন্দ্র! চাঁদমুখ তুলিয়া একবার আমার মুখের দিকে চাও দেখি! আয় বাছা কোলে আয়! আমি আনন্দা নই, আমি যশেশ্বরী। তোর গর্ভধারিণী অভাগিনী যশেশ্বরী। হায়! হায়! কি হইলাম! ভূপেশ! আমি পাগলিনী! ভূপেশ! তুমি রাজকুমার। আর আমি কথা কহিতে পারি না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ রঘুবর রাও সত্য পরিচয় প্রদান করিবেন।"

যশেশ্বরী দেবী অশ্রুপ্রবাহে যেন অন্ধপ্রায় হইলেন। কি শুনিলেন,

কি বলিবেন, কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া ভূপেশচন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন। প্রাচীন কবিরা এরূপ স্থলে সর্ব্বাগ্রে মূর্চ্ছাকে ডাকিয়া দিতেন, কিন্তু আমরা স্বভাবের অপমান করিব না। মাতাপুত্র উভয়েরই চারি চক্ষে অবিরত অশ্রুধারা।

রাজা রঘুবর রাও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন, নয়নে বিন্দুমাত্র অশ্রু ছিল না, মুখে কথা নাই। যশেশ্বরী দেবী তাঁহার মুখে পরিচয় শুনিবার অভিলাষ করিলেন, কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

কে কাহার কথার উত্তর করে? কে কাহার কথার সাক্ষী হয়? কে কাহার কথার প্রতিধ্বনি করে? কেহই না। কিন্তু সত্যই কি কেহই না?

কেহ একজন আছেন। তিনি কে? রাজকুমার হরবিলাস। পূর্ব্বের পরিচয় ছিল কি না, জানাশুনা হইল না, কিন্তু হরবিলাস ইচ্ছাবশে অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভূপেশচন্দ্রকে কহিলেন, "ভূপেশ! উভয়ে আমরা একত্র মিলিত হইয়াছি। তুমিও রাজকুমার। তুমি আমার ভ্রাতা; আমিও তোমার ভ্রাতা। এই মহারাজ রঘুবর রাও তোমার মাতুল, এই দেবী যশেশ্বরী দেবী তোমার জননী। আমাদের উভয়ের পিতা এক।"

পাগলের মত চঞ্চল হইয়া যুগল হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া অস্থিরপদে নৃত্য করিতে করিতে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "কে তুমি? কাহার কথা কও? পিতা? আমার পিতা কি পৃথিবীতে আছেন? স্বপ্নের মত শুনিতেছি যাহা, তাহাতে কি বিশ্বাস করিতে পারি? এত স্নেহ, এত মায়া যেখানে, সেখানে একটী প্রতিমা আছে। ক্ষীরধারা বহিতেছে। এই দেবীই আমার জননী। মন বলিয়া দিতেছে, হৃদয় বলিয়া দিতেছে, আমার অন্তরাত্মা বলিয়া দিতেছে, এই দেবীই আমার জননী। কিন্তু রাজকুমার! তুমি কি রাজকুমার? অজানা হরবিলাস রঘুপৎ, এই নামে অনেক স্থানে তোমার সহিত আমার পরিচয়। দুষ্টলোকেরা যে দিন ছলনাচক্রে বন্দী করিয়া আমারে আর অপ্সরারে গাড়ীতে তোলে, সেই দিন সেই বিপদসময়ে অপ্সরার হস্তে তুমি একটী কাগজের মোড়ক দিয়াছিলে। সম্বলশূন্য অবস্থায় আমরা মোড়কে দেখিলাম, হরবিলাস রঘুপৎ। ভিতরে দেখিলাম, পাঁচ সহস্র মুদ্রার দর্শনী হুণ্ডী। জানিতাম, তুমি সওদাগর। অসময়ের সখা, বিপদের কাণ্ডারী;

তোমাকে আমি বিপদের বন্ধু বলিয়াই জানিতাম। চেহারা দেখিয়াছি, অনেক বার কথা কহিয়াছি, কিন্তু তুমি যে রাজকুমার, তুমি যে আমার ভ্রাতা, ইহা আমি জানিতাম না। রাজা কে? বল দেখি, তুমি কোন্ রাজার পুত্র?"

দেবী যশেশ্বরী অজ্ঞান হইয়া পড়েন নাই। মুখ তুলিয়া প্রিয়পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কথা কহিলেন। কি কথা কহিলেন, তাঁহার মনের কথা তিনিই জানেন। রঘুবর রাও বুঝিলেন, হরবিলাস বুঝিলেন, ভূপেশচন্দ্রের বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইল।

রাজা রঘুবর রাও দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া সজললোচনে ভূপেশ-চন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া সময়োচিত মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! আমি কিছুই জানিতাম না। তোমার উপর আমি অনেক—অনেক—অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছি। কিন্তু বৎস! সে সকল তুমি ভুলিয়া যাও! অনেক হইয়াছে; পাপেব ভোগ যতদূরে যায়, তাহা গিয়াছে। আমি সর্ব্বস্বধন হারা হইয়াছি; আমার স্বর্গভূষণ আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে; তুমি ভূপেশচন্দ্র! আমার হস্তে,—স্বর্গভূষণের হস্তে অনেক উৎপীড়ন সহ্য কবিয়াছ, সত্য; কিন্তু জান, সে সকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞানের কার্য্য; এত দিনের পর, এত এত মহাসঙ্কটের পর চৈতন্য আমার কাছে আসিয়াছে। আজ যদি স্বর্গভূষণ বাঁচিয়া থাকিত, আহা! বাছার আমার কোন দোষ ছিল না, লোকে তাহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত। ভূপেশচন্দ্র! বাছাধন! আমার স্বর্গভূষণ নাই! তুমি বাছা সেইখানে থাক। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমস্তই তোমার। আমার ভগিনী,—সহোদরা ভগিনী, ছেলেকালের আনন্দা দেবী,—এখনকার যশেশ্বরী দেবী তোমার গর্ভধারিণী জননী। রাজা মহানন্দ রাও তোমার জন্মদাতা পিতা। আর না,—আর রাজকুমার! আর আমি বলিতে পারি না। ঐ যেন কাহারা আসিতেছে। হরবিলাস! ধর! ধর! উহাদের ধর! আমাকেও ধর! আমার মাথা ঘুরিতেছে! কতদিনের কত কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কতদিনের কত কথা মনে আসিয়া পড়িল, স্বর্গভূষণকে হারাইলাম, তবে আর পাগল হইবার বাকী কি? পাপের কুহকে এই রকমেই লোক পাগল হয়। আমার পাপের সীমা ছিল না, এখন তাহার চরম। হরবিলাস! ওরা কার? আমি তোমার কাছে দাঁড়াইয়া

রহিয়াছি,—না,—না,—রাজকুমার! জনশূন্য ময়দান! উঃ! হরবিলাস! তুমি কি আমাকে খাইয়া ফেলিবে? তোমার এমন বিকট মূর্ত্তি কেন? দুই-কস্ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে। দুই চক্ষে আগুন জ্বলিতেছে, নাসিকা হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে, কেন তোমার আজ এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হরবিলাস? খাবে আমাকে?—গ্রাস করিবে আমাকে? খাও! গ্রাস কর! বাঁচিয়া যাই। স্বর্গ-ভূষণকে ভুলিয়া যাই। ভূপেশচন্দ্র! একবার আমার কাছে এসো, কোলে এসো! দেখিয়াছি, জানিতাম না, চিনিতাম না, কোলে এসো। তোমার জননীকে প্রণাম কর। আমার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আমি তোমার জননী যশেশ্বরী দেবীর সহোদর। রাজা রঘুবরের নাম এ জন্মের মত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয়। শেষবারে একবার আসিয়া,—ভূপেশ! আঃ! ভূপেশ। আমার জন্য কত দৌরাত্ম্য তোমাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। একটু জল দাও!"

ভূপেশ জল দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা আবার কহিলেন, "ভূপেশ! হরবিলাসকে তুমি জান?"

"জানি রাজা! ইনি আমার পরমবন্ধু, বিপত্তের কাণ্ডারী।"

"হাঁ! কেবল তাই জান?"

"আর কি জানিব, মহারাজ?"

"এই জানিবে, মহারাজ মহানন্দ রাও তোমার পিতা। কুমার হরবিলাসের পিতা মহারাজ মহানন্দ রাও। তোমার জননী আমার সহোদরা ভগিনী শ্রীমতী যশেশ্বরী দেবী। কুমার হরবিলাসের জননী আর একটী স্বতন্ত্র রাণী। কিন্তু তোমরা উভয়েই এক পিতার সন্তান। এতকালের পরে এই সত্য পরিচয় আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূপেশচন্দ্র! আমার—আমার আর দিন নাই! অতি শীঘ্র আমি এই সংসারক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। তুমি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে রাজ্যসুখ সম্ভোগ কর।"

"না রাজা! রাজ্যসুখে আমার অভিলাষ নাই। আমার একটী সুখ আছে, সে সুখ তোমরা দেখিতে পাও না। জননীকে প্রণাম করি। জননি! জননি! দেবি! আশীর্ব্বাদ কর। আছ তুমি! জানি না। ছিলে তুমি! জানিতাম না। সংসারে ভ্রমণ করি, যেন উদাসীন। কিন্তু জান তুমি দেবি!

এ কি ভ্রান্তি ? আমি রাজপুত্র ? লোকে ত এই কথাই বলিত, কিন্তু এ কি ? দেবী যশেশ্বরী আমার জননী, মহারাজ মহানন্দ রাও আমার পিতা ; এ কি আশ্চর্য্য ! ইহা যেন স্বপ্ন স্বপ্ন বোধ হইতেছে। অপ্সরা ! উঃ ! তারে তারে গাঁথা ! এ নাম যেন আমার বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠে উঠিয়া,--কণ্ঠ হইতে মাথায় উঠিয়া,—চপলার মত নাচিয়া নাচিয়া খেলা করে। মানব-হৃদয়ের আশা যতদুর চপলা, আমার অপ্‌সরাসুন্দরী আমার হৃদয়ে তাহা অপেক্ষা আরও অনেক চপলা। কাহার সঙ্গে কথা কহিব ? যাহাকে দেখিতে চাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। ভয় হয়, সংশয় হয়, কে যেন সম্মুখে আসে আসে, আসে না। কে তুই সর্ব্বনাশি ? তুই বুঝি সেই ? দেখিয়াছি, কতবার দেখিয়াছি, কতবার তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি, তথাপি কি লজ্জা হয় না ? ছি ! ছি ! ছি ! ছি ! ছি তোরে আশা ! তথাপি তুই আশা চপলা !"

রাজা রঘুবর রাও পুত্রশোকে পাগল। দেবী যশেশ্বরী শোকদুঃখ হর্ষের মধ্যবর্ত্তিনী। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া সাশ্রুনয়নে করুণবচনে সেই করুণাময়ী দেবী কহিতে লাগিলেন, "বাছা ! আর তোরে এ জন্মে চক্ষের অন্তর করিব না। অজ্ঞাতে এই অভাগিনীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজকুমার হইয়াও জন্মাবধি তোরে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমি সমস্ত সংবাদ রাখি। তখন তখন প্রায় নিত্যই চক্ষে দেখিতে পাইতাম, তাহার পর,—ভূপেশ চন্দ্র ! তাহার পর যখন চক্ষের অন্তর হইয়া গেলি, তখন আমার এই পাষাণহৃদয় যেন চক্‌মকির ন্যায় অনল ধারণ করিত। বাহিরে কেহই সে অনল দেখিতে পাইত না, কিন্তু ঘটনাসূত্রে কেহ কোন প্রকার আঘাত করিলেই জ্বলন্ত আগুন যেন ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইত। ভূপেশচন্দ্র ! উঃ ! হৃদয় দেখাইবার নয় ! বৎস ! কিন্তু আমার এই পাষাণহৃদয় অনেক সহিয়াছে ; আর সহিতে পারিবে না। বৎস ! অনেক দিনের অনল যেন তুষে ঢাকা ছিল, গুমিয়া গুমিয়া অহরহ দিবারজনী আমারে দগ্ধ করিয়াছে, এতদিনের পর সেই অনল আজ নির্ব্বাপিত হইল, হৃদয় জুড়াইল ! কিন্তু বৎস ! আর একটী কথা। রাজা বিরাটকেতুর কন্যা অপ্‌সরাসুন্দরী—"

কথায় বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "না দেবি! অপ্সরাসুন্দরী রাজা বিরাটকেতুর কন্যা নয়। সকলেই জানে তাহাই, অপ্সরাও জানিত তাহাই, কিন্তু আমি জানিয়াছি, অপ্সরাও জানিয়াছে, বিরাটকেতুও হয় ত জানিতেন, প্রকাশ করিতেন না। দেবি! উদয়পুরের অধিপতি মহারাজ উদয়সিংহ সেই সুরসুন্দরী অপ্সরাসুন্দরীর জন্মদা—"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ নল্পাইলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, রাজা রঘুবর রাও এই আকস্মিক সংক্ষিপ্ত গুহ্যতত্ত্ব শ্রবণে সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। রাজকুমারী যশেশ্বরীও সেইরূপ বিস্ময়াকুললোচনে সন্তানের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধ যে, উচ্চ হইতে একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণা পতিত হইলে অবিরোধে, সেই পতনশব্দ অবিরোধে শ্রবণগোচর হয়। মহা-ঝটিকার পর মহাজলধি যেমন নিস্তব্ধ, শান্ত, সেই গৃহটীও তৎকালে তদ্রূপ নিস্তব্ধ, শান্ত। অর্দ্ধদণ্ড পরে মৌনভঙ্গ করিয়া যশেশ্বরী কহিলেন, "ভূপেশ! বৎস! আমি কি জাগ্রত না নিদ্রিত? তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা স্বপ্ন না সত্য? গগনমণ্ডলে নিবিড় মেঘমালা থাকিলে দিনমানে দিনমণি, নিশাকালে নিশানাথ নয়নগোচর হয় না, একটীও নক্ষত্র দেখা যায় না। কিন্তু বৎস! আমি যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভিতর চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্র, সমস্তই দর্শন করিতেছি। রাজা! ভ্রাতা! এ কি অপরূপ কথা! অপ্সরাসুন্দরী মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা? এত দিনের পর আমার মনের একটী ধাঁদা ঘুচিয়া গেল। মনে পড়িলেই আমি সর্ব্বদা ভাবিতাম, ভস্মকুণ্ডে পদ্মফুল। অপ্সরাসুন্দরীর মত মহারত্ন বিরাটরূপী বিরাটকেতুর কন্যা, ভূতের গৃহে বিদ্যাধরীর উদ্ভব। রাজা! ইহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? কাচমণির খনিতে কি পদ্মরাগমণির জন্ম সম্ভবে? আমার ভূপেশচন্দ্র,—না রাজা! সে কথা নয়, ভূপেশ! প্রাণাধিক! মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা যথার্থই একটী স্বর্ণলতা। সেই স্বর্ণলতা উপযুক্ত বৃক্ষকেই আশ্রয় করিয়াছে। ভূপেশ! তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়া আপনারে আপনি আমি অভাগিনী, অভাগ্যবতী মনে করিতাম। কিন্তু এখন জানিলাম, পরমভাগ্যবতী আমি। ভূপেশ! পুনঃপুন তত বিপদের জালে

জড়িত থাকিয়াও তুমি যে কিরূপে সেই অপ্রকাশিত নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিয়াছ, তাহাই আমার আরও চমৎকার জ্ঞান হইতেছে। তুমি—"

পুনর্ব্বার বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "না মা! কেবল তাই নয়, মহারাজ উদয়সিংহকে আমি দর্শন করিয়াছি।"

"দর্শন করিয়াছ? এ কি আশ্চর্য্য কথা! তোমার কি মতিভ্রম হইতেছে? সকলেই শুনিয়াছে, বহুদিন হইল, মহারাজ উদয়সিংহ স্বর্গবাসী হইয়াছেন। অথচ তুমি বলিতেছ দর্শন। এ কথা ত—"

তৃতীয়বার বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "না জননি! মহারাজ উদয়সিংহের স্বর্গবাস মিথ্যা জনশ্রুতি মাত্র। বিপক্ষবিদ্রোহে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি ছদ্মবেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, রাজা বিজয়কেতু নামে যিনি পরিচয় দিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই তিনি। তিনিই মহারাজ উদয়সিংহ। জান তুমি দেবি! উদয়পুরে উদয়সিংহ নামে কেবল একটী মাত্র রাজা ছিলেন না, সেই বংশের অনেক রাজকুমার কুলপরম্পরানুগত মহা গৌরবচিহ্নস্বরূপ ঐ মহামান্য উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমি যাঁহার কথা কহিতেছি, তিনি শেষ উদয়সিংহ। তিনিই ছদ্মবেশে বিজয়কেতু নামে দেশ পর্য্যটন করিতেছেন।"

হঠাৎ কি যেন মনে করিয়া চকিতভাবে রাজা রঘুবর রাও কহিলেন, "বল কি ভূপেশচন্দ্র? রাজা বিজয়কেতুই কি মহারাজ উদয়সিংহ? এ তত্ত্ব তুমি কোথায় পাইলে? রাজা বিজয়কেতুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আকার ইঙ্গিতে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই। তাদৃশ হীনাবস্থায় থাকিয়া তুমি কি প্রকারে সেই গুহ্য পরিচয় প্রাপ্ত হইলে?"

ভূপেচন্দ্র উত্তর করিবার অগ্রে রাজাকে সম্বোধন করিয়া যশেশ্বরী কহিলেন, "মহারাজ! পরিচয়ের প্রকাশ অপ্রকাশ, সময়ের উপর কিম্বা অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তুমি যদি ছদ্মবেশ ধারণ কর, দেখিলে আমি হয় ত তোমারে চিনিতে পারিব না, কিন্তু যে ব্যক্তি কস্মিন্‌কালেও তোমাকে দেখে নাই, সে ব্যক্তি হয় ত কাহারও মুখে নাম শ্রবণ করিয়া

জানিতে পারিবে, তুমিই রাজা রঘুবর রাও। সে কথা এখন থাক্, ভাগ্যক্রমে, ঘটনাক্রমে যখন এতদূর যোগাযোগ, এতদূর সংঘটন,—বিশেষ অপ্সরাসুন্দরী যখন আমার ভূপেশচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী, তখন,—বলিতে চক্ষে জল আইসে,—এই শুভসময়ে স্বর্গভূষণ বাঁচিয়া নাই! তোমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু ভ্রাত! তুমি জ্ঞানবান, তোমারে আমি কি বুঝাইব, সকলই তুমি জান। বিধাতার মনে যাহা থাকে, তাহাই হয়। অকালে স্বর্গভূষণ আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, ইহা তোমার আমার মনে ছিল না, কেবল বিধাতারই মনে ছিল। ভ্রাত! সংসারের সুখ সমস্তই অলীক। তুমি যাহাকে সুখ মনে কর, আর একজন হয় ত তাহাকে অসুখের মূলীভূত বলিয়া বিশ্বাস করে। তুমি যাহাকে দুঃখ বলিয়া জান, আর একজন হন ত তাহাতেই পরমসুখী। পুত্রশোক মহাশোক, জানি আমি তা; আমার এই জীবিত পুত্র অনাথের মত দেশে বিদেশে কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমারে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়াছে, কেহই জানে না, জগতের প্রাণিমাত্রেই তাহা জানে না, কেবল যিনি জানিবার, সেই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান জানেন আর আমি জানি। এখন, এখন মহারাজ! এই ভূপেশচন্দ্রের মুখ দেখিয়া একটু শান্ত হও। ধৈর্য্যকে শোকসন্তপ্ত হৃদয়াবাসে নিমন্ত্রণ কর। প্রবোধ আর সান্ত্বনা নামে জগতে যদি কিছু থাকে, চিরবিষণ্ণতাতাপিত এই ভূপেশচন্দ্রের বদনে তাহা তুমি রাখ। পুত্রশোক ভুলিতে পারিবে না, তাহা জানি; কিন্তু মহারাজ! ডাকাতে খুন করিয়াছে; সেজন্য অপরাধী আর কেহই নয়, সেইটী স্মরণ করিয়া যতদূর সাধ্য, মনকে বুঝাও। মহারাজ উদয়সিংহের কন্যার সহিত ভূপেশচন্দ্রের বিবাহ দিয়া সংসারে কিছু দিন—"

রাজা রঘুবর রাও একটী সুদীর্ঘ জলন্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ভূপেশচন্দ্রের চক্ষে জলধারা গড়াইল। সস্নেহে বসনাঞ্চলে স্নেহাস্পদ পুত্রের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিয়া, সজলনয়নে যশেশ্বরী কহিলেন, "ভূপেশ! আর কেন বাছা এই অভাগিনীকে দগ্ধ কর? জানে লোকে, জল অতি শীতল; কিন্তু বাছা! তোর চক্ষের জল প্রচণ্ড পাবকশিখার ন্যায় ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্র শিখায় আমারে দগ্ধ করে। কেন বাছা তোর চক্ষে জল?"

জননী যে নেত্রজল মুছাইয়া দিয়াছিলেন, সেই নেত্রজল আরও প্রবল হইয়া চিরপরিতপ্ত ভূপেশচন্দ্রের বিশুষ্ক কপোলযুগল আপ্লাবিত করিল। গিরিগাত্র হইতে যেমন নির্ঝরধারা প্রবাহিত হয়, আমাদের নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র নায়কের পবিত্রনয়নে সেইরূপ বারিধারা। রোদন করিতে করিতে সকাতরকণ্ঠে, অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে জননীকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "মা! কোনক্রমেই আমি আর অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। জন্মে যে পারিব, তাহাও বুঝি না। আমার অপ্‌সরাসুন্দরী হয় ত বাঁচিয়া নাই!"

"কেন বাছা!" পুনর্ব্বার নেত্র মার্জ্জন করিয়া দিয়া যশেশ্বরী কহিলেন, "কেন বাছা! সুকুমারী অপ্‌সরাসুন্দরীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছ কেন? বাছা! যাহার হৃদয় পবিত্র, মন পবিত্র, স্বভাব পবিত্র, বিধাতা তাহার নিরন্তর রক্ষাকর্ত্তা। কখনই তাহার অমঙ্গল সম্ভব হইতে পারে না।"

চক্ষু রোদন করিতেছে, মন রোদন করিতেছে, হৃদয় রোদন করিতেছে; অথচ ওষ্ঠপুট একটু একটু হাস্য করিল। এটী বড় চমৎকার শোভা! মেঘ আছে, বৃষ্টি আছে, অথচ বিদ্যুৎ আছে। মেঘের রোদনে চপলার হাসি। চপলা ভারি দুষ্টমেয়ে। কাহারও উপরোধ মানে না, কাহারও অনুরোধ রাখে না, কাহারও দুঃখে দুঃখিত হয় না। আপনার মনে, আপনার গরবে, থাকিয়া থাকিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়।—ভারি দুষ্টমেয়ে। আমাদের আশা-চপলা কি যে চপলাভঙ্গিতে ভূপেশচন্দ্রকে কাঁদাইল, ভূপেশচন্দ্রের মুখেই তাহা ব্যক্ত হইবে। ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "জননি! চিরদিন দুঃখভোগের নিমিত্তই সংসারে আমার জন্ম হইয়াছে। কেন যে অপ্‌সরাসুন্দরীর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, কেন যে স্নেহ বসিয়াছিল, কেন যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, জানি না। পাপিষ্ঠ, দুর্জ্জন, দুরাচারেরা আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, অপ্‌সরাসুন্দরী তাহাতে আর সংশয় রাখেন নাই। সেই সোণার প্রতিমা তাহাই ভাবনা করিয়া আপনা আপনি পবিত্রজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন! আমার অপ্‌সরাসুন্দরী বাঁচিয়া নাই! অসময়ে অকারণ পরমমিত্র হরবিলাস, আর আমার অজ্ঞাত মাতুল এই মহারাজ যদি আমাকে তত অনুরোধ না করিতেন, কালচক্রের মুখ

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তখনি আমি অপ্সরাকে দেখিতে যাইতাম। কি দেখিতাম? অপ্সরার স্বর্ণদেহ, আমার হৃদয়ের সেই স্বর্ণলতা,—অভাগা ভূপেশচন্দ্রের হৃদয়প্রতিমা সেই স্বর্ণপ্রতিমা ভূমিতলে গড়াগড়ি! উঃ! মনে করিতেও হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! জীবনশূন্য হৃদয়প্রতিমা ভূমিতলে! সেই পদ্মচক্ষু নিমেষশূন্য হইয়া নিস্পন্দে সুস্থির! সেই সুকোমল পদ্মহস্ত অযত্নে দুইপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সেই পদ্মমুখে আভা নাই, হাসি নাই, বাক্য নাই! সেই সুচাঁচর চামরলাঞ্ছিত কেশপাশ ধূলায় ধূসর হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছে! সোণার দেহ ধূলামাখা! দেখিতাম! দেখিতাম!! দেখিতাম!!! দেখিয়া কি করিতাম? ঝড় জান তুমি মা? ঝড়ে কলাগাছ পড়ে, তাহাও জান? সব গাছ পড়ে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কলাগাছ।—আমি সেই মহাঝড়ে কলাগাছের মত সেই লতাশয্যায় শয়ন করিতাম! বুকে তলোয়ার মারিতে হইত না, গলায় ছুরি দিতে হইত না, কালকূট হলাহল পান করিতে হইত না, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে হইত না, সাগরের অতল জলে ঝাঁপ দিতে হইত না, চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া, অগ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া, স্বর্গমর্ত্তপাতালকে সাক্ষী রাখিয়া, ত্রিলোকবাসী দেব, দানব, মানব, বিশ্বচরাচরের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি জীবকুলকে সাক্ষী করিয়া, কাননের তরুলতাতৃণাদিকে সাক্ষী মানিয়া, সেই লতা-চিতায় আরোহণ করিতাম। পবনকে গালাগালি দিয়া দূরে খেদাইয়া নাসারন্ধ্রের নিশ্বাসপ্রশ্বাসকে জন্মের মত বিদায় করিতাম। তুমি দেবি! এই পাপী অভাগার গর্ভধারিণী। এ দেহে, এ জন্মে, এ নয়নে, আর তোমাকে দেখিতে আসিতাম না! স্বর্গীয়া অপ্সরার সহিত অপ্সরলোকেই প্রস্থান করিতাম।"

কথাগুলি লিখিতে যতক্ষণ গেল, ভূপেশচন্দ্রের রসনা তাহার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকালের মধ্যে সেগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল। যশেশ্বরী দেবী যেন চিত্রপুত্তলিকার মত স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, দুটী চক্ষু দিয়া অবিরল বারিধারা বহিল, রসনা নির্ব্বাক। রাজা রঘুবর রাও এতক্ষণ যেন আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন, ভূপেশচন্দ্রের শেষ কথাগুলি শুনিয়া কি কথা যেন তাঁহার মনে পড়িল। ত্রস্তভাবে কহিলেন, "ভূপেশ! বৃথা আশঙ্কা তোমার!

দেখিয়া আসিয়াছি; হরবিলাস দেখিয়া আসিয়াছেন, শোকে আচ্ছন্ন, কিন্তু অপ্সরা নিরাপদে। আনিতে চাহিলাম, অগ্রাহ্য করিল। তোমার কুশল কহিলাম, অবিশ্বাস করিল। বড় অহঙ্কার! ক্ষত্রিয়কুমারীর এইরূপ অহঙ্কারই শোভা পায়। ভূপেশ! তোমাকে আমি চিনিতাম না। যিনি চিন্ময়, তিনি চিনাইয়া দিলেন। এখন আমি তোমাকে প্রাণের অধিক স্নেহ করিব। অপ্সরাসুন্দরীর কোন অমঙ্গল হয় নাই। অপ্সরাসুন্দরী নিরাপদে কুশলে আছে।”

"অ্যাঁ! অ্যাঁ! অ্যাঁ! আছে? আমার অপ্সরাসুন্দরী বাঁচিয়া আছে? বিবাহ! বিবাহ! চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে মহারাজ উদয়সিংহ বাহাদুর আমার হাতে হাতে অপ্সরারে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। আমার প্রাণাধিকা অপ্সরাসুন্দরী কোথায়? কোথায় মহারাজ? আমার অপ্সরা কোথায়?” উন্মত্তের ন্যায় এই কথা বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থলে করার্পণ করিয়া উদাস নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বিমনস্ক ভূপেশচন্দ্র বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মনে জাগিতেছে, এক আশা। প্রশ্ন হইতেছে, আশা। হৃদয়ে পুনঃপুন ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে, আশা। উত্তর হইতেছে, আশা চপলা।

ষট্‌ষষ্টিতম প্রবাহ।

নূতন না পুরাতন?

“যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত ভাল মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়ে ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥”

ভারতচন্দ্র।

আবার পঞ্জাবে যাইতে হইল। চন্দ্রভাগানদীর অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী প্রাচীন অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার মাথার উপর একটী অশ্বত্থবৃক্ষ

বিরাজমান। মানুষের যেমন শিশু হয়, পশুপক্ষীর যেমন শাবক হয়, কবিরা যদি আমারে তিরস্কার না করেন, তাহা হইলে অহঙ্কারে সাহস করিয়া আমি বলিব, অশ্বত্থশিশু। এই অট্টালিকা এক সময়ে হয় ত কোন বড়লোকের বিলাসভবন ছিল। চিহ্ন চারিধারে ভগ্ন প্রাচীর। প্রাচীরের ধারে ধারে নানাজাতি প্রাচীন বৃক্ষ। ভিতরে কুসুমকানন। যত্নভ্রষ্ট হইয়া ফুলগাছগুলি যেন ক্রন্দন করিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে দুটী কপিত্থবৃক্ষ। ডালে ডালে দুটী একটী ছোট ছোট ফল ঝুলিতেছে। বিরহিণী রমণীর মত সেই দুটী কৎবেলের পাতারা শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ফল দেখিতে না পাইলে শুদ্ধ মাত্র পাতা দেখিয়া অজ্ঞলোকে মনে করিতে পারে, অনেক দিনের পুরাতন কামিনীফুলের গাছ। এই গাছের পাতা আর কামিনীগাছের পাতা ঠিক এক সমান। দুটী গাছের একটী গাছে এক প্রকাণ্ড কাকপাখী বসিয়া আছে! তত বড় কাক বোধ করি কেহ দেখে নাই। বাঙ্গালাদেশের ত্রিপুরা জেলায় যত বড় বড় কাক হয়, তত বড় কাক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্জাবের প্রাচীন কৎবেলের গাছে যে কাক আমরা দেখিতেছি, অবয়বে সে কাক তাহার চতুর্গুণ। দূর হইতে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ খাসী। আকৃতি যেমন প্রকাণ্ড, স্বরও সেই প্রকার কর্কশ। সেই কর্কশ গম্ভীরস্বরে অতিথিগণকে আহ্বান করিয়া, আমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতেছে। রাত্রি আসিয়াছে। এ রাত্রে অতিথি হইবে কে? আকাশকুঞ্জে নক্ষত্রফুল ফুটিয়াছে, সুধাকর অপ্রকাশ। ছোট বড় অনেক নক্ষত্র একত্র; কিন্তু তাহারা অন্ধকার বিনাশ করিতে পারিতেছে না। আপনারাই আপনা আপনি জ্বলিতেছে। পৃথিবী তাহাদিগকে দেখিয়া চুপ করিয়া আছেন। এই জীর্ণ অট্টালিকায় বাস করে কাহারা? দ্বিতল কক্ষে তিনটী পুতুল। মাটীর নয়, কাটের নয়, পাথরের নয়, অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিতও নয়, সজীব। একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী, একটী শিশু। শিশুটীর বয়ঃক্রম অনুমান সাত বৎসর। স্ত্রীপুরুষের বয়ঃক্রম কত, অনুমান করিবার আবশ্যক নাই। আর কখনও কোথাও ইহাদের সহিত দেখা হইয়াছে কি না, তাহাও বলিবার আবশ্যক নাই। তিন দিকে তিনটী দীপ জ্বলিতেছে। সাফ্ আলো। কিন্তু তথাপি গৃহ যেন অন্ধকার।

সুখী লোকের গৃহে অনেক রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইলেও গৃহ যেন আনন্দময় দেখায়। অন্ধকারেও যেন আলো হয়। কিন্তু তিনটী উজ্জ্বল আলোতে এ গৃহ যেন অন্ধকার। যিনি কর্ত্তা, তিনি অস্ত্রধারী। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তৈলবিহনে রুক্ষ, যেন তাম্রবর্ণ; বদন পাণ্ডুবর্ণ; পাণ্ডুর উপরে রক্তের আভা। শিশুটী শয়ন করিয়া আছে, বোধ হয় ঘুমন্ত। কামিনী বসিয়া আছে, বোধ হয় অভিমানিনী। কর্ত্তা দাঁড়াইয়া আছেন, বোধ হয় রাগে রাগে পাকা। এখনই যেন বাহির হইয়া যাইবেন, ঠিক্ সেইভাবে দণ্ডায়মান। ভঙ্গী দেখিয়া ভয় হয়, সন্দেহও হয়। গভীর গর্জ্জনে কর্কশ স্বরে তিনি বার বার কহিতেছেন, "পাঁচ শ টাকা!" মানিনী এক একবার উত্তর করিতেছেন, "কমলার শাপ, রাত্রিকালে একটী টাকাও না।"

"মান রক্ষা হয় কিসে?"

"আমার পদাঘাতে।"

"আমারও পদাঘাত আছে।"

"থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে না। আমি কালভুজঙ্গিনী। তোমার মস্তকে দংশন করিব। তুমি নারীঘাতী পামর, আমি তোমারে চিনি। বড় ভালবাসিতাম, ব্যবহার দেখিয়া সমস্ত ভালবাসা বিসর্জ্জন দিয়াছি। রক্তচক্ষু কাহাকে দেখাও? আমি তোমার চক্ষুকে ডরি না।"

"ডরের কথা এখন নাই, কিন্তু পাঁচ শ টাকা!"

কামিনী ক্রোধমুখী হইয়া নায়কের বামচক্ষে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া কর্ত্তাপুরুষ সেই কর্ত্রীঠাকুরাণীর উরুদেশে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। কম্পিত উরুস্থল ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইয়া প্রহারকর্ত্তার মুখস্পর্শ করিল। তিনি যেন তখন কি কথা বলিবেন, মনে করিতেছিলেন, দন্তের বাহিরে রসনা আসিয়াছিল, রসনায় আঘাত লাগিল; রক্ত পড়িল; ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মূর্চ্ছা যেন মাথা ঘুরাইতে লাগিল। তখনও ক্ষমা নাই। নূতন অস্ত্রের প্রহার। পাঠকমহাশয় জানেন, সিংহব্যাঘ্রের নখর আছে, বিড়ালকুকুরের নখর আছে, মানুষের নখর থাকে, প্রকৃতিসতী এ কথা বলিয়া দেন না। কিন্তু পঞ্জাবে এই জীর্ণগৃহের কামিনী নখের কাছে একটী "র" আনিয়া আঁচড়ে আঁচড়ে সেই

দুষ্ট লম্পটকে প্রায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সমস্ত মুখে কেবল নখাঘাত ছাড়া আর একটুও স্থান থাকিল না। ক্রমশই ক্রোধের বৃদ্ধি। বাক্যযুদ্ধে জয় পরাজয় থাকিতে পারে, কিন্তু বাঃ! মানের যুদ্ধে কামিনীদেরই জয় হয়।

ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। দুই জনে যুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া অজ্ঞান বালক দুই দিকে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে যাঁহারা এমন দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত আমাদের আজ রাত্রের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। যাহারা পরপ্রেমাসক্ত নীচাশয় লম্পট দস্যু, তাহারা বুঝিবে, আমরা কি কথা বলিতেছি। রহোন্যাসের প্রথম সন্তান হরিদাস, নবীন গাঙ্গুলীতে, দিগম্বর ভট্টাচার্য্যে, বীরচন্দ্রে, যে সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছেন, এই ক্ষত্রকুলের কুলাঙ্গার তদপেক্ষা বহুগুণ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইয়া দিতেছে। হরিদাসের গুপ্তকথা পাঠ করিয়া যাঁহারা শিষ্টের পুরস্কার ও দুষ্টের দণ্ড অনুধাবন করিয়াছেন, আশা-চপলা পাঠ করুন, তদপেক্ষা অনেক ভয়, অনেক বিপদ, অনেক শাস্তি ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। এই একখানি নূতন দর্পণ। এ দর্পণে অনেক ছায়া পড়িতেছে, আরও অনেক পড়িবে। পূর্ব্বের হরিদাস যদিও আখ্যায়িকা-জগতের আদর্শ; তথাপি চিরদিন শুধু নিষ্কলঙ্ক। আশা চপলার নায়ক শুদ্ধমাত্র নিষ্কলঙ্ক নহেন, তাঁহার চরিত্রদর্পণে জগৎ-সংসারের প্রতিবিম্ব পড়ে। থাকিয়া থাকিয়া এক একটী কথা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু একত্র করিয়া পাঠ করিতে হইলে ভাবুকের শরীর অবশ্য রোমাঞ্চিত হইবেই হইবে। হরিদাস বাস্তবিক কল্পনাপ্রসূত ছিল না। এখনও যদি সংসারে হরিদাস বাঁচিয়া থাকে, এখনও যদি তাহার কিছুমাত্র আদর থাকে, তাহা আমি শ্লাঘা বলিয়া মানিব না। আশা-চপলা যে খেলা খেলাইতেছে, সে খেলা দেখিয়া হরিদাসকে লজ্জা পাইতে হইবেই হইবে।

ঐ যা! রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া গেল! লজ্জাহীনা ঊষা পূর্ব্বদিকে উঁকি মারিতেছে। বিভ্রান্ত নায়ক ক্রোধারক্তলোচনে নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটা কোথায় গেল?"

"তার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছি। ইঁদুরমারা কল মারিয়া রক্তপাত করিয়াছি। তুমি ছাড়া আর কি কাহাকেও আমি ভালবাসিতে পারি?

যতই অযত্ন কর, যতই অবিশ্বাস কর, কিন্তু আমি তোমারিই। শ্রীক্ষেত্রে লইয়া চল, শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া চল, রামসীতুয়াক্ষেত্রে লইয়া চল, বনে জঙ্গলে, যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে লইয়া চল, যাইব।"

কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কে কি কথা বলিল, শ্রবণকর্ত্তার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। "মেরো না বাবা মেরো না!" কাতরকণ্ঠে শিশুবাক্যে অর্দ্ধ ঘুমন্ত শিশু এইরূপ কাকুতি করিতেছিল, দুরন্ত নররাক্ষস সেই অজ্ঞান শিশুকে লাথী মারিয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া যথাসম্বল অপহরণপূর্ব্বক নায়িকার দিকে বক্রদৃষ্টি করিতে করিতে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল।

পাঁচশ টাকা! হায়! ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে পাঁচ শ টাকা তাহাদের পাঁচ বৎসরের উপার্জ্জন। গৃহে সঞ্চিত ছিল অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক। তাহাও অপহৃত হইল! এই বিশ্বসংসারে স্নেহের একটু ইতরবিশেষ আছে। সেই সঙ্গে মতভেদ আছে। আমি হয় ত বলি, স্ত্রীকে অধিক ভালবাসি। তুমি হয় ত বল, স্ত্রী অপেক্ষা পুত্রকে অধিক ভালবাস। কোন্ কথা যে ঠিক্, সর্ব্ববাদীসম্মতিতে তাহার মীমাংসা হয় না। লাথী খাইয়াছে নারী, লাথী খাইয়াছে পুত্র, সঞ্চিত সম্বল হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে স্বামী। যদি বলিতে হয় স্বামী, বলা যাউক, কিন্তু আমাদের যদি স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে সেই স্বামীকে অঙ্গুলী হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একে একে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিতাম। শিকারী কুকুর ডাকিয়া বক্ষঃশোণিত পান করাইতাম। বিশ্বভুক্ বিভাবসুকে আহ্বান করিয়া লোমে লোমে তাহাকে দগ্ধ করিতাম। কিন্তু পলায়ন করিয়াছে। বালক রোদন করিতেছে। ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। মায়ের প্রাণে ইহা কি সহ্য হয়? যন্ত্রণা! তোমার কি মূর্ত্তি আছে? মায়া! তুমি কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে জান? এসো তোমরা! দুই মূর্ত্তি একত্র হইয়া দেখা দাও। যদি জ্বালাইতে জান, জ্বালাও। যদি শান্ত করিতে জান, শান্ত কর। পরিতাপিনী জননীর সান্ত্বনার স্থল তোমরা কেহই না। একটী স্থল। শুদ্ধ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ছেলে কাঁদিয়া ব্যাকুল। চুম্বন দিয়া কোলে লইয়া জননী কহিল, "অন্ধের চক্ষু তুমি, দরিদ্রের ধন তুমি, আঁধারের দীপ তুমি; বুক ফাটিয়া যায় যাদু! আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, অনেক সহ্য করিতে জানি, অনেক সহ্য করিতে

পারি। কিন্তু প্রাণধন! তোমার বুকে পদাঘাত আমি সহ্য করিতে পারি না। যন্ত্রণার সীমা আছে, কিন্তু এ যন্ত্রণার সীমা নাই। হৃদয়ের রত্ন তুমি, জীবন অপেক্ষাও আমি তোমারে ভালবাসি। জ্ঞান হয় নাই, কিছুই বুঝিতে পার না, কিন্তু—

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ঘোর উন্মত্ত পাগলের বেশে সেই প্রহারকর্ত্তা গৃহকর্ত্তা আবার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন উষা চলিয়া গিয়াছে, প্রভাত আসিয়াছে। লোকটী রক্তমুখ। কিন্তু কেন যে, তাহা অনুভব করিয়া লইতে হইবে। অনুভবকে আমরা কিছু ভয় করি। তফাতে থাকে, থাকুক্; সম্মুখে, চক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহার সঙ্গেই আলাপ পরিচয়। ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা বলেন, প্রকৃতিদেবীব সতীন আছে, এই খানেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, শক্তি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। সুতরাং শক্তিই প্রকৃতিদেবীর সতীন। আমি বলি, শক্তি বরং প্রকৃতির কন্যা হইতে পারে, প্রকৃতি হইতেই শক্তির উৎপত্তি। সমস্ত শক্তিই প্রকৃতিসতীর। নারীজাতিকে যে প্রকৃতি বলা যায়, তাহাও সঙ্গত। নারীজাতিকে যে, শক্তি বলা যায়, তাহাও সঙ্গত। যদি এই দুই পদার্থকে মাতৃকন্যাসম্বন্ধে পরিচয় দিতে না চাও, এক বলিয়া স্বীকার কর, তাহাতেও আমাব আপত্তি নাই। কেবল আপত্তি এই যে, সপত্নী বলিতে পারিব না। ইহসংসারে সমস্তই প্রকৃতির খেলা। যাহারা প্রকৃতির অপমান করে, তাহারা যে কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। এই রক্তমুখ নায়ক প্রকৃতির অপমান করিয়াছেন। ইহাঁর ভাগ্যে যে কি আছে, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা দিনদিন তাহার নির্ঘণ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভাতে উন্মত্তবেশে প্রবেশ করিয়া সেই প্রমত্ত নায়ক পুনর্ব্বার অর্থলোলুপ হইয়া সেই নায়িকার সহিত কলহ আরম্ভ করিলেন। সে কলহে পরস্পরের প্রহারলাভ ভিন্ন অপর কোন ফল লাভ হইল না। আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত কবি একখানি কাব্যের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, "দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন।" এক্ষেত্রে উভয়ের কলহে যদি কিছু নূতন ফল কল্পনা করা যায়, সে ফলের নাম কুমুড়া।

উভয়েরই অবস্থা সমান। যিনি নায়ক, তিনি নষ্টসর্ব্বস্ব। ভিক্ষুক

অপেক্ষাও নিঃসম্বল। যিনি নায়িকা, তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত অনেকগুলি মহামূল্য অলঙ্কারবস্ত্র ছিল। জলাঞ্জলি হইয়াছে। মণিকাঞ্চনবিনির্ম্মিত মূল্যবান অলঙ্কার এক একখানি করিয়া সমস্তই পোদ্দারের দোকান আলো করিয়াছে। এখন এমনি দশা, উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত। তাহার উপর অপরিমিত ঋণদায়। যখনকার কথা, তখন যদি এদেশে ইংরাজের রাজত্ব থাকিত, তাহা হইলে এই ঋণগ্রস্ত নায়ক সচ্ছন্দে দেউলে নাম লইয়া অনায়াসে মহাজনগণকে ফাঁকি দিতে পারিতেন। যাঁহারা অসময়ের উপকারী বন্ধু, বিপদের কাণ্ডারী, তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করা সাধারণ ধর্ম্মের কার্য্য নয়! ইংরাজ বড় দয়াময় রাজা। আমি অক্ষম, নিতান্ত দীনদশাগ্রস্ত, ঋণপরিশোধে অসমর্থ, বিষয়বিভব সমস্তই তিরোহিত, অর্থাগমের অন্য উপায়ও নাই, ইংরাজের প্রজা ইংরাজ রাজাকে এই কথা জানাইলে সকল আপদ চুকিয়া যায়। কোন বিপদ থাকে না। পারস্য নামে দেউলে আদালত, ইংরাজী নাম ইন্‌সল্‌ভেণ্ট কোর্ট। ইংরাজের রাজত্বে সংস্কৃত নাম যোত্রহীন ঋণীগণের পরিত্রাণার্থ বিচারালয়। পুণ্যবান রাজা না হইলে এমন পুণ্যময় বিচারালয় অন্য কোন রাজার রাজ্যে থাকিতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে না। দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, অক্ষম ঋণীগণের দুর্ভাগ্যক্রমে, অথবা যাঁহার কথা হইতেছে, সেই অভাগার দুর্ভাগ্য ক্রমে তখন এদেশে ইংরাজের রাজত্ব হয় নাই। সুতরাং সেই হতভাগ্য ঋণগ্রস্ত যুবা কোনক্রমে রাজার আশ্রয়ে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। চতুর্দ্দিক হইতে,—কিছু বেশী করিয়া বলিতে হইলে দশদিক হইতে ঋণদাতা মহাজনগণ ছাঁকা বাঁকা করিয়া ধরিতেছেন। তিলমাত্র জুড়াইবার স্থান,—তিলমাত্র জুড়াইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না। কাজেই তিনি একটী অবলা স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা আসিয়া উৎপীড়ন করিতেছেন। তাহারই বা সঙ্গতি কোথায়, তাহারই বা সাধ্য কি? গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার ভরণপোষণ আছে, নিজের গ্রাসাচ্ছাদন আছে, যিনি উৎপাত করেন, তাঁহারও ভরণপোষণ আছে। একসঙ্গে তিন ভার মস্তকে। শুদ্ধ তাহাও না, উৎপাতকর্ত্তার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপকরণ চাই। তাহাতেও নিতান্ত অল্প অপব্যয় হয় না। সম্বলের মধ্যে

সেই স্ত্রীলোকটী সূতা কাটিয়া বিক্রয় করে, আর দুটী একটী বালিকাকে কাপড়ের উপর ফুলকাটা কাজ শিখাইয়া কিছু কিছু পায়। এই মাত্র ভরসা। তাহাতে কত দিক রক্ষা হইতে পারে? অভাগা ঋণী নিজে কিছু-মাত্র পরিশ্রম করেন না। অষ্টপ্রহর কুৎসিত আমোদেই প্রমত্ত। অলসের বাদ্‌শাহ্। অথচ নিত্য নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি, নিত্য নিত্য নূতন অর্থের প্রয়োজন, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মহাজনের তাড়া। সেই সকল তাড়ায় তাড়িত হইয়া স্ত্রীলোকের উপর সম্ রাখা হয়। এ রোগের যে কি ঔষধ আছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তাহা জানেন না। দিন যায়, রাত্রি যায়, দিন আইসে, রাত্রি আইসে, এই রকমে সময়ের পর্য্যায়ে কত দিন আসিল, কত দিন চলিয়া গেল, কত রাত্রি আসিল, কত রাত্রি বিদায় হইল, উত্তরোত্তর অভাবের বৃদ্ধি, উৎপাতের বৃদ্ধি, পীড়নের বৃদ্ধি। এই তিনের সমষ্টি কেবল কলহ। পাঁচ সাতদিন সেই লোক গৃহে অনুপস্থিত। নগরে একদিন মহা-মহোৎ-সব। হিন্দুমাত্রেই সেই পর্ব্বাহে আনন্দিত হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতেছে। ভাগ্যবানের গৃহে গৃহে মহাভোজ, নৃত্যগীতপ্রমোদের উৎসব প্রবাহিত। নগরের নরনারীকুল নব নব বসন পরিধান করিয়া পরমানন্দে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিতেছে, সহাস্যবদনে কৌতুকবিলাস বিকাস করিতেছে, বালকবালিকাদের আরও অতুল আনন্দ। আমরা যে গৃহের কথা কহিতেছি, সেই অন্ধকার গৃহ নিরানন্দময়। সম্মুখের কপিত্থবৃক্ষের কাক মধ্যেমধ্যে বিকট গর্জ্জন করিয়া বাড়ীখানিকে যেন কাঁপাইয়া দিতেছে। দরিদ্রতাব সঙ্গে বিপদকে যেন ডাকিয়া আনিতেছে। এক একবারের গর্জ্জনে বিপদ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া কৃষ্ণবর্ণ কলেবরে সংসারীর সংসারের সমস্ত সুখের আশা ঢাকা দিয়া ফেলিতেছে। সাধারণ লোকে বলে, দাঁড়কাকেরা যমরাজের দূত। বিকট রব শ্রবণ করিলে তাহাই সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়। যমরাজের দৌত্যকর্ম্ম করিবার অগ্রে সেই সকল বিকটাকার কাক প্রতিদিন সমস্ত বিপদের দূত হয়। কথিত কপিত্থবৃক্ষের প্রকাণ্ড কাক কর্কশ কলকলনাদে কি কথা কহিতেছে, নানা যন্ত্রণানলে যাহার অন্তর জ্বলে, সে ভিন্ন আর কেহ সেই শব্দ বুঝিবে না। বলা হইয়াছে, সেই গৃহ নিরানন্দময়। স্ত্রীলোকটী একখানি জীর্ণ মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া ছেলেটীকে

সঙ্গে লইয়া গৃহের বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। গৃহে খাদ্যসামগ্রী কিছুই নাই। সন্ধ্যা হইয়াছে। আধখানি রুটী ছিল, তাহাতে একটু নুন মাথাইয়া ছেলেটীকে খাইতে দিয়াছে। আপনি সমস্ত দিন উপবাসিনী। যে কয়েকটী বালিকা বুটাকাটা কাজ শিক্ষা করে, পার্ব্বণের দিনে তাহারা কিছু কিছু পার্ব্বণী দিয়া গিয়াছে। সেই পার্ব্বণীতে পাঁচটী মুদ্রা সম্বল। নিরাশ হৃদয়ে অল্প অল্প আশার সঞ্চার। কিন্তু বাজার করিয়া আনে, এমন লোক নাই। পার্ব্বণের দিন সকলেই ভাল খায়, ভাল পরে, ছেলেটী কেবল কাঁদিতেছে। মায়ের প্রাণ এমন অবস্থায় সন্তানের রোদনে কত সুখী হয়, পুত্রবতীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না, আশা-চপলার পাঠিকাঠাকুরাণীদের মধ্যে যাঁহারা পুত্রবতী, তাহারা এই বালকের রোদন শ্রবণে অবশ্যই অশ্রুবর্ষণ করিবেন। প্রায় সমস্ত দিন উপবাস। উৎসবে নিরুৎসব। আনন্দে নিরানন্দ। এ অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কাজেই অসহায়িনী জননী নিজেই বাজারে যাইবেন স্থির করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের একটী প্রাণ আছে। কুলাঙ্গনাই হউন, অথবা কুলটাই হউক, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কাহারও কাহারও জন্য সেই প্রাণ কাঁদে। এই অভাগিনীর প্রাণ কাঁদিতেছে। কিন্তু কাহার জন্য? যে দুরাচার নিত্য নিত্য আসিয়া প্রহার করে, যে দুরাত্মা নিত্য আসিয়া গালাগালি দেয়, যে পাপাশয় নিত্য অর্থলোভে অন্ধ হইয়া শুষ্ককাষ্ঠে বজ্রাঘাত করে, সেই দুরন্ত দস্যুর জন্য অভাগিনীর প্রাণ কাঁদিতেছে। ভাবিতেছে, পার্ব্বণে কেহ কখনও বাহিরে থাকে না। হয় ত আজ আসিবেই আসিবে। অপরাধ করিয়াছে, অপরাধ করিয়াছি, প্রহার করিয়াছে, প্রহার করিয়াছি, গালাগালি দিয়াছে, গালাগালি দিয়াছি; তাহা আর কত দিন মনে থাকে? আমি ভুলিয়াছি, সে কি ভুলিতে পারে না?—আসিবে। তাহারো আয়োজন করিয়া রাখি। কপাল দুঃখের। শরীর কেন সুখের হয়? হইতে কি নাই? উৎসবের রজনী, একসঙ্গে তিনজনে আহার করিব। এত দুঃখেও একটু সুখ উপজিবে। আমি যেমন আশা করিতেছি, সে কি এইরূপ আশা করিতেছে না? অবশ্যই করিতেছে, অবশ্যই আসিবে। অভাগিনী জানে না, আশা-চপলা। যাহার আশা

করিতেছে, যাহার ভাবনা ভাবিতেছে, সত্য সত্য সে যদি আসে, উৎসবের জন্য আসিবে না, সর্ব্বনাশ করিতে আসিবে। এটীও আমাদের বাক্য নয়; এটীও আশার বাক্য। সাবধান হও!

বাণী যেন দৈববাণী ফলাইয়া দিল। পুত্রসমভিব্যাহারিণী জননী অনেক আশা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, আশার বস্তু শান্ত-মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিল। শান্তস্বরে কহিল, "এ কি? করিতেছ কি? কোথায় যাইতেছ? আমি অপরাধী। লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারি নাই! প্রিয়-তমে! আমার উপর অভিমান করিতে পার, আমিও তোমার উপর অভি-মান করিতে পারি, কিন্তু সে অভিমান কতক্ষণ থাকে? আমাদের এখন দুঃসময়। দুরবস্থাবহ্নি দুঃসময়ের উপর শতগুণ হইয়া জ্বলে। অভিমান তাহাতে যেন ঘৃত হইয়া আহুতি পায়। জীবিতেশ্বরি! আজ বড় আনন্দের রজনী। এই শিশুকে কোলে করিয়া আমরা দুইজনে একত্রে পর্ব্বানন্দ অনুভব করি, এই আমার বাসনা। তুমি কোথায় যাইতেছ?"

ছল ছল চক্ষে রমণী উত্তর করিল, "বাজারে যাইতেছি। সমস্ত দিন উপবাস, ছেলে আমার কেঁদে কেঁদে সারা, এমন একখানি কাপড় নাই যে, পরাইয়া দিই। এমন একটু সামগ্রী নাই যে, আহার করিতে দিই। লোকের ছেলেমেয়ে আজ কত হাসিখুসী করিতেছে, আমার বাছা কি না পেটের জ্বালায় ধূলায় গড়াগড়ি! তুমি আসিয়াছ, তোমার সুমতি হইয়াছে, ঠাণ্ডা মূর্ত্তি দেখিতেছি, সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি থাক, ছেলে থাক্, আমি বাজারে যাইতেছি।"

"সে কি প্রাণেশ্বরি!"—যেন কত দুঃখ জানাইয়া, যেন কত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রবেশকর্ত্তা কহিল, "সে কি প্রাণেশ্বরি! তুমি বাজারে? তুমি? তুমি? কি লজ্জা! এ লজ্জা রাখিবে কোথায়? তুমি বাজারে? পার্ব্বণের রাত্রি, রাস্তায় কত লোক, কতই ভিড়, কাহার মনে কি আছে, তুমি বাজারে যাইবে? এই মাত্র আমি দেখিয়া আসিতেছি, কত মাতাল, কত চোর, কত জুয়াচোর, কত বেশ্যা, কত লম্পট, এধার ওধার ছুটাছুটি করিতেছে। এ সময় এ রাত্রে কি ভদ্রলোকের কন্যা রাস্তায় বাহির হয়? কি আনিতে হইবে বল, আমি যাইতেছি।"

অবলা ভুলাইতে কতক্ষণ ? অবলা ভুলিয়া গেল। আহ্লাদে যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বিশ্বাসবাক্যে কহিল, "ছেলের একখানি কাপড়,—চাদর আনিতে হইবে না, টাকায় কুলাইবে না, ছোট একখানি রুমাল। আর—আর তুমি নিজে যাইতেছ, কি আর শিখাইয়া দিব, পার্ব্বণে তিন জনের খাদ্য সামগ্রী।"

"কেবল এই পর্য্যন্ত ? আর কিছু না ? এত বড় পার্ব্বণ, তুমি একখানি নূতন কাপড় পরিবে, চক্ষে দেখিয়া আমি আনন্দে ভাসিব। তাহা—"

"না প্রাণেশ্বর! আমার বস্ত্রে প্রয়োজন নাই। টাকায় কুলাইবে না। তুমি আসিয়াছ, তুমিই আমার বস্ত্র। যাহা বলিলাম, তাহাই।"

"টাকার জন্য ভাবিতেছ ? আমার সঙ্গে টাকা আছে। এমন উৎসবে তোমাকে যদি আমি একখানি নূতন কাপড় দিতে না পারি, তবে আমার রাজপুত্র নাম ধারণ করা বৃথা। তোমার কাছে এখন কত টাকা আছে?"

"দান পাইয়াছি, কেবল পাঁচটী মাত্র।"

"পাঁচটী ? পাঁচটী ? উঃ! তাহাই যথেষ্ট! তাহার উপর যত দিতে হয়, আমি দিব। সেই পাঁচটী টাকা আমায় দাও, পাঁচগুণ, দশগুণ, বিশগুণ আনিয়া দিব। এত বড় মহোৎসবে তুমি নূতন কাপড় পরিবে না, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করিব ? দাও সেই পাঁচ টাকা।"

হস্তেই ছিল, বিনাসন্দেহে মনের উৎসাহে প্রফুল্লমুখী যুবতী সেই অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে তাহা সমর্পণ করিল। কহিয়া দিল, "বিলম্ব করিও না। বাছা আমার সমস্ত দিন কিছুই খায় নাই। আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, কষ্ট হইতেছে না। তুমি আসিয়াছ, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছি; কিন্তু অজ্ঞান বালক উপবাসী আছে। বিলম্ব করিও না।"

"বিলম্ব ? বিলম্ব রাজকুমারী ? চক্ষের পলক পড়িতে যত বিলম্ব হয়, তত বিলম্বও আমি—আমি—"

"হাঁ! শীঘ্র যাও। আমি আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।"

নাটকের ছোট নটের প্রবেশ আর প্রস্থান যেরূপ, এই গৃহের প্রবেশকারীর প্রবেশ আর প্রস্থান ঠিক সেইরূপে সম্পাদিত হইল। পাঁচটী টাকা লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। রাত্রি অনুমান চারি দণ্ড।

এক দণ্ড গেল, লোক ফিরিল না; দুই দণ্ড অতীত, তখনও দেখা নাই। তিন চারি করিয়া পাঁচ ছয় দণ্ড অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপিও না। স্ত্রীলোকটী পথ চাহিয়া আছে। ক্ষুধায় কাতর হইয়া বালক ক্রন্দন করিতেছে। গৃহের চতুর্দ্দিকে দূরে নিকটে উৎসবের কোলাহল, পথিক লোকের কলরব শ্রবণগোচর হইতেছে। তাহাতে মন আরও বিচঞ্চল। অবলা ভাবিতেছে, কি হইল? বাজার কি অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে? ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব ত কখনই হয় না! তবে এ কি হইল? বলিয়া গিয়াছেন, পথে অসম্ভব ভিড়। সেই ভিড় ভেদ করিয়া আসিতে বোধ হয় বিলম্ব হইতেছে। বালক অনাহার, শুনিয়া গিয়াছেন, দেখিয়াও গিয়াছেন। পার্ব্বণে ইচ্ছা করিয়া কখনই দেরি করিবেন না। শীঘ্রই আসিবেন. কিন্তু যতক্ষণ না আসেন, বালককে কি করিয়া থামাইয়া রাখি? মনে অনবরত এইরূপ চিন্তা।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। কোথায় বা বাজার, কোথায় বা সে লোক, আর কোথায় বা কি? সমস্তই ফক্কিকার। স্ত্রীলোকটীর মনে তখন ভয়ের সঞ্চার হইল। অন্য কোন ভয় নয়, টাকা লইয়া সেই লোক পলায়ন করিবে, সে সন্দেহ আসিতেছে না, অন্য প্রকার আশঙ্কা। পথে কি কোন প্রকার বিপদ হইল? যে ভয়ে আমারে বাহির হইতে দিলেন না, সেই ভয় কি তাঁহাকেই আক্রমণ করিল? না,—এমন হইতে পারে না। তিনি সাহসী বীরপুরুষ। এক সময়ে অস্ত্র ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন। এখন এত যে হীনাবস্থা, তথাপি একখানি ছোরা সঙ্গে থাকে। হঠাৎ বিপদে পড়িবেন না। সামান্য লোকে মনে করিলেই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু ছেলে শান্ত করি কিরূপে?

রাত্রি আড়াই প্রহর অপেক্ষাও বেশী। তখনও পর্য্যন্ত সে লোকের দেখা নাই। চিন্তার সঙ্গে ভয়ের বৃদ্ধি! চক্ষে জল আসিল। সন্তানের মুখপানে চাহিয়া সেই স্ত্রীলোক রোদন করিতে লাগিল। সে যে শোচনীয় দৃশ্য, হৃদয়বান লোকে তাহা দর্শন করিতে পারেন না। দর্শন করা দূরে থাকুক, শ্রবণ করিলেও মর্ম্মে মর্ম্মে নিদারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। শ্রবণ করা দূরে থাকুক, মনে মনে কল্পনা করিলেও হৃদয়ে ব্যথা লাগে। ছেলেটী

সমস্তদিন কেবল জল খাইয়া রহিয়াছে। আধখানি রুটীমাত্র সম্বল ছিল, তাহা কেবল নামমাত্র আহার। বালকের প্রাণ কতদূর সহ্য করিতে পারে ? তথাপি এ ছেলের সহ্যগুণ অধিক। সচরাচর সংসারে দেখা যায়, সুখীলোকের সন্তান অপেক্ষা দুঃখীর সন্তান ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লেশ সহ্য করিতে বহুগুণে শক্ত। সেই দৃষ্টান্তের এক দৃষ্টান্ত এই।

রজনী তৃতীয় প্রহরের সীমায় উপস্থিত। বালক আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্তই অস্থির হইয়া উঠিল। মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছিল, আরও শুকাইল। অশ্রুপূর্ণনয়নে জননীর মুখপানে চাহিয়া আধআধবাক্যে কহিল, "মা! বড় খিদে পেয়েছে, গা কাঁপ্‌ছে; একটু জল দাও।"

যে সন্তান জননীকে এরূপ কথা বলে, সে সন্তানের মুখ দেখিয়া সে জননী কিরূপে প্রাণধারণ করেন, মানবসংসার মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার উত্তর দিতে পারিবেন; সকলে পারিবে না। সেই অনাথা স্ত্রীলোক উপবাসী পুত্রের তাদৃশ কাতরবচন শ্রবণ করিয়া কিরূপ বিকলচিত্ত হইল, তাহার হৃদয় ফাটিয়া গেল কি অক্ষত রহিল, সেই ভিন্ন আর কেহ তখন তাহা জানিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ঘরে আর কি আছে যাদু? সমস্তই ত ফুরাইয়া গিয়াছে। মা হইয়া কোন্ প্রাণে আমি,—দিবারাত্রি উপবাসী তুমি,—কোন্ প্রাণে আমি তোমার ঐ চাঁদমুখে শুদ্ধমাত্র জলবিন্দু প্রদান করিব? বুক যে ফাটিয়া যায় বাছা! কেন তুমি এই অভাগিনীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলে? হাঃ বিধাতা আমার ললাটে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত পাপ লিখিয়াছিলেন, স্বপ্নেও জানিতাম না। এখন যদি এই পৃথিবী আমার সম্মুখে বিদীর্ণ হইয়া আমারে গ্রাস করেন, তাহা হইলেই জন্মের মত জুড়াই। কালানল মূর্ত্তিমান হইয়া এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তেই যদি আমারে ভস্ম করিয়া ফেলে, তাহা হইলেই জন্মের মত জুড়াই। পাতাল হইতে কালসর্প উঠিয়া এই মুহূর্ত্তে যদি আমারে কালবিষানলে দগ্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলেই জন্মের মত জুড়াই। প্রবল বন্যাবেগে উচ্ছলিত হইয়া চন্দ্রভাগানদী কিম্বা সিন্ধুনদসহ পঞ্জাবের পঞ্চনদী চক্ষের নিমেষে যদি আমারে অতল জলতলে ডুবাইয়া দেয়, তাহা হইলেই জন্মের মত জুড়াই।

আকাশের দেবরাজের ভীষণ দৈত্যঘাতী বজ্র জলন্ত অগ্নি বর্ষণ করিয়া নিমেষমধ্যে যদি আমার এই পাপমস্তকে নিপতিত হয়, তাহা হইলেই জন্মের মত জুড়াই। নতুবা এই যন্ত্রণাগুন হইতে শান্তিলাভের আর অন্য উপায় দেখি না। পরমেশ্বর! আঃ! আমার এই পাপমুখে পরমেশ্বরের নাম! আমার এই পাপরসনা সেই নিষ্কলঙ্ক নামকে কলঙ্কিত করিতেছে! বাছা! একটু শান্ত হও, তিনি এখনি আসিবেন।"

আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোকের মন যতই চঞ্চল হউক, স্ত্রীলোকের চরিত্র যতই পবিত্র অথবা যতই অপবিত্র হউক, সন্তানের মায়া তাহাদিগকে যতই অস্থির করিতে পারে, তত আর কিছুতেই পারে না। যদিও কোন কোন পাপীয়সী পাপবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া কিম্বা অপরের মন্ত্রণা শুনিয়া স্বহস্তে পুত্র বিনাশ করিয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা জগজ্জননী-প্রকৃতিদেবীব উপদেশের বিরুদ্ধ। সেরূপ উদাহরণে সাধারণ নারী-জাতিকে স্নেহমায়াবিবর্জ্জিতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

সপ্তমবর্ষীয় শিশু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর। জননীর নির্ব্বেদবাক্যগুলি কেবল কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল মাত্র, তাৎপর্য্যগ্রহ হইল না; হইবার সম্ভাবনাও নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাতর হইয়া রোরুদ্যমানভাবে আবার কহিতে লাগিল, "মা! জলতেষ্টায় আর বসিতে পারি না। জিব শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্চে। তিনি কখন আস্‌বেন? একটু জল দাও। আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

জননীর স্নেহকাতর চিত্ত এককালে যেন বিভ্রান্ত হইয়া গেল। নেত্র-বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইয়া যেন মূর্চ্ছাপন্ন রোগীর ন্যায় বাক্‌রোধ হইল। অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বহুদিনের পরিত্যক্ত একটী মৃণ্ময়পাত্রের নিকটে গমন করিলেন। তাহাতে অনুমান একমুষ্টি পচা ময়দা ছিল। কষ্টে সেইগুলি বাহির করিয়া জলে গুলিয়া,—মুন পর্য্যন্ত গৃহে নাই, সেই ময়দার মণ্ড সন্তানের বদনে প্রদান করিলেন। চক্ষের জলে গণ্ডস্থল, বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। বালক ঘুমাইয়া পড়িল।

রজনী প্রভাত। কাহারও দেখা নাই। আর একজন আসিবার আশা ছিল, রক্তবর্ণ সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সেই আশা অভাগিনীর

হৃদয়ে একটু একটু দীপ্তি বিকাশ করিল, কিন্তু প্রভাতের সূর্য্য অধিকক্ষণ রক্তবর্ণ থাকেন না।' আরক্তবদনে ক্ষণকালমাত্র কমলিনীকে দেখা দিয়া রজতবর্ণ ধারণ করেন। ক্ষণকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী রক্তবর্ণ হয়। লোকে যাহাকে স্বর্ণবর্ণ বলে, আমি তাহাকে রক্তবর্ণ বলি। প্রকৃতিসতী ইহার নিমিত্ত আমার প্রতি অপ্রসন্ন হন না। দিনমণি রজতবর্ণ। সেই স্ত্রীলোকের আশা ক্রমে ক্রমে রজতবর্ণে পরিণত। কেহই আসিল না। নূতন প্রভাতে কি হয়? দুরন্ত পিপাসা সংসারের লোককে যেন মাতাইয়া তুলে। একটী প্রাচীন গীত আছে:—

"প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, ভ্রমি দিবানিশি,
সর্ব্বনাশি! জানিস্ কতই ছল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধোরে খাই হলাহল।"

অর্থলোভী দরিদ্রের পক্ষে এই গীতটী বিলক্ষণ সঙ্গত, বিলক্ষণ সংলগ্ন। যে হতভাগিনীর কথা আমরা বলিতেছি, নূতন প্রভাতে তাহার ভাগ্যে যে কি ঘটিল, তাহা কেবল সেই জানে আর আমি জানি, আর চারিযুগের সকল কথা যিনি জানেন, তিনিই জানিতে পারিলেন। ছাত্রীদত্ত বেতনে জীবিকানির্ব্বাহ হয়। সচ্ছন্দে নহে, যথাকথঞ্চিৎ কষ্টে শ্রেষ্টে। তাহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আনয়ন করিয়া দিন গুজরাণ হইল; একটী মাত্র দিন নয়, দশ বার দিন গুজরাণ হইল। যাহাকে দেখিবার আশা, তাহার দর্শন নাই। ত্রয়োদশ দিবসের অবসানে সেই লোকটী,—যিনি পাঁচটী টাকা লইয়া বাজার করিতে গিয়াছিলেন;—সেই লোকটী দর্শন দিলেন। কি ভাবে দর্শন, তাহা পরিচয়ে প্রকাশ পাইবে।

পরিচয় এখন আর ভবিষ্যতের গর্ভে নয়। ভূতকালের গর্ভে যাহা ছিল, তাহা ভূতসাগরে ডুবিয়াছে। এখনকার যে পরিচয়, তাহা বর্ত্তমানের হস্তে। লোকটী প্রবেশ করিয়াই কৃত্রিম কাতরতা প্রদর্শনে সেই অবলাকে

কহিলেন, "বড় অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। জানই ত, তোমার সেই পাঁচ টাকা। শুনিয়াছিলে ত, আমার সঙ্গে আরও অনেক টাকা ছিল, সমস্তই গিয়াছে।"

পাঠকমহাশয়! এ পরিচয় কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? চন্দ্রগ্রহণ। সর্ব্বগ্রাস। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রাসে। কৌমুদীময়ী যামিনী নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নূতন না পুরাতন? যে ক্ষেত্রের যে অবস্থা, তাহা বিবেচনা করিয়া তুলনা করিলে নূতন পুরাতনে প্রভেদ করিতে কিছু কষ্ট হয়। তেমনি কষ্টে এই পরিচয়টী বুঝিয়া লইতে হইবে। যিনি পরিচয় দিতেছেন, তিনি পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন, "জানই ত, তোমার টাকা আর আমার টাকা এক সঙ্গে ছিল। বাজারপর্য্যন্ত যাইতে হইল না! বলিয়াছিলাম ত, পথে জুয়াচোরের ভিড়, চোরের ভিড়, মাতালের ভিড়, লম্পটের ভিড়, জগতে যত ভিড় থাকিতে হয়, সব ভিড় একত্র। সম্মুখে দেখি, একটা গাঁটকাটা। ঠিক যেন সেই বিতাস্থর চেহারা। না,—না,—সে বিতাস্থ ত মুসলমান হইয়াছিল, সে ত মরিয়া গিয়াছে। সে কেন? কেন? ঠিক্ যেন আনোয়ারবখ্ত। না,—তা কেন? সে ত এখন প্রয়াগে। সে কেন এখানে গাঁটকাটা হইয়া আসিবে? সে না। ঠিক যেন সেই লিঙ্গেশ্বর। চক্ষে কেমন ধাঁদা লাগিয়াছিল, যাহাকে দেখি, তাহাকেই যেন চেনা চেনা বোধ হয়। লিঙ্গেশ্বর হইল না, সে লোকটাও মুসলমান। মুসলমানী নামটা মনে হয় না, কিন্তু সে না। গাঁটকাটাটা হিন্দু। ঠিক্ যেন তোমাদের রঘুবরের পুত্র স্বর্ণভূষণ। না,—তাও না। স্বর্ণভূষণ ত মরিয়া গিয়াছে। সে একটা নূতন গাঁটকাটা। কে জানে ভাই! চিনি চিনি চিনি না, কিন্তু একটা গাঁটকাটা। যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। যদি পলায়ন করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাণেই মারিয়া ফেলিত! ভগবানের অনুগ্রহে একবস্ত্রে প্রস্থান করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। চক্ষুলজ্জায় এতদিন তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই। এখন একটা লোক আমাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতেছে, সে আমার কাছে কিছু টাকা পাইবে। বেশী না, বড় জোর হাজার কি দশ হাজার। তুমি কিছু সাহায্য করিতে পার?"

কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া সেই স্ত্রীলোক অন্য কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন করিতেছ কেন? আসিয়াছ, স্থির হও, একটু বিশ্রাম কর, আমার পাঁচ টাকা চোরে লইয়াছে, তুমি তাহার কি করিবে?"

"করিব না কিছু, কিন্তু তোমাকে বলিতেছি, গাঁটকাটা লোকেরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম মানে না।"

"তাহা হইতে পারে, কিন্তু তুমি যে অত লোকের নাম করিলে, তাহারা তোমার কি করিয়াছে?"

"কিছুই করে নাই, কিন্তু আমি যেন ভিড়ের ভিতর তাহাদের চেহারা দেখিয়াছিলাম।"

"তাহা হইতে পারে, ভয়ে পারে, স্বপ্নেও পারে, অন্ধকারের ভেল্‌কিতেও পারে। কিন্তু আচ্ছা! স্বর্ণভূষণ কে?"

"সে একজন রাজার ছেলে। আমার সঙ্গে তাহার অনেক দিনের জানা শুনা ছিল, দুজনেই রাজার ছেলে কি না, বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাই"—

"কিন্তু আচ্ছা। বরাবর শুনিতেছি, তুমি একজন রাজার ছেলে। কিন্তু বল দেখি, তোমার পিতা কোন্ রাজা?"

"নাম ত আমি জানি না, লোকে বলে রাজকুমার, আমি বলি রাজকুমার। তোমাকেও যেমন লোকে বলে রাজকুমারী, আমিও বলি রাজকুমারী। কিন্তু তুমি বল দেখি, তোমার পিতা কোন্ রাজা?"

"আমার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে, আমি রাজকুমারী নই। আমি কাঙ্গালিনী, আমি ভিকারিণী, আমি অভাগিনী, আমি হতভাগিনী, আমি পাপিনী, আমি মহামহা কলঙ্কে কলঙ্কিনী। আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? রাজকুমারী হইলে আমার কি এমন দুর্দ্দশা হয়? ভিক্ষা করিলেও অন্ন মিলে না, সন্তানের মুখে আহার দিতে পারি না! কে যে আঁমি, কিছুই জানি না।"

"তবে যে তখন বলিয়াছিলে রাজকন্যা?"

"তবে যে তুমিও তখন বলিয়াছিলে রাজকুমার? এখন ত দেখিতেছি, দুই জনেই সমান! কি যে ভোঁজবাজী তোমাকে আমাকে সংসারের মায়া-চক্রে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া সেই স্ত্রী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, "এখন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, এই ছেলেটীর দশা কি হইবে?"

"কাহার ছেলে? কোন্ ছেলে? কোথাকার ছেলে? কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিয়া নির্জ্জল চক্ষে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া সেই কাতরা রমণী নূতন কথায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তবে কোন্ দেশের লোক? অবলাকে ছলনা করিতে আসিয়াছ, কতদিন হইতে ছলনা করিতেছ, কতবার কতরূপে আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছ, এখন আমাদের দুঃখের চরমদশা। এখন মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল, তুমি কে? কোন্ দেশের লোক তুমি?"

"ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, মিছি—না,—না, তোমাকে আমি চিনি না,—ও কথা ছাড়িয়া দাও! না,—না,—কথা ছাড়িয়া দিও না, ভারি জুলুম, সাহায্য করিতে পার?"

কট্মট্ চক্ষে সম্ভাষণকারীর আরক্তলোচন নিরীক্ষণ করিয়া সেই অসহায়িনী নারী সভয়কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "ভিকারিণীর কাছে সাহায্য চাহিতে হয় না! যে কাঙ্গালিনী বিন্দু বিন্দু জলপান করাইয়া গর্ভজাত সন্তানকে নিশাকালে ঘুম পাড়ায়, অপরকে সাহায্য করে, তাহার এমন কি সাধ্য?"

"কেন রাজকুমারী! আমি জানি, তুমি রাজকুমারী, আরও জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, আরও জানি, তুমি অনেক ছাত্রীকে ফুলবুটা শিখাও। মাসে মাসে টাকা পাও। তুমি কি আমাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পার্ না? কেন চাতুরী? কেন ছলনা? কেন প্রতারণা? কেন বঞ্চনা? কেন কৃপণতা? বেশী না, হাজার কি দশ হাজার।"

"অত টাকা আমি কোথায় পাইব? যখন দিন ছিল, তখনকার এক কথা! এখন—"

"এখনও তুমি তাই। মনে কর, এখনও তোমার সেই দিন আছে। মনে করিলে এখনি তুমি আমাকে নিদারুণ ঋণদায় হইতে আনায়াসে নিস্তার করিতে পার।"

"পারি বটে, কিন্তু এই শিশুটীকে একমুষ্টি অন্ন দিতে আমার ক্ষমতা নাই। এ কথার উপর তুমি আর কি কথা বলিতে চাও?"

"তাহা আমি শুনিব না। পঞ্জাবী লোকের অনেক টাকা, অনেক ধন, অনেক ঐশ্বর্য্য! সেই সকল লোকের মেয়েরা তোমার ছাত্রী; একজনের উপর বরাত কর, আমার অভাব থাকিবে না।"

"বরাত করিব কাহার উপর? একজন গোবিন্‌লাল সিং। কেবল তাহারই কাছে আমার দশটী টাকা জমা আছে। তাহা যদি—"

"তাহাই আমাকে বরাত দাও, তাহাই আমার পক্ষে এখন যথেষ্ট হইবে। দুরন্ত মহাজনেরা যে প্রকারে আমাকে উৎপীড়ন করিতেছে, এ সময় যদি দশটী টাকা পাই, তাহা হইলেও যোগেযাগে তাহাদিগকে আপাততঃ থামাইতে পারি।"

"বল কি তুমি? জীবনের শেষসম্বল পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিবে? এতই কি নিষ্ঠুর হইয়াছ তুমি? এমন ত ছিলে না। এখন এতই কি নিষ্ঠুর হইয়াছ তুমি? দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে? রাত্রি প্রভাত হইলে শিশু যখন মা বলিয়া রোদন করে, তখন আমি বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখি। কায়িক পরিশ্রমে যাহা কিছু পাই, তাহাই সংগ্রহ করিয়া ছেলেটীর প্রাণ রক্ষা করি। স্ব ইচ্ছায় মরিতে নাই, নিজেও প্রাণধারণ করি, তুমি কখন আসিবে, নিশ্চয় নাই, তবুও কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখি। স্ত্রীলোক হইয়া এতদূর করি। তাহা পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে চাও তুমি? বনের বাঘ যাহা পারে না, ঘরের বিড়ালকুকুর যাহা পারে না, পৃথিবীর মানুষ হইয়া তুমি সেইরূপ নিষ্ঠুর স্বার্থপরের কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর?"

নিষ্ঠুর স্বার্থপর মনে মনে হাসিয়া আর কথা কাটাকাটি করিল না। অভাগিনীকে পদাঘাত করিয়া রোষভরে বাহির হইয়া গেল।

গোবিন্‌লাল সিঙের কুঠী। তত্ত্ব করিয়া করিয়া অন্বেষণকারী লোক সেই কুঠীতে উপস্থিত হইল। যৎসামান্য পরিচ্ছদ, উস্কখুস্ক কেশ, মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, চক্ষুও তাম্রবর্ণ। একজন প্রহরী সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার তত্ত্ব কর?" লোক উত্তর করিল, "কুঠীয়াল গোবিন্‌লাল।"

"প্রয়োজন?"

"যাঁহার নিকটে প্রয়োজন, তাঁহার নিকটে বলিব। সংবাদ কর, তোমার সঙ্গে আমার কোন বিষয়কর্ম্মের কথা হইতে পারে না।"

"বিষয়কর্ম্ম? ওঃ! তবে এইখানে দাঁড়াও, আমি সংবাদ দিতেছি।"

প্রহরী সংবাদ দিতে গেল, বিষয়কর্ম্মের উমেদার বাহির ফটকে দাঁড়াইয়া রহিল। বিষয়কর্ম্মের কায়দাকানুন যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন, সে অবস্থা কেমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। অনেকক্ষণ পরে প্রহরী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হুকুম হইয়াছে, সাক্ষাৎ করিতে পার।" প্রহরীর সঙ্গে দর্শনাকাঙ্ক্ষী নির্দ্দিষ্ট স্থলে গমন করিল। সাক্ষাৎ হইল। বাক্য বিনিময় হইল, গোবিন্‌লাল সিং উত্তর দিলেন, "সে স্ত্রীলোকের দশটাকা জমা আছে সত্য, কিন্তু তোমাকে চিনি না, তোমাকে দিতে পারিব না। স্বাক্ষর আনিতে পার, আদেশপত্র আনিতে পার, তাহা হইলে দিতে পারি।"

লোকটী তখন হতাশ হইয়া পুনরায় সেই স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত হইল। কতই আত্মীয়তা জানাইয়া, কতই চাটুবাক্য বলিয়া, সেই নারীকে কহিল, "সমস্তই ঠিক্। তুমি একটী স্বাক্ষর কর, তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইব।"

স্ত্রীলোক যেন লজ্জাবতী লতার মত মুদিতনেত্রা।—কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, "তাহা আমি পারিব না। কখনও অস্বীকার করি নাই, আজি করিলাম। বুঝিয়াছি আমি।—নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুরতা কোথায় শিখিয়াছ? শিশুর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার সাধ? আমি তাহার গর্ভধারিণী। প্রাণ থাকিতে ত তাহা পারিব না। এইক্ষণে তুমি যদি আমার গলায় ছুরি দাও, মরিব, মরিতে পারিব; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে দেখিব না, সন্তান আমার অনাহারে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া গেল। যাহা মনে করিয়া তুমি আসিয়াছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু আমার নিকটে তোমার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। হইতে পারিত, যদি আমি বন্ধ্যা হইতাম। কিন্তু গর্ভে যখন সন্তান জন্মিয়াছে, তখন আমি রাক্ষসীর মত কার্য্য করিতে পারিব না। তুমি যাও, তুমি পুরুষমানুষ, অন্য উপায় দেখ। শরীরের অনেক রক্ত ব্যয় করিয়া, শরীরকে অনেক কষ্ট দিয়া, সন্তানকে অনেক কষ্ট দিয়া সেই

দশটী টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। তাহার উপর হস্তারকহইবে তুমি? ইহা ত জানিতাম না! তুমি যাও! ভালবাসি, বিশ্বাস করি, অনেকদিনের পরিচয়, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তোমার সমস্তই প্রতারণা। নারীবঞ্চক তুমি, পুত্র-বঞ্চক তুমি, ধর্ম্মবঞ্চক তুমি; তোমাকে আর আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করিলেই বা কি হইবে? নিজে তুমি অবিশ্বাসী। তোমার অনেক প্রলোভনে আমি ভুলিয়াছিলাম,—তখনও ভুলিয়াছিলাম, এখনও ভুলিয়াছি। কিন্তু জান আমি কে?"

"না,—না,—জানিব না, জানিবার আবশ্যক নাই, তুই কুলটা। আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলি, জানি। পরিচয় শুনিব না, পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। থাক্ তুই কলঙ্কিনী, আজ হইতে তোর সঙ্গে আর হয় ত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমানতী টাকা—"

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ গর্জ্জনে গর্জ্জন করিতে করিতে নূতন লোক বাহির হইল। নুতন কি পুরাতন, সে ক্ষেত্রে তাহার কিছুই প্রকাশ নাই। চতুর্দ্দিকে বন, মধ্যে একখানি আটচালা ঘর। সেই ঘরে আটজন লোক মাতামহী-গল্পের ধূম্রা ধরিয়াছিল। মধ্যস্থলে একটী মেজ, তাহার উপয় চিঠিপত্র লিখিবার সমস্ত সরঞ্জাম সজ্জীভূত। লোকেরা করিতেছিল কি? তাস খেলিতেছিল, পাশা চলিতেছিল, চীৎকার হইতেছিল; নিস্তব্ধ গতরঞ্জখেলা। এখনকার কাল হইলে হয় ত বোতলগেলাসের খেলা থাকিত, কিন্তু তখন তাহা ছিল না; যাহা ছিল, তাহা গোপনে। কিন্তু মাদকের অন্য অন্য অঙ্গ সেখানে প্রবেশ করিবার নিষেধ ছিল না। লোকটী গম্ভীরভাবে প্রবেশ করিয়া একখানি চিঠি লিখিল, স্বাক্ষর করিল, মোড়ক করিল, শিরোনামা দিল, মোহর নাই। গালার ছাব দিল। লোকেদের সঙ্গে ধূমপান করিল। দণ্ডেকের মধ্যেই বহির্গত। আবার সেই গোবিন্‌লাল সিঙের কুঠী।—চিঠি পেস্ হইল, আমানতী টাকা বাহির হইয়া আসিল, লোক যেন দেব-ঋষির মত অন্তর্দ্ধ্যান। অনাথা ললনার জীবিকা গেল, অনাথ বালকের জীবনোপায় ফুরাইল, তবে আর থাকিল কি? থাকিল কেবল চাতুরী আর ছলনা। থাকিল কেবল দুষ্টলোকের দুর্নাম। থাকিল কেবল জালি-য়াতের জালপত্র। কৎবেলের গাছে কাক ডাকিয়া উঠিল, কা কা কা।

পাঠকমহাশয় হয় ত এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না, একটা কাক এখানে বসিয়া আছে কেন? নূতন কি পুরাতন? কত কাক নূতন হইতেছে, কত কাক পুরাতন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এই আশা-চপলার গ্রন্থকার নূতনও নহেন, পুরাতনও নহেন। হুতম প্যাঁচার সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ দৃষ্টান্তে বলেন ত বলুন, নূতন। ভুষুণ্ডী কাকের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বলেন ত বলুন, পুরাতন। এখন সেই বড় কাক ডাকিয়া উঠিল, কা কা কা।

অনাথার জীবনসম্বল উড়িয়া গেল। বালকের মুখের আধার উড়িয়া গেল, কিন্তু কাক উড়িয়া গেল না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি?

আশ্চর্য্য আমি। ষষ্ঠ জেম্‌সের সময়ে বিলাতে সাহিত্যশাস্ত্রের বাতী জ্বলিয়াছিল, সেই রাজার পূর্ব্বেই মহারাণী এলিজাবেথ। আমাদের দেশে তাঁহাদের কি? এলিজাবেথের সময় দিল্লীর সিংহাসনে আকবরের প্রিয়পুত্র জাঁহাগীর। এলিজাবেথের উত্তরাধিকারীর সময়ে আমাদের দেশে সাহজাঁহা আর ঔরঙ্গজেব। এই সময়ে কত কবি, কত স্মার্ত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, দেশে যদি ইতিহাস থাকিত, লোকে তাহা জানিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষ এখন ইতিহাসশূন্য, মিথ্যা জানিবার অনেক উপায় আছে, কিন্তু সত্য জানিবার কোন উপায় নাই।

লোকটা গেল কোথায়? চিঠি জাল করিয়াছে। জালিয়াতের দণ্ড হয় ত মোগলরাজ্যের শেষকালে গুরুতর ছিল না। লর্ড হেষ্টিংস,—সত্য কি মিথ্যা, এখনও আমরা তাহা জানি না,—মোগলরাজ্যের অনেক দিন পরে জালিয়াতী ছলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে মহামান্য ইলাইজা ইম্পির সহায়ে ব্রাহ্মণপুত্র নন্দকুমারের ফাঁসী দিয়াছিলেন! ইংরাজরাজ্যের বিচার আর ভারতীরাজ্যের বিচার, কখনই সমান হইতে পারে না।

বড় কথা। নন্দকুমারের ফাঁসী আর দশটাকার জাল, সমসূত্রে কে তুলনা করিতে পারে? তুলনা করিবার আবশ্যকও নাই। কিন্তু একটী অনাথা রমণী একটী সপ্তমবর্ষীয় শিশুপুত্র লইয়া জীবনসম্বলে বঞ্চিত হইল। এই মাত্র আক্ষেপ। আরও আক্ষেপ, আমরা জানিলাম না, কত ভেদ বড় জালে আর ছোট জালে। সত্য কি না, হেষ্টিংস জানিতেন, ইম্পি জানিতেন,

সেই জন্তই নন্দকুমারের ফাঁসী! কিন্তু তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বে পঞ্জাবে গোবিন্‌লাল সিঙের কুঠীতে ছোট জাল, তাহার দণ্ড কিছুই না। না ত আমরা বলিলাম, কিন্তু সে জালের,—সে সত্য জালের উচিত দণ্ড কোথায় আছে, মোগলেরাও জানিতেন না, সাহেবেরাও জানেন না।

আবার আমরা জিজ্ঞাসা করি, নূতন না পুরাতন? ঘরে বসিয়া একটী দুঃখিনী কাঁদিতেছে, কোলে বসিয়া একটী ছোট ছেলে কাঁদিতেছে; সান্ত্বনা করিবার লোক নাই। নাই থাকুক্, কিন্তু একজন সর্ব্বসান্ত্বনাদায়ক মহাপুরুষ মাথার উপর বিরাজ করেন। সমস্তই তিনি দর্শন করিতেছেন; তাঁহার কাছে বিচার আছে। তুমি যাইবে, আমি যাইব, দক্ষিণে বসিব, বামে বসিব, সে কথা বলি না। হিন্দিভাষার কথা সংস্কৃতভাষার সঙ্গে মিলাইব না; কিন্তু মিলাইব, বিচার আছে।

নবন্যাসে বড় কথা ছাড়িয়া দিতে হইল। লোকটা বঞ্চনা করিয়া গেল, স্ত্রীলোক কাঁদিতে লাগিল, একটী ছেলে ক্ষুধায় কাতর হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, ভারি কষ্ট। পাঠকমহাশয় হৃদয় ধারণ করেন, পাঠিকাঠাকুরাণী হৃদয় ধারন্ করেন, সকলের হৃদয় পবিত্র কি না, তাহা আমরা জানিব না, জানিবার প্রয়োজন হইবে না, জানি যদি, তথাপি বলিব না; কিন্তু কারা এরা? একজন জালকারী, নারীবঞ্চক, পুত্রবঞ্চক জালিয়াত! এ ব্যক্তি কে? পাঠকমহাশয় ইহার কি পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন? এ দুরাত্মা আর কেহই নহে, পরাস্বহারক, পরনারীচোর, বিশ্ববঞ্চক, দুরন্তদস্যু, রাজকুমার নামে পরিচিত, পাপাত্মা শশিকুমার। শশিকুমার কে?—আরও অনেক দূরে, আরও অনেক পরে তাহার সত্য পরিচয় আপনার কর্ণে প্রবেশ করিবে। ইতিহাসের মান্য রক্ষা করিয়া ঢাকিয়া ঢাকিয়া এখনও আমরা কহিলাম, সেই জালিয়াতের নাম রাজকুমার শশিকুমার। এই দুরাচার শশিকুমার মিহিরমোহিনীর নাম জাল করিয়াছিল। আর সেই অভাগিনী নায়িকা?—কে সেই দুশ্চারিণী? নামে নামে নানা ছলা দেখাইয়া যে পাপীয়সী একবার শশিকুমারের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় করিয়াছিল, দিল্লীনগরে বেজিয়া সাজিয়া কৌতুককুহকে যে পাপীয়সী শশিকুমারকে প্রতারণা করিয়াছিল, বিশ্ববঞ্চক বিতাসুর

কুহকমন্ত্রে বিমোহিত হইয়া যে দুশ্চারিণী একবার রাণী জগৎ-কুমারীনামে রাজা বিরাটকেতুর মহিষী হইয়াছিল, এই সেই পাপীয়সী রাক্ষসী মিহিরমোহিনী। যবনী যখন গর্ভিণী বলিয়া ছলনা করে, পাঠক-মহাশয় হয় ত তখন মনে করিয়াছিলেন, সত্যই ছলনা; কিন্তু তা ত নয়। সেই দুষ্টগর্ভের নূতন ফল এই সপ্তমবর্ষীয় কুমার। মিহিরমোহিনী কে, পূর্ব্বে তাহার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। জগৎকুমারী কে, ঐ নামের সঙ্গে মিলন হইয়াছে; এখন দুরবস্থা। রাজা বিরাটকেতু যাহাকে রাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রাণী এখন শশিকুমারের উপপত্নী। কিন্তু শশিকুমার কে, এখনও তিনি তাহা জানেন না। আমাদের অখ্যায়িকার যেরূপ সংকল্প, তাহাতে দুষ্টলোককে আমরা শীঘ্র মারিতে পারি না। মিহির-মোহিনী বাঁচিয়া থাকুক্, রাণী জগৎকুমারী বলিয়া যদি কখনও আবার পরিচয় দিতে পারে, লজ্জার মাথায় বজ্র ঘাত করিয়া সে পরিচয় দিতে পারুক, সে দিন যদি আসিতে পারে, সকলেরই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে! রাজাকে আমরা এ ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিব না। রাজা বিরাটকেতু উন্মত্তপ্রায় হইয়া মনে মনে আশা করিতেছেন, জগৎকুমারী রাণী হইয়া আসিবেন, অপ্সরাসুন্দরী কন্যা হইয়া আসিবেন, ভূপেশচন্দ্র গোলাম হইয়া আসিবে, শশিকুমার বন্ধু হইয়া মিলিবে, দিন নিকটবর্ত্তী।

এ আশার বড় মহিমা আছে। পাগল রাজা যাহা ভাবিতেছেন, হয় ত তাহা মিলিতে পারে, আমাদের কথায় মিলিবে না, আখ্যায়িকা তাহা মিলাইয়া দিবে না, আশা একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিবে, আমি চপলা!

সপ্তষষ্টিতম প্রবাহ।

নবীন জীবন।

"সুব্যক্তং রাজপুত্রি ত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রুহি কিং করবানি তে॥
সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানা পত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে॥
আহরামি তবাদ্যাহং নিষ্কদীন্যজিনানি চ।
সর্ব্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্য্যা মে ভব শোভনে॥"

শকুন্তলা।

পাখী যেমন উড়িয়া যায়, নবন্যাসের পাঠকপাঠিকাগণকেও তদ্রূপ উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে হয়। ভাবুন, কল্য প্রয়াগে ছিলাম, অদ্য পঞ্জাবে আসিয়াছি, আবার আগামী কল্য প্রয়াগধামে যাত্রা করিতে হইবে। সতীসাধ্বী অপ্সরাসুন্দরী একাকিনী ক্ষুদ্র কুটীরবাসিনী হইয়া অভাবনীয় শোকে অবিরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। যাহা বলিয়াছি, তাহাই। রজনী প্রভাত হইয়াছে। পঞ্জাব হইতে আমরা প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যেন স্বচক্ষে দেখিতেছি, ম্লানমুখী অপ্সরাসুন্দরী অধোমুখে নেত্রনীরে ভাসিতেছেন। নিরন্তর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কমলনয়ন-দুটী রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়াছে। যে জন্য বিলাপ, যে জন্য রোদন, তাহা পরিস্ফুটরূপেই পাঠকমহাশয়ের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অভাগিনী অপ্সরা,—আহা! রাজাধিরাজ মহারাজের কন্যা হইয়াও অভাগিনী,—অভাগিনী অপ্সরা নিশ্চয়ই মনে করিয়াছেন, কুচক্রী পাপ-চক্রী লোকেরা পাপচক্র বিস্তার করিয়া ভূপেশচন্দ্রের জীবন হরণ করিয়াছে। সংসারে যে একটীমাত্র আশ্রয়তরু বিদ্যমান ছিল, ষড়যন্ত্রঝড়ে সেই

আশ্রয়তরু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। স্বর্ণময়ী লতা এখন নিরাশ্রয় হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে। পাঠকমহাশয়! কবিবাক্য স্মরণ করুন, "ধূর্ত্তের চাতুরী বড়।" স্বার্থপর ধূর্ত্তলোকে যে কি করিতে না পারে, তাহাদের অসাধ্য যে কি কার্য্য আছে, কি যে পাপকর্ম্ম তাহারা অসম্পাদিত রাখে, তুচ্ছ মানব দূরে থাকুক্, দেবতারাও তাহা জানেন না। অনেক পাপ একত্র হইয়া একটা ধূর্ত্তজীব সৃজন করে। জীবসংসারে সেই জীব সমস্ত জীবলোকের অমঙ্গল সাধন করিয়া বেড়ায়। জন্মাবধি যিনি কখনও কাহারও বিন্দুমাত্র অপকার করেন নাই, অপকার নামে অভিধানে যে একটা শব্দ আছে, কল্পনাপথেও তাহা যিনি আনেন না, সে শব্দের অস্তিত্বও যিনি জানেন না, সেই নিরীহ নিষ্কলঙ্ক ভূপেশচন্দ্রের ভাগ্যসাগরে যে, কতবার কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর তুফান হইয়া গেল, দূর হইতে সকলেই তাহা দেখিলেন। সমুদ্রের সামান্য তুফানে কত তরণী ডুবিয়া যায়, নদনদীর সামান্য সামান্য তরঙ্গে কত শত নৌকা যে জলমগ্ন হয়, গণকেরা তাহা গণনা করিতে পারে না। কিন্তু দেখুন, অটল পর্ব্বতের মত ভূপেশ-পর্ব্বত সেই সকল তুফান, সেই সকল তরঙ্গ, অম্লানবদনে অক্লান্ত-হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। পুরাণের কথায় যাঁহারা অবিশ্বাস না করেন, তাঁহারা মনে করিবেন, মৈনাকপর্ব্বত যেমন জলে আছে, আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক ভূপেশচন্দ্রও তদ্রূপ শান্তিজলে, অচল, অটল, শান্ত। ধৈর্য্যসলিলে ধৈর্য্যশীল, প্রবোধসাগরে প্রশান্ত শৈল। ইহার মধ্যেও একটা কথা আছে। আগ্নেয়পর্ব্বত সর্ব্বদাই প্রায় শীতলভাবে দণ্ডায়মান থাকে। সর্ব্বাঙ্গ বরফে ঢাকা। বহির্ভাগ দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারে না যে, তাহার ভিতর আগুন আছে, তাহার ভিতর আগুন জ্বলে। সময়ে এই রাজধানীর সহরতলীর একজন রাজা পৃথিবী হইতে বিদায় হইবার কিছু পূর্ব্বে আপনার মুখেই কহিয়াছিলেন, আমি যেন তুষারাবৃত আগ্নেয়গিরি। সেই রাজা আর আমাদের এই রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র ঠিক্ যেন বোধ হয় এক ধাতুতে বিনির্ম্মিত। তাঁহার উপরেই এত-দূর অত্যাচার হইয়াছে। দিন দিন অপ্সরাসুন্দরী তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। এখন তিনি জানিতেছেন, সেই ভূপেশচন্দ্র বাঁচিয়া নাই। এ মর্ম্মান্তিক

বেদনা যে, চৈত্রমাসের বজ্রাঘাত অপেক্ষা ছোট, কথনই আমি তাহা বলিতে পারিব না। অপ্সরা কাঁদিতেছেন। কেঁদো না সতি! এ কথা বলিয়া প্রবোধ দিবার হেতু আছে, তথাপি প্রবোধ দিতে পারিব না। এ রোদন অমূলক নহে, এ অশ্রু নিষ্কারণ নহে, এ হতাশ অস্বাভাবিক নহে; কাঁদিতে দিতে হয়। না কাঁদিলে এমন শোকের শান্তি হয় না। অপ্সরাসুন্দরী কাঁদিতেছেন, কাঁদুন, শোকের লাঘব করিতে পারেন, করুন, হৃদয়ের ভার লঘু করিতে পারেন, পারুন, আমরা একটু অন্তরে যাই। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা শোকে দুঃখে বিহ্বলা হইয়া যেরূপে সুর করিয়া ক্রন্দন করে, তাহাতেও আমরা কাতর হই। শোকের কারণ থাকুক বা না থাকুক, অনেক মেয়ে কাঁদে।

দুঃখের সময় হাসির কথা। অনেক দিনের পরে অনেক দিনের পুরাতন এক রহস্য আমাদের মনে আসিল। তাঁতী জাতির এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিত্য নিত্য প্রতিবাসিনী নারীগণের সহিত কোন্দল করিত। তাহার তিন পুত্র ছিল। তিনজনেই মরিয়াছে। কোঁদলের সময় সে শোক তাহার মনে পড়ে না, মনে আসে না, মনে থাকে না। একটা মুখরা রমণী তাহাকে বলিয়াছিল, "মাগি তুই করিস্ কি? জলজ্যান্ত তিনটে ছেলে ধড়্‌ফড়্ কোরে মরে গেল, একদিনের জন্যে তোর চক্ষে এক ফোঁটা জল পোড়্‌লো না? পুত্রশোকে কাঁদিস্ না?"

"কাঁদি না? আমি কাঁদিনা? চক্ষুখাকি! বালামুখি! সর্ব্বনাশি! ভালর মাথা খা! চখের মাথা খা! কাণের মাথা খা! আমি কাঁদি না? সেই যে সেই, আরবছর রথের সময় প্যায়বাতলায় বোসে কেঁদেছিনু। সেই যে সেই, সে বছর কালীপূজোর সময় জলের ঘাটে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেটার জন্যে কত চীৎকার কোরে কেঁদেছিনু। তখন বুঝি চোখের মাথা খেয়েছিলি? কাণের মাথা খেয়েছিলি? আমি কাঁদি না?"

রহস্য পরিত্যাগ করা ভাল। ঐ রকমের ক্রন্দন অপেক্ষা ক্রন্দনের কথা না থাকাই ভাল। কিন্তু আমাদের অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী। এই অভাগিনীর ক্রন্দন সে রকমের নয়। মর্ম্মে ইঁহার আঘাত আছে। ক্রন্দনের হেতু আছে। চক্ষে কেন যে জল আসিতে পারে, বক্ষঃস্থল তাহা

জানাইয়া দেয়। সে স্থলে রাক্ষসীমায়া খাটে না। সে মায়া খাটাইবার চেষ্টা করিলেও টেঁকে না।

অপ্সরা কাঁদিতেছেন। রাত্রি হইয়াছে। কত রাত্রি, অপ্সরা তাহা জানেন না। পাখীরা জানাইয়া দিতে পারে। ঝিঁঝি পোকারা জানাইয়া দিতে পারে, নক্ষত্রেরা জানাইয়া দিতে পারে। গগনে যদি গগনচন্দ্র থাকেন, তিনিও জানাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু রাত্রি কত?

কোন দিক হইতে উত্তর আসিল না। ঝিল্লিকুল যেন প্রকৃতিসতীর রসনার প্রতিনিধি হইয়া ঝিঁঝিঁরবে জগৎ মাতাইল। সর্ব্বরী নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধ আমরা কখনও দেখি নাই। হয় ত দেখিয়া থাকিব, কিন্তু কবি যাহাকে নিশীথসময় বলেন, সে সময়ে আমরা ঘুমাইয়া থাকি। তত-রাত্রে আমাদের মন চরাচরে চরিয়া বেড়ায় না। সেই জন্যই বোধ হয়-আমরা রাত্রি দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে। অন্ধ-কার কি জ্যোৎস্না, জানা যায় না। চন্দ্র আছেন, কি চন্দ্রহারা নক্ষত্রেরা আছে, ঘরের ভিতর হইতে তাহা দেখা যায় না; কিন্তু রাত্রি দুই প্রহর। অপ্সরাসুন্দরী কাঁদিতেছেন।

সর্ব্বশরীর রক্তবস্ত্রে ঢাকা, মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, কটিবন্ধে রক্ত-বর্ণ কোষবদ্ধ সুদীর্ঘ তরবারি; এক বীরপুরুষ প্রবেশ করিলেন। মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া অপ্সরাসুন্দরী মূর্চ্ছা গেলেন। এ কে? জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ কে? উত্তর একটু চাপা থাকিলে ভাল হয়। যাঁহার গৃহ, তিনি জ্ঞানহীন। চক্ষে চক্ষে পরিচয় হইলে যদি চেনা হয়, আদর করিব। অচেনা হইলে দূরে খেদাইব। কিন্তু হায়! মূর্চ্ছাগতা অপ্সরাসুন্দরীর চৈতন্য হইল না। মরিয়া গেল কি? কিন্তু না ত। মরিয়া যাইবার কোন প্রকৃত কারণ নাই। চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। দেখিল, বীরমূর্ত্তি। আর কেহ দেখিলে হয় ত ভয় পাইত, অপ্সরাও অগ্রে ভয় পাইয়াছিলেন, শেষে জাগিয়া দেখিলেন, প্রিয়মূর্ত্তি। চক্ষের নিকটে রক্তবাস-সজ্জিত রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।

দুঃখ আছে, শোক আছে, সুখ আছে, অমর্ষ আছে, হর্ষ আছে, কিন্তু কাহার জন্য কাহার কি, উভয়েই তাহা জানিলেন না। মুখে কথা কহিবার

ইচ্ছা হইল, কথা ফুটিল না। চক্ষে চক্ষে কথা কহিবার ইচ্ছা হইল, চারি চক্ষু বুজিয়া গেল। কর্ণে কর্ণে কথা কহিবার বাসনা, চারি কর্ণ বধির। এই এক আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল। অপ্সরার অঙ্গ কাঁপিতেছে। যিনি নাই, তিনি সম্মুখে! স্ত্রীলোকে ইহা দেখিয়া কেন যে ভয় পাইবে না, সেক্সপিয়রের হাম্‌লেট তাহার উত্তর দিবে। অপ্সরা দেখিতেছেন, সম্মুখে এক মূর্ত্তি। মূর্ত্তিতে ভূপেশচন্দ্রের ছায়া। ভয়ে আকুল হইয়া অপ্সরা চীৎকার করিতেছেন, ভূত! চতুর্দ্দিকের বাতাস প্রতিধ্বনি করিতেছে, ভূত!—ভূত কোথায় বিচরণ করে? বিংশতি হস্ত তফাতে গিয়া অসি হস্তে অপ্সরাসুন্দরী বিরাটস্বরে কহিলেন, "এখনও কি মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? রাক্ষস হও, নাগ হও, নিকটে আসিও না। যে কেন হও না, এই অপ্সরাসুন্দরী এই মুহূর্ত্তে তোমারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। দেখিতেছ, খরশাণ অসি! দেখিতেছ, চক্ষে অগ্নি জ্বলিতেছে, দেখিতেছ, চুল খসিয়া পড়িতেছে, দেখিতেছ, হস্তের কঙ্কন ঝন্‌ঝন্‌শব্দে নৃত্য করিতেছে, দেখ দেখি, এত যে কাতরা অপ্‌সরা, তথাপি—তথাপি বামাপদাঘাতে তোমাদের মস্তক চূর্ণ করিতে পারি। দেখ! দেখ! এই বামহস্তে অসি। সাহস থাকে, অগ্রসর হও। ছলনা করিতে আসিয়া থাক, ছলনা ছাড়িয়া দাও। আমার দক্ষিণ হস্ত এখনও কাঁপিতেছে। ঘোর মেঘে যদি অনন্ত আকাশ আছন্ন হয়, রাহুগ্রাসে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যদি অন্ধকারে লুকাইয়া যান, তথাপি অপ্সরাসুন্দরীর,—তাহাই ত সত্য! ভূপেশচন্দ্র ছাড়া অপ্সরাসুন্দরী থাকিবে না। কোথায়? কোথায়? রক্ত!—আত্মা! তুমি কোথায়? ছলনা! ছলনা! না,—না,—ছলনা ত না! কে তুমি? ভূপেশচন্দ্রের আত্মা! উঃ! কহিতে যে কলেবর শিহরিয়া উঠে। আমি এ কি দেখিতেছি? প্রাণাধিক ভূপেশচন্দ্রের প্রতিমা! এ কি চমৎকার ইন্দ্রজাল! মহামায়া আমার চক্ষের সমীপে কতই অভাবনীয় অচিন্তনীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপর্ব্ব অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেছেন!"

পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা। শশব্যস্তে ভূপেশচন্দ্র বারিপাত্র গ্রহণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত মস্তকে বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অস্পন্দ নয়নে, অস্পন্দ বদনে বারি প্রক্ষেপ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চৈতন্য হইল না। কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উদ্বেগপূর্ণ কাতরবচনে সময়োচিত উচ্চকণ্ঠে ভূপেশচন্দ্র

কহিতে লাগিলেন, "অপ্সরা! প্রাণাধিকা! চাহিয়া দেখ! আমি আসিয়াছি, আমি তোমার ভূপেশচন্দ্র। আমি বাঁচিয়া আছি, দুষ্টলোকের দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। একবার নেত্র উন্মীলন কর, একবার চাহিয়া দেখ, আমি পাগলের মত তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জগৎসংসার শূন্য দেখিতেছি। চাহিয়া দেখ, তোমার এই পদ্মমুখখানি মলিন দেখিয়া আমার হৃদয় যেন বজ্রাহত হইতেছে। একটী কথা কও। একবার ঐ চন্দ্রবদনে ভূপেশ বলিয়া ডাক। জীবনপ্রতিমা! দুষ্ট লোকের দুষ্টচক্রে যে প্রাণ বাহির হয় নাই, তোমাকে অচেতন দেখিয়া সেই প্রাণ এখন বাহির হয়। অমৃতভাষিণি! একটী অমৃতবাক্য উচ্চারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্রকে অমর কর। জীবনসর্ব্বস্ব! আমার নিমিত্ত তোমাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। শান্তিময়ি! সে সকল অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আমাকে তুমি ভুলিতে পার নাই। আজ কেন ভুলিতেছ প্রাণাধিকে? তরঙ্গাকুল বিপদসাগর হইতে আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি নাই, সেই অভিমানে কি আমার কথার উত্তর দিতেছ না? সেই অভিমানে কি আমার মুখ দেখিতে চাহিতেছ না? সেই অভিমানেই কি তোমার এই নলিন নয়ন মুদিত হইয়া রহিয়াছে? সেই অভিমানেই কি ঐ নলিন আনন মলিন হইয়া গিয়াছে? প্রাণময়ি! কথা কও, চাও, দেখ, আমি নিকটে। আমি ভূপেশচন্দ্র।"

পুনঃপুন জলসেকে অপ্সরাসুন্দরীর চৈতন্য উদয় হইল। ধীরে ধীরে নেত্রবিকাস করিয়া ভূপেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। ঠিক যেন প্রস্তর-মৃত্তিকাগঠিত চিত্র করা প্রতিমা। অবয়ব আছে, মুখ আছে, চক্ষু আছে, কিন্তু বাক্য নাই। প্রতিমা হইতে প্রভেদ করিবার একটী মাত্র লক্ষণ অনুভূত হয়। নাসিকায় নিশ্বাস আছে। নেত্রবিকাস দর্শনে ভূপেশচন্দ্রের প্রাণে যেন একটী নূতন আলো প্রবেশ করিল। নবীন আনন্দে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আনন্দে কহিলেন, "অপ্সরাসুন্দরি! ভূপেশচন্দ্রের জীবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধীশ্বরি। এমন করিতেছ কেন? আমাকে কি তুমি চিনিতে পারিতেছ না? বহু কষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি, কিন্তু এমন কষ্ট এ জীবনে আর কখনও আমাকে আঘাত করিতে পারে নাই। তুমি

চাহিয়া দেখিতেছি, আমার হৃদয়াকাশে যেন এককালে শত শত সূর্য্য, শত শত চন্দ্রের উদয় হইতেছে। জীবিতেশ্বরি! এতক্ষণ যে কি ঘোর অন্ধকার মেঘে এই আকাশ ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়। আকাশ পরিষ্কার, এখন আমি বৃষ্টি চাহিতেছি। বাক্যসুধা বৃষ্টি কর, মনপ্রাণ সুশীতল করি।"—সানন্দ সমুৎসুকভাবে এই সকল কথা বলিতে বলিতে যুগল হস্তে অপ্সরার যুগল কোমল বাহুলতা ধারণ করিয়া ভূতল হইতে তুলিয়া বসাইলেন। মুক্তকেশ পৃষ্ঠদেশে দুলিতে লাগিল। অবলম্বন পাইয়া সেই নবীন নিরাশ্রয় দেহ যেন নবীন জীবন প্রাপ্ত হইল। অপ্সরাসুন্দরী পূর্ণবিকসিত পদ্মনয়নে ভূপেশচন্দ্রের বিশ্রান্ত নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া ধীর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "ভূপেশ! প্রাণাধিক! হৃদয়ের একরত্ন! তুমি আমি—"

কথা সমাপ্ত হইল না। অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যে মৃদুসম্ভাষণ করিয়াই পদ্মমুখীর পদ্মরসনা আবার নীরব হইল। গ্রীবাদেশ বামদিকে হেলিয়া পড়িল। যত্নে ধারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "হ্যাঁ সুরবালা! আমি আসিয়াছি। নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"আমিও।"—পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে অপ্সরা কহিলেন, "আমিও। মনে ছিল না, এই চন্দ্রমুখ আবার দেখিব। মনে ছিল না, এই রূপশশী আমার হৃদয়াকাশে আবার উঠিবে। মানসাকাশে ছিলে, কিন্তু হৃদয়াকাশে আসিবে, সে আশা যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল। জীবনধন! আমার ত ভ্রান্তি হইতেছে না? কেহ ত প্রতারণা করিতেছে না? মায়া ত মায়া দেখাইতেছে না? ভূপেশ! সত্যই কি তুমি আসিয়াছ? নির্দ্দয় রাক্ষসেরা সত্যই কি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে?"

"না,—তাহারা ছাড়িয়া দেয় নাই, ধর্ম্মই আমারে রক্ষা করিয়াছেন। জন্মাবধি কখনও আমি অধর্ম্মাচরণ করি নাই, লোকে আমার অমঙ্গলচেষ্টা করিয়া কালের ধর্ম্মে অনেকবার কৃতকার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু এই জীবন-ধারিণী ধরণীদেবী কতকাল আর অধর্ম্মের ভার বহন করিবেন?"

"আমিও ত সেই কথা বলি। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। এই কথা লইয়াই ত চিরকালের সংসার। তবে কেন যে এত দিন রক্ষা করেন

নাই, কেন যে, এত দিন অধর্ম্মের জয় হইয়া আসিতেছিল, কেন যে, ধর্ম্ম ম্রিয়মাণ, ইহাই ভাবি ;—ইহাই আশ্চর্য্য !"

"আশ্চর্য্য কিছুই না রাজবালা ! পৃথিবী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মৃত্তিকা আছে, পাষাণ আছে, নদনদী আছে, খনি আছে, কিন্তু মৃত্তিকার সঙ্গে মনুষ্যসংসারের অনেক নিকট সম্পর্ক। মৃত্তিকাই শস্যপ্রসবিণী, সেই শস্যই পৃথিবীর লোকের জীবন। এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি, অপর সাধারণ সকল লোকেই জানে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেবি ! বীজ ভিন্ন পৃথিবী কি শস্য উৎপাদন করিতে পারেন ? বীজ বড় কি পৃথিবী বড়, এই কথা লইয়া নৈয়ায়িকদিগেব তর্ক হয়। নীমাংসা দুই সমান। একের অভাবে অপরের কার্য্য হয় না। তেমনি আমি আর তাহারা। আমি ধর্ম্মপথে আছি, সেটা যেন মনে কর বীজস্বরূপ। কোথায় বিনিক্ষিপ্ত হইলে অঙ্কুরিত হইয়া শস্যপ্রসূ অথবা ফলপ্রসূ হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না ; যখন সমস্ত যোগাযোগ যথাযথরূপে একত্র হইল, তখনই ফল ফলিয়া গেল। অগ্নিতে ধূম থাকে, ইহা সকলেই জানে ; কিন্তু ধূমে জল আছে, অজ্ঞ লোকে ইহা জানে না। অপ্সরা ! আমি অগ্নি। আমাতে ধূম ছিল, সেই ধূমে জল ছিল। সময় না আসিলে বৃষ্টি আসিবে কেন ? বিন্দু বিন্দু করিয়া অনেক ধূম আকাশে উঠিয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ ঠিক সময়ে ধরাতলকে বারিসিক্ত করে।"

ভূতল হইতে শয্যায় বসিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশ ! আমিও বারিসিক্ত হইয়াছি। তুমি আমারে যেরূপে এই প্রকৃতির কথা বুঝাইয়া দিলে, এমন স্পষ্ট করিয়া কেহই বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। ভূপেশ ! আমার বড় ভয় হইয়াছিল, একটু পূর্ব্বে জীবনে আমার বিড়ম্বনা জ্ঞান হইয়াছিল, তোমারে দেখিয়া ভয়ে আমি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, তোমার আসিতে আর যদি দণ্ডমাত্র বিলম্ব হইল, তাহা হইলে ভূপেশ ! আঃ ! প্রাণের ভূপেশচন্দ্র ! তাহা হইলে আমি আর এ জন্মে এ চক্ষে তোমার চাঁদমুখ দেখিতাম না। তুমিও প্রাণাধিক ! তুমিও আর এই অপ্সরাকে পৃথিবীতে দেখিতে পাইতে না। শুনিয়াছিলাম, বিপক্ষকবল হইতে তুমি নিস্তার পাইয়াছ, সেই কুলাঙ্গারের পিতা রঘুবর রাও আর আমাদের এক

অজ্ঞাত বন্ধু হরবিলাস বাবু আমারে সান্ত্বনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখেই শুনিয়াছি, তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু জীবনের জীবন! তোমার জীবন যে অপ্সরার কত আরাধনার, কত আনন্দের, কত যত্নের বস্তু, অপ্সরা ছাড়া তাহা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। তথাপি,—তথাপি ভূপেশ! তাঁহাদের কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভূপেশ! আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছা কর? সেই ঘৃণিত নরব্যাঘ্র রঘুবর রাও আমারে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে চায়। অপ্সরার যদি চরণ না থাকিত, অপ্সরার চরণ যদি আঘাত করিতে না জানিত, তাহা হইলে সেই পাপাত্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত কি না, জানি না। পরমভাগ্য তাহার, গ্রহ সুপ্রসন্ন তাহার, দেবপ্রেরিত দেবদূত হরবিলাস বাবু তাহার সঙ্গে ছিলেন। কে তিনি জান? সেই তোমার অকপটবন্ধু মহারাষ্ট্রীর সওদাগর। নীচাশয় কুকুর বিতাস্থর কৌশলজালে যখন তুমি ধরা পড়, পাপিষ্ঠেরা যখন তোমারে বন্দী করিয়া গাড়ীতে তোলা, নিজের অর্থব্যয় করিয়া আমি সেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তোমার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। সেই মহাবিপদসময়ে যে সওদাগর বহুমুদ্রার হুণ্ডিযুক্ত একটী কাগজের মোড়ক আমার হস্তে দিয়া যান, তিনিই সেই। ঠিক পরিচয় পাই নাই, কিন্তু এখন জানিয়াছি, তিনিই হরবিলাস বাবু।”

একটু যেন চমকিত হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “দেবি! নরলোকে তোমার আবির্ভাব কেন? জানিতাম, তুমি বিরাটকেতুর কন্যা। জানিয়াছি, তুমি মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা। কিন্তু ইহার কিছুই ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার মন চায় না। মন যেন ধাক্কা মারিয়া আমারে বলিয়া দেয়, তুমি সুরপুরের সুরবালা। পৃথিবীতে যে নামে তুমি আছ, সে নামটীও বোধ করি ঠিক্ নয়। অপ্সরাসুন্দরী না হইয়া সুরসুন্দরী হইলেই ঠিক হয়। আমি জানিতেছি, তুমি দেবকন্যা। তুমি কি হরবিলাস বাবুকে জান?”

“জানিব না? বল কি ভূপেশ!—সংসারে বন্ধু আমি অনেক দেখিয়াছি। সময়ের বন্ধু অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অসময়ের বন্ধু, যাঁহারা বিপদের বন্ধু, তাঁহারাই নরলোকের দেবতাস্বরূপ। হরবিলাসকে জানিব

না? এমন কথাও তুমি বল ভূপেশ? জন্মে ভুলিব না। তুমি জান, কৃতজ্ঞতা আমার অলঙ্কার। যত দিন বাঁচিব, কৃতজ্ঞতা ভুলিব না।"

"কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ভুলিতে পার না, ইহা আমি জানি, হরবিলাস আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, ইহাও আমি জানি, তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে, ইহাও জানি; কিন্তু যদি আমি তোমাকে আর একটী কিছু নূতন পরিচয় দিই, তাহা হইলে—"

"নূতন?—আর নূতন কি আছে ভূপেশ। তোমাকে পাইয়া আমি নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহা অপেক্ষা নূতন আর কি আছে ভূপেশ?"

"তোমার পক্ষে না, হরবিলাসের।"

"বন্ধুর পরিচয়ে কি আর কিছু নূতন আছে? মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রীর পক্ষে স্বামী, পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, এই সকল ত স্বাভাবিক বন্ধু, ফুলে যেমন মালা গাঁথা হয়, সেইরূপ এই সকল সম্বন্ধ বন্ধুত্বসূত্রে গাঁথা। ইহা ছাড়া বিপদসময়ের উপকারী বন্ধু যে কি অমূল্য বস্তু, তাহা—"

দ্বারে আঘাত হইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া ভূপেশচন্দ্র তাহা পুনঃপুন শ্রবণ করিলেন। মৃদু মৃদু আঘাত। কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে আইসে নাই। এইরূপ স্থির করিয়া ভূপেশচন্দ্র দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনটী ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অপ্সরাসুন্দরী লজ্জা-বিনম্রবদনে তথা হইতে উঠিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। ভূপেশচন্দ্র যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনে প্রবেশকারীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাই-লেন। তাঁহারা কে? এ পরিচয় জানিবার নিমিত্ত পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিতে পারে, কিন্তু সে কৌতূহল আমরা দুই কথায় পূর্ণ করিয়া দিতে পারি। রাজা রঘুবর রাও, রাজা সদানন্দ রাও, আর রাজকুমার হরবিলাস। ইহাঁরা কি অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিয়াছেন, একটু পরেই এই ক্ষেত্রেই তাহা প্রকাশ পাইবে। ভূপেশচন্দ্র তিন জনকেই জানেন। কাহার সহিত কি সম্পর্ক, অল্প অন্ধকারে অল্প আলোতে সম্প্রতি তাহার আভাস পাইয়াছেন। কথোপকথন কিরূপ হয়, শুনিবার আগ্রহে অপ্সরা-সুন্দরী পার্শ্বগৃহের দরজার পার্শ্বে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহে চারিজনই উপবিষ্ট। সর্ব্ব প্রথমে হরবিলাস কহিলেন, "রাজকুমার!

পূর্ব্বে তুমি আমারে যে পরিচয়ে, যে নামে জানিতে, তাহা যে সত্য নহে, ইহা আমি একপ্রকার বুঝাইয়া দিয়াছি। এই মহারাজ মহানন্দ রাও আমাদের উভয়েরই পিতা। মাননীয় রাজা রঘুবর রাও বাহাদুর তোমার মাতুল, সম্পর্কে আমারও মাতুল; আমি তোমার ভ্রাতা। সঙ্কটসময়ে যত কথা শুনা হয়, যত কথা বলা হয়, শুভসময়ে তৎসমস্ত স্মরণ না থাকিতে পারে, সেই কারণেই আমার এই নূতন ভূমিকা। এখন তোমাদের পরস্পর যাহা কথাবার্ত্তা থাকে, অসঙ্কোচে ব্যক্ত কর।”

ভূপেশচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা মহানন্দের চরণে প্রণিপাত করিলেন। রাজাও সস্নেহে মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন; নেত্রদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইল। আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, “ভূপেশচন্দ্র! বৎস! আমি এতদিন অন্ধকারে ছিলাম, তোমাকে চিনিতে পারিতাম না; মুখ দেখিয়া দয়া হইত; কিন্তু কি জাতি, কাহার সন্তান, তাহা জানিতাম না; কেহই আমাকে তাহা বলিয়াও দেয় নাই। সামান্য শ্রমজীবির কার্য্য করিয়া তুমি জীবিকা অর্জ্জন করিতে, তাহা দেখিয়া আমার ঘৃণা হইত, নিকটে ঘেঁসিতে দিতাম না। পাপের উপদেশে অকারণে যাহারা তোমার বৈরী হইয়া স্বতঃপরতঃ তোমার অমঙ্গলচেষ্টা করিত, আমি বরং তাহাদিগকে গোপনে গোপনে প্রশ্রয় দিতাম। বৎস! সে সকল কথা কি তোমার মনে আছে? এই রাজা রঘুবর রাও কত প্রকারে যে তোমার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ইনিও জানেন, আমিও জানি, তুমিও জান; কিন্তু প্রাণাধিক! আমরা উভয়েই অন্ধকারে খেলা করিয়াছি। তুমিও মর্ম্মবেদনা পাইয়া অন্ধকারে অন্ধকারে আমাদের উভয়কে পরমশত্রু জ্ঞান করিয়াছিলে। সংসারে ধর্ম্মই বলবান্। ধর্ম্মই তোমার আশ্রয়। শত্রুজ্ঞান করিয়াও তুমি আমাদের কোন অনিষ্ট কর নাই। ক্ষমতা সত্ত্বেও নিঃশব্দে দারুণ,—দারুণ,—নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়াছ। প্রাণাধিক! উঃ! স্মৃতিগার হইতে যে স্নেহমাখা কথা জনকজননীর মুখে উচ্চারিত হওয়া প্রকৃতিদেবীর উপদেশ, মহামায়া-ভ্রমে সে উপদেশ আমি ভুলিয়া ছিলাম। কোলে আয় ভূপেশ! পিতা বলিয়া সম্ভাষণ কর ভূপেশ! এত দিনের পরে আমি তোমারে প্রাণাধিক্ বলিয়া ডাকিতে পারিলাম। প্রাণাধিক! উঃ! কথা বলিতে প্রাণ যেন জুড়ায়।

একদিন আমি একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। সেই পত্রের উপর লেখা ছিল, রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র। রাণী তখন আমার নিকটে ছিলেন। আমার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছিল। রাণীও কাঁপিয়াছিলেন। জান তুমি, রাণী কে? গুহ্য,—গুহ্য,—গুহ্য রহস্য! আমি যে তোমাকে চিনিতাম না, তুমি যে, আমাকে চিনিতে না, তাহার প্রধান হেতু তুমিও না, আমিও না; অজ্ঞাতরূপে সমস্ত অনর্থের মূলীভূত তোমর গর্ভধারিণী জননী। তুমি যখন গর্ভে, ভূমিষ্ঠ হইবার যখন অনেক বিলম্ব, সেই সময় রাণী আমায় একখানি পত্র লেখেন। ভূপেশ! কাহাকে আমি রাণী বলিতেছি? জগতের লোকের অজ্ঞাতে আমাদের বিবাহ হইয়াছিল। এই রাজা রঘুবর বাহাদুরের সহোদরা ভগিনী সুশীলাকুমারী শ্রীমতী যশেশ্বরী দেবী আমার প্রথমা মহিষী, প্রধানা-মহিষী, পাটেশ্বরী রাণী বিরজাসুন্দরী তখন কোথায়? দেবী যশেশ্বরী তোমারে গর্ভে ধারণ করিয়া আমারে সাবধান করেন, যেন প্রকাশ না হয়, দেখাসাক্ষাৎ না হয়, সত্যব্রতে বন্দী আমি, সেই কারণেই,—শুদ্ধ সেই কারণেই অপ্রকাশ। তুমি যে বৎস! সেই রত্নগর্ভার রত্নগর্ভের মহারত্ন, তাহা আমি জানিতাম না; রাণী আমাকে জানিতে দেন নাই। যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষে,—কেবল ভারতবর্ষে কেন, এই পৃথিবীমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যাহারা তোমার একগাছি কেশমাত্র স্পর্শ করে। আমি প্রয়াগে রহিয়াছি, লোকে আমাকে সামান্য রাজা বলিয়া জানে, কিন্তু ভূপেশ! আমি গুজরাটরাজ্যের রাজ রাজেন্দ্র নরেন্দ্র। এখানে কেহই তাহা জানে না। আমার কাণে এক দিন এক কথা আসিয়াছিল, নিকুঞ্জকাননে কালিন্দীকূলে ইন্দুভূষণনামে এক গুজরাটী রাজকুমার আসিয়াছেন। ভূপেশ! সেই বার্ত্তা শ্রবণে আমার বক্ষঃস্থলে যে, কত বজ্রের আঘাত হইয়াছিল, অনেক দিনের কথা,—এখন তাহা মনে করিতে আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত মহা উত্তপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হয়। স্নেহ একটী ছোট কথা। মায়া একটী ছোট মেয়ে; কিন্তু ভূপেশ! পরিচয় না থাকিলেও স্নেহমায়ার বন্ধন জগতের সর্ব্বজীব একত্র হইয়াও খুলিয়া দিতে পারে না। পুরাণে শুনিয়া থাকিবে, মহাশৈল ভেদ করিয়া মাতৃস্তনের দুগ্ধ সন্তানের মুখে পড়িয়াছিল।"

কত কি কথা মনে করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "পিতা! এই অভাগা সন্তানকে ক্ষমা কর। জন্মাবধি আমি মাতাপিতা জানিতাম না; কেন জন্ম হইয়াছিল, তাহাও জানিতাম না। সংসারে যন্ত্রণা সহ্য করিতে আসিয়াছি, নিরাশ্রয়ে বহু বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, এক দিনও ভাবি নাই যে, আমার মাতাপিতা জগতে বাঁচিয়া আছেন। মহারাজ! যাহার মাতাপিতা থাকে, তাহাকে কি কখনও দুষ্ট সর্প, দুষ্ট কুকুর দংশন করিতে পারে? থাক্ মহারাজ! সে সকল কথা থাক্, আমি পাপী হইয়াছি। কার্য্যে না দেখাইলে যে, পাপ হয় না, এ কথা অগ্রাহ্য। জানিলাম, রাজা রঘুবর রাও আমার মাতুল; কিন্তু মনে আমার পাপ ছিল। এক দিন রাজা রঘুবরের মুণ্ড লইয়া ভাঁটা খেলিব, এ সাধ আমার ছিল। স্বর্গভূষণের মুণ্ড আকাশে তুলিয়া লুফিয়া লুফিয়া ধরিব, এ সাধ আমার ছিল; কিন্তু আবার বলি, যাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে। ডাকাতের হাতে স্বর্গভূষণ কাটা পড়িয়াছে।"

"পড়িয়াছে? পড়িয়াছে? কথা কি সত্য? সত্য কি সেই স্বর্গভূষণ কাটা পড়িয়াছে? সত্য কি সেই পাপিষ্ঠ নারকী, সতীর সতীত্বচোর, দুরাত্মা স্বর্গভূষণ নরকে গিয়াছে? লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, বিশ্বাস হয় নাই, এখন কাহার মুখে শুনিতেছি? ভূপেশচন্দ্রের মুখে! আঃ! পরমেশ্বর! তুমিই সত্য! তুমিই সাক্ষী! যাহারা সতীর সতীত্ব চুরি করিতে উদ্যত, চিরকালে,—চিরযুগে,—চিরদিনে পদে পদে যেন তাহাদের এই দশা হয়।"—উন্মত্তভাবে এই সকল কথা বলিতে বলিতে মুক্তকেশী উন্মাদিনী অপ্সরাসুন্দরী সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত।

রাজা রঘুবর রাও অধোমুখ হইয়া দুই হস্তে নয়নাবরণপূর্ব্বক নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা মহানন্দ রাও ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভূপেশচন্দ্র তাঁহাদের উভয়ের মনের গতি বুঝিতে পারিয়া সময়োচিত সান্ত্বনাবাক্যে অপ্সরাসুন্দরীকে শান্ত করিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহাকে গৃহান্তরে প্রবেশ করিবার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যত্ন বিফল হইল। অপ্সরাসুন্দরী সে অনুরোধ শুনিলেন না। নারীজাতির পবিত্র প্রিয়ভূষণ লজ্জা। জ্ঞানেই হউক, অজ্ঞানেই হউক, ভ্রমেই হউক বা বিভ্রমেই হউক, তখন তিনি সেই লজ্জাকে হৃদয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া সেই গৃহমধ্যেই কিঞ্চিৎ দূরে

উপবেশন করিলেন। পিতৃচরণে পুনঃপুন প্রণিপাত করিয়া রাজা রঘুবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! অপ্সরাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যতদূর জানি, শপথ করিয়া বলিতে পারি, জন্মাবচ্ছিন্নে কোন বাক্যে, কোন কার্য্যে অপ্সরা কখনও কাহারও মনে ব্যথা দেন নাই; শত্রুর মনেও না। তবে কি না মহারাজ! পুরুষের প্রাণ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রাণে যন্ত্রণাশেল অনেকদূর পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইয়া থাকে। আপনার স্বর্গভূষণ কেবল আমাকেই যে অহরহ নিদারুণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবেন না। পবিত্রহৃদয়া দেবকন্যারূপিণী অপ্সরাসুন্দরীকেও অশেষ-বিশেষে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিয়াছেন। আমি ভুলিয়া যাইতে পারি, ভুলিয়াছিও অনেক, সহিয়াছিও অনেক, কিন্তু কোমলপ্রাণা অপ্সরা শীঘ্র ভুলিতে পারিতেছেন না। সেই কারণেই উন্মাদিনীর ন্যায় ঐরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। অবলা বলিয়া ক্ষমা কবিবেন।"

লাঙ্গূলে পদার্পণ করিলে ক্রুদ্ধ কালভুজঙ্গিনী ফণা ধরিয়া যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, দূর হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী সেইরূপ গর্জ্জনে ভূপেশচন্দ্রকে কহিলেন, "কি কহিতেছ তুমি ভূপেশচন্দ্র! ক্ষমা? অপ্সরাসুন্দরী কাহারও ক্ষমা প্রার্থনা করে না। মর্ম্মে মর্ম্মে আমার যে সহস্র সহস্র শক্তিশেল ফুটিয়া রহিয়াছে, জন্মে আমি সে বেদনা ভুলিব না। এই রাজা রঘুবর রাও সেই বেদনার মূলীভূত কারণ। যাহা তুমি বলিয়াছ, সত্য, কখনও আমি কাহারও মর্ম্মে বেদনা দিই নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া রাজা রঘুবরের অমার্জ্জনীয় অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিতে পারিব না। স্বর্গভূষণ দেখিল না, আমার প্রতাপ কতদূর। ডাকাতের হস্তে মরিল, এত শীঘ্র মরিল, এই বড় মনস্তাপ। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে প্রতিদিন আমি শত শত পদাঘাতে তাহার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত শিখাইয়া দিতাম। রাজা রঘুবর রাও আমারে ক্ষমা করিবেন কি, আমি ইহাঁরে শতসহস্রবার ক্ষমা করিয়াছি। ইহাঁর সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে লক্ষলক্ষবার ক্ষমা করিয়াছি, আমার হৃদয়ে ক্ষমা না থাকিলে ইহাঁরা দেখিতেন, উদয়পুরের বীরাঙ্গনা কতদূর বীরদর্প ধারণ করে। ইহাঁরা সকলেই জানেন, আমি ক্ষত্রিয়কুমারী। আমি বামহস্তে অসি ধারণ করিলে, মানুষ দূরের কথা, স্বয়ং

যমরাজও আমার নিকটে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করেন না। কাপুরুষ রঘুবর রাও, স্ত্রীজাতির অপমান করিয়া অপনার নীচত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়সন্তান, ইহাঁর শরীরে ক্ষত্রিয়শোণিত আছে, মুখে এ কথা উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা হয়।"

"শান্ত হও, অপ্সরা! শান্ত হও। রাজা এখন পুত্রশোকে কাতর। অগ্রে না জানিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এখন অনুতাপ করিতেছেন, এ সময় ইহাঁকে তিরস্কার করা ভাল হয় না। তুমি শান্ত হও। যখন ততদূর সহ্য করিয়াছি, তখন এ সময়ে মনের আগুন জ্বালিয়া একজন পরিতাপী সম্ভ্রান্ত লোককে আর কষ্ট দেওয়া উচিত হইতেছে না। তুমি সমস্তই বুঝিতে পার। তোমার সহিষ্ণুতা পৃথিবীর সহিষ্ণুতার সমান; তোমার ধৈর্য্যশীলতা পর্ব্বতের ধৈর্য্যশীলতার সমান; তোমার গাম্ভীর্য্য অগাধ প্রশান্ত জলধির গাম্ভীর্য্যের সমান। সচরাচর সাধারণ স্ত্রীজাতিতে এমন হয় না। তুমি যদি ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে ধৈর্য্যের নামে কলঙ্ক পড়ে। আমার বাক্য রাখ, শান্ত হও। মহারাজ মহানন্দ রাও আমার পিতা। এতদিন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি। এই পূজ্যপাদ পিতা সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহা মনে করিয়া ধৈর্য্যধারণ কর।"

মৃদুপ্রশান্তবচনে অপ্সরাকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ভূপেশচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "অপ্সরা! আমার পিতার চরণে প্রণাম কর। আমাদের পরম উপকারী বন্ধু, নূতন পরিচয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এই হরবিলাসকে আশীর্ব্বাদ কর। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে আমাদের উভয়েরই বাক্য ফুরাইয়াছিল, সেই হরবিলাস আজ আমাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র।"

একটী গ্রন্থির উপর আর একটী গ্রন্থি পড়িলে প্রথম গ্রন্থিটী শিথিল হইয়া যায়। ভূপেশচন্দ্রের প্রবোধবাক্যে অপ্সরাসুন্দরীর ক্রোধগ্রন্থি শিথিল হইয়া স্নেহভক্তিতে পরিণত হইল। রাজা মহানন্দ রাওকে প্রণাম করিয়া, কুমার হরবিলাসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, অপ্সরাসুন্দরী মৌন হইয়া বসিলেন। রাজা মহানন্দ রাওকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! অনেক কথার কথা। সংসারপথে আমি যেন সম্বন্ধসম্পর্কশূন্য হইয়া উদাসী সন্ন্যাসী ভিকারীর মত ভ্রমণ করিতেছিলাম। কাহারও নিকটে মুখ পাইতাম না।

কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিতে পারিতাম না। কেহ কেহ রাজকুমার বলিয়া ডাকিত, লজ্জা পাইতাম। মনে হইত যেন, বিদূষকেরা পরিহাস করিতেছে; কিন্তু পিতা! এতদিনে আমার মানসের অন্ধকার সুন্দর সূর্য্যালোকে দূরগত হইল। অজ্ঞাতে, অপরিচয়ে তুমি আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়াছিলে, দেখিলেই ঘৃণা প্রকাশ করিতে, আমি তাহা জানিতাম না। মনে করিতাম, দরিদ্র, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, এমন জীবন জীবসংসারে কখনই আদর পাইবার যোগ্য হয় না। সদাসর্ব্বদা অদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া মনে মনেই মনের দুঃখ গোপন করিয়া রাখিতাম। ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রিদল অনেকবার আমাকে অনেক বিপদে ফেলিয়া, অনেক যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে প্রাণবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। করুণাময়ের করুণায় আর এই হরবিলাসের কল্যাণে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। আমি যেন নবীন-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহ জগৎ হইতে দ্বিতীয় জগতে প্রস্থান করিয়া যেন পুনর্ব্বার নবীন জগতে প্রবেশ করিয়াছি। পিতা! মানুষের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। ঘুমন্ত লোকেরা যেমন নিদ্রাবস্থায় ভালমন্দ, উভয় প্রকার স্বপ্ন দেখে, কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও সাহস, কখনও ভয়, কখনও শান্তি, কখনও বিপদ, কখনও আনন্দ, কখনও শোক, কখনও উৎসব, কখনও নিরানন্দ, স্বপ্ন ইহা দেখায়; স্বপ্ন এইরূপ খেলায়; কিন্তু জাগ্রত জীব অবিকল সেই প্রকার বিসদৃশ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। না জানিয়া তুমি আমাকে ঘৃণা করিতে, না জানিয়া তুমি আমার বিপদে হাস্য করিতে, না জানিয়া তুমি আমাকে বিপদে ফেলিবার সহায়তা করিতে, আমার মানবসুলভ চঞ্চলচিত্ত এক একবার তোমার উপর রাগিয়া রাগিয়া উঠিত। পিতা! সেই অপরাধ আমার অজ্ঞানের। তাহার জন্য আমি স্নেহময় পিতার কাছে অপরাধী হইতে পারি না। ভক্তি আসিয়া ক্ষমা চাহে, স্নেহ আসিয়া ক্ষমা করে।"

রাজা মহানন্দ রাও মস্তক অবনত করিলেন। কত কি যেন অতীত ঘটনা সাগরতরঙ্গের ন্যায় তাঁহার হৃদয়সাগরে তরঙ্গ খেলাইতে লাগিল। মুখ তুলিয়া কথা কহিবেন, প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র বলিয়া আদর করিবেন, মনে মনে এই আশা হইতে লাগিল। আশা যেন কাছে কাছে আসিয়া স্নেহের

কথা শিখাইয়া দিতে লাগিল; কিন্তু রাজার রসনা তৎকালে আশার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিল না। মানুষ হাসে আর কাঁদে। আশা হাসায় আর কাঁদায়। হাসিকান্নায় যখন যুদ্ধ হয়, কুরুসভায় কপট পাশা-খেলার সময় অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেমন 'কিং জিতম্ কিং জিতম্' শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, শূন্য হইতে সেইরূপ প্রশ্ন আইসে, জয় হইল কি, জয় হইল কি? মানুষের অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গে শকুনি থাকে না। সূতপুত্র কর্ণ থাকেন না, মহামানী দুর্য্যোধন থাকেন না। সুতরাং ঠিক্ ঠিক্ উত্তর আসে না। হাস্যের জয় হইল, কি রোদনের জয় হইল, বুঝাইয়া দিবার লোক পাওয়া যায় না। রাজা মহানন্দ রাও মহা অপ্রতিভ হইলেন। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত নয়ন নিমীলন করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। আকাশ হইতে যেন দৈববাণী আসিল, "রাজা তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন? স্নেহ নীচগামী। রক্তে রক্তে স্নেহের সঞ্চার। সম্পর্কে সম্পর্কে স্নেহের সঞ্চার। নিঃসম্পর্কে ঘনিষ্ঠতায় ঘনিষ্ঠতায় স্নেহের সঞ্চার। এ রাজা কি কিছুই জানিতেন না? দৈববাণী জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা মহানন্দ রাও! পুত্রের মুখ দেখিয়া প্রকৃতিদত্ত স্নেহ কি স্মরণ করিতে পারেন নাই?" আশ্চর্য্য! অঞ্জনাবানরী ইহাঁর অপেক্ষা পুত্রস্নেহের উচ্চ পরিচয় দিয়া গিয়াছে।

কেহই সেই দৈববাণীর উত্তর দিতে পারিল না। রাজা রঘুবর রাও যেমন নতমুখে বসিয়া ছিলেন, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেইরূপ নতমুখে থাকিয়া অকস্মাৎ যেন স্বপ্নোত্থিত বিভ্রান্ত লোকের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার অনাবৃত ছিল, উন্মাদের মত সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

"কোথায় যাও? কোথায় যাও? মহারাজ! কোথায় যাও? দাড়াও! তোমাকে এক কথা কেহই বলিতে পারিবে না। আমি এখন পিতার সহিত কথা কহিতেছি। অপ্সরাসুন্দরী তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি ক্ষমা চাহিতেছি, তাহা তুমি মহারাজ, স্থির হইয়া উপবেশন কর। শত্রু হও, মিত্র হও, যাহাই হও, ভুপেশচন্দ্র তোমার চিরানুগত কিঙ্কর। ভুপেশচন্দ্র সশস্ত্র। তুমি রাজা, আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিলে, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, বার বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কিছুই আমার মনে নাই। সমস্তই আমি ভুলিয়া

গিয়াছি। তোমার স্বর্গভূষণ নাই, আমি সেই স্বর্গভূষণের স্থানে দাঁড়াইব। পৃথিবীতে অপর যদি কেহ তোমার শক্র থাকে, বল, দেখ, ভূপেশচন্দ্র সশস্ত্র। কাহার সাধ্য তোমার মস্তকের একগাছি কেশমাত্র স্পর্শ করে। মহারাজ! শঙ্কা পরিহার কর। পুত্রশোক অসহ্য শোক সত্য, কিন্তু তোমার পুত্র যাহা করিতে না পারিত, আমি তাহা করিতে পারি। ক্ষুন্ন হইও না রাজা! পূর্ব্বের কথা মনে করিও না, যতদূর সাধ্য, তুমি আমার শত্রুতাচরণ করিয়াছ। পরিচয় জানিতাম না, এখন জানিয়াছি, তুমি আমার মাতুল। ভূপেশচন্দ্র সশস্ত্র বিদ্যমান। এ সময়, এ ক্ষেত্রে যমকেও তুমি ভয় করিও না। পিতার সহিত আর একটীমাত্র আমার কথা আছে। পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্য এখন তোমার শরীরে যদি কিছুমাত্র না থাকে, নিশ্চিন্ত থাক, নিশ্চেষ্ট থাক। ভয়, চিন্তা, সংশয় দূরে পরিহার কর। প্রস্থান করিবার কারণ? এই অবলা অপ্সরাসুন্দরী ভয় পাইতেছে না। আমি ভূপেশচন্দ্র, কাহাকেও ভয়ের হেতু বলিয়া গ্রাহ্য করি না। তুমি রাজা! ক্ষত্রবীর্য্য ধারণ কর, যদি বাতাস দেখিয়া ভয় পাও, যদি ছায়া দেখিয়া কাঁপিয়া উঠ, পাও, কাঁপো, থাক। অপ্সরাকে আমি যেরূপে রক্ষা করিব,—মাতুল তুমি,—যদি দুর্য্যোধনের মাতুলের মত হও, তথাপি তোমারে রক্ষা করিব। থাক তুমি! পলায়ন করিও না। এই হরবিলাস আমার সহায় রহিলেন, পিতা মহারাজ মহানন্দ রাও স্বর্গের স্বাক্ষীর স্বরূপ সম্মুখে বিদ্যমান রহিলেন, যদি কেহ কোথা হইতে আসিয়া তোমার গাত্রে একটী মাত্র অঙ্গুলী স্পর্শ করে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

পূর্ব্ববৎ নতমস্তকে রাজা রঘুবর রাও আপনার আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। যে সর্পের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় না, সে সর্পকে বহুযত্নে, বহু সাবধানে হড়্পীর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; রাজা রঘুবরের বিষদন্ত ছিল, কোন সর্পবৈদ্য তাহা ভাঙ্গিয়া দেয় নাই। কিন্তু চমৎকার! কিন্তু আশ্চর্য্য! কিন্তু দৈবমহিমা! সে দন্ত এখন আর কাহাকেও দংশন করিতে পারে না। লজ্জায় অধোমুখ।

দ্বার অনাবৃত ছিল, ভূপেশচন্দ্র স্বয়ং অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন।
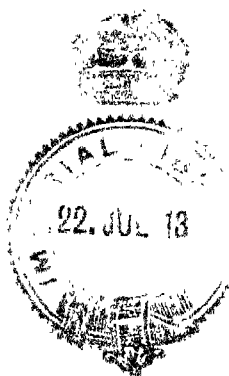
রাজা মহানন্দ রাও কহিলেন, "ভূপেশ! এখনও কি তুমি বৈরনির্য্যাতনের স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না? আপনার মুখেই বলিতেছ, অজ্ঞাত পরিচয়। আপনার মুখেই বলিতেছে, ক্ষমা। তবে আবার এ কি বৎস? দ্বারের অর্গল বন্ধ কেন?"

করপুটে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "পিতঃ! মহারাজ! আপনার পাদপদ্ম আমি পূজা করি। দেখিতেছেন, আমার এই মাতুল মহারাজ রঘুবর রাও উদ্ভ্রান্ত। এ গৃহের একটীমাত্র দ্বার তাঁহার পরিচিত। স্বর্ণভূষণের কথা পড়িলেই ইনি সেই দ্বারে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করেন। উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে বাধা দিয়া কতক্ষণ স্থির রাখিতে পারা যায় মহারাজ?"

"হাঁ। এখন বুঝিয়াছি। তুমি যে আমার পুত্ররূপে পরিচিত হইবে, ইহা যদি পূর্ব্বে আমি জানিতাম, তাহা হইলে সেই পাপচণ্ডাল লিঙ্গেশ্বরের মুণ্ড এই দুর্গে গড়াগড়ি যাইত।"

"আপনি কি লিঙ্গেশ্বরকে জানেন মহারাজ?"

বক্রবদনে হাস্য করিয়া রাজা মহানন্দ রাও কহিলেন, "এত জানি, তুমি ত জানই না,—এই প্রয়াগ, সেই গান্ধার, সেই পঞ্জাব, এমন কি, দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্তও তাহা জানে না। শত শত নরহত্যা, শতশত নারীহত্যা, ও শতশত পাপাচারী, ছদ্মবেশী যবন।"

"হাঁ মহারাজ। আমিও তাহাই জানি। কিন্তু এখনকার কথায় সে পাপাত্মার নাম আসিল কেন?"

"কেন? সেই পাপাত্মার নামে রঘুবর রাও কাঁপিতেছেন।"

"কেন মহারাজ? সে নামে রাজা রঘুবর রাও কাঁপিবেন কেন? রাজা ত তাহার পরমবন্ধু, রাজার উপদেশেই ত সেই লোক আমাকে নরকের পাবকের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই রাক্ষসের অনুগ্রহেই ত রাজকুমার স্বর্ণভূষণ দিল্লীর সেনাদলের ছোট কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাহার নামে ইনি কাঁপিবেন কেন?"

"কেন জান না? তালগাছ ঝড়ে পড়িয়া যায়। তালগাছে ডালপালা থাকে না, ভাল ভাল গাছের ডালপালা পড়ে, যাহার ডালপালা নাই, সে গাছ আপনি মূলশুদ্ধ পড়ে। রাজা রঘুবর এখন স্বর্ণভূষণকে হারাইয়াছেন।

সহায় গিয়াছে, অহঙ্কার গিয়াছে, দর্প গিয়াছে, সমস্তই গিয়াছে। এখন সেই দুরন্ত পাঠানকে অবশ্যই ভয় করিতে হয়।"

"আপনি মহারাজ ভুলিতেছেন। তখন যে দিন ছিল, এখন আর সে দিন নাই। তখন আমি অপরিচিত ছিলাম, অজ্ঞাত মাতুল আমার বিপক্ষ ছিলেন, এখন অন্ধকার ঘুচিয়াছে, অন্ধকার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সাদা সোজা কথায় আমি এখন মহিষের শৃঙ্গ।"

"তাহা ত জানি বৎস! তোমার পরাক্রম আমি ভাল জানি। তোমাকে জানিতাম না, কিন্তু তোমার বীর্য্যকে জানিতাম, তোমার ধৈর্য্যকে জানিতাম, গাম্ভীর্য্যকে জানিতাম। এখন ভূপেশ!—"

অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যে বাক্যে বাক্যাবরণ দিয়া দূর হইতে বীরাঙ্গনা কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! সাবধান হও, সাবধান হও! বাহিরে কাহাদের পদশব্দ হইতেছে।"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "ভয় কি, যতকিছু কৌশলজাল থাকে, বিস্তার হউক। এই ক্ষেত্রে শত শত, সহস্র সহস্র মুণ্ড রুধির বমন করিবে। সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের করাল গ্রাস হইতে যে ভূপেশচন্দ্র উদ্ধার হইয়া আসিয়াছে, সেই ভূপেশচন্দ্র জীবিত থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে, দুষ্ট মতলবে এই গৃহের চৌকাট পার হয়। কাহারও সাধ্য নাই যে, মস্তক লইয়া ফিরিয়া যায়। অপ্সরা! সুশীলে! শক্তিরূপিণী তুমি। যেখানে আছ, স্থির হইয়া বসিয়া থাক, গৃহমধ্যে রণবেশে অসি হস্তে আমি নৃত্য করিব। পিতঃ! মহারাজ! পুত্রশোকাতুর মহারাজ রঘুবরকে আপনি রক্ষা করুন। ভয়াতুরা রাজকুমারী অপ্সরাসুন্দরীকে আপনি শান্ত করুন, অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ন্যায় একাস্ত্রে আজ আমি বিশ্ব-বিজয় করিব। কিন্তু পিতঃ! রণবেশ ধারণের অগ্রে আমার বীরত্বসাহস যেন সন্দেহ-বাতাসে ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। একটী মাত্র প্রশ্ন। সওয়ার ডাকে আপনি পত্র পাইয়াছিলেন, শিরোনাম রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র। পিতঃ! সে পত্র কে লিখিয়াছিল?"

রাজা উত্তর করিতে পারিলেন না।

একটী দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই গৃহের উত্তরে দক্ষিণে চারিটী

দ্বার ; সকলগুলিই অর্গলমুক্ত। কোন্ দ্বারে কাহারা আসিয়াছে, প্রবেশ করিতেছে না, রাজা মহানন্দ রাও জানিতেছেন না, রঘুবর রাও জানিতেছেন না, ভূপেশচন্দ্র জানিতেছেন না, অপ্সরাসুন্দরী শুনিতেছেন, বাহিরে পদশব্দ। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ভূপেশচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পত্র কে লিখিয়াছিল ?"

"আমি লিখিয়াছিলাম।" ঝন্ ঝন্‌শব্দে উত্তর দিকের একটা দরজা খুলিয়া গেল। একটী মুক্তকেশী কামিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মুখে বাক্য, "আমি লিখিয়াছিলাম। আমারে চিনিতে পার ভূপেশ ?"

চরণে প্রণাম করিয়া ভূপেশচন্দ্র যেমন সেই এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে আর একটী চেহারার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সে চেহারা অর্দ্ধ পরিচিত, অর্দ্ধ অপরিচিত। কে কে চিনিলেন, কে কে চিনিলেন না, তাহা আমরা বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। লোকটী মাথা হেঁট করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এলোকেশী রমণী তখনও বলিতেছেন, "আমি লিখিয়াছি।"

কে সেই আমি, তাহা বুঝিয়া লওয়া সকলের সাধ্য ছিল না। যাঁহারা গৃহমধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিলেন, কেহ কেহ বুঝিলেন না। যিনি সঙ্গী, তিনি কেবল মৃদু মৃদু হাসিলেন, একটীও কথা কহিলেন না। মাথা তুলিয়া চাহিয়া রঘুবর রাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি! তুমি কেন এখানে ?"

"আমি কেন এখানে ? আমি নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূপেশচন্দ্রকে পাইয়াছি, রাজা মহানন্দ রাওকে দেখিয়াছি।"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "আমিও নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। জননীকে দেখিয়াছি, পিতা চিনিয়াছি, সমস্ত আপদবিপদ ভুলিয়া গিয়াছি।"

অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "আমিও নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি।"—গৃহমধ্যে বাতাস, সেই বাতাসে প্রতিধ্বনি হইল, আমরাও নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি।

পাঠকমহাশয় এখন বুঝিলেন, যে এলোকেশী প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি মহারাজ রঘুবর রাও বাহাদুরের সহোদরা ভগিনী, আমাদের প্রধান নায়ক শ্রীমান্ ভূপেশচন্দ্রের গর্ভধারিণী জননী শ্রীমতী যশেশ্বরী দেবী। কেন তিনি কহিলেন, সে পত্র আমি লিখিয়াছি, সেই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। পত্র বেনামী। পত্রে স্বাক্ষর ছিল না, রাজা বুঝিতে পারেন নাই, রাণী বিরজাসুন্দরী বুঝিতে পারিবেনই না ত, কিন্তু নির্ঘণ্ট দেখিয়া দুই জনেই অবাক হইয়াছিলেন। পত্রে কি লেখা ছিল, তখন প্রকাশ হয় নাই, এখন প্রকাশ হউক।

সব কথা আমার মনে নাই। ছাড়া ছাড়া এক একটী কথা মনে আছে। লেখা ছিল,—

"রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র! কোথাকার তুমি, কাহার তুমি, কাহার পুত্র তুমি, তাহা তুমি জান না। কোথায় আছ, কি করিতেছ, আমরাও জানি না। তোমার পিতা আমারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিতে বলিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্ম তিনি রাখিয়াছেন। নূতন বিবাহ * * * * * কিন্তু রাজকুমার! তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা তুমি নও। ডাকের কথা কাটিয়া ফেল। রাণী বিরজাসুন্দরী তোমার উপর হিংসা করিবে, দেখা দিও না। পরিচয় দিও না, যেমন আছ, তেমনি থাক। রাজকুমার! যিনি জগতের কল্যাণকর্ত্তা, তিনি তোমার কল্যাণ করুন।

* * * * * * * * * *

আমি তোমারে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, আশীর্ব্বাদ করিলাম।

শ্রী—

রাজা মহানন্দ রাওকে সম্বোধন করিয়া যশেশ্বরী দেবী কহিলেন, "মহারাজ! আমারে কি চিনিতে পারিতেছ? ভূপেশচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছ? অপ্সরাসুন্দরীকে দেখিয়াছ? কত দিনের কথা, মনে কর দেখি মহারাজ! তুমি নিষ্ঠুর। ভাবিয়া দেখ, নিরপরাধে এই নিরীহ ভূপেশচন্দ্রকে তুমি কত কষ্টই প্রদান করিয়াছ। শত্রুপক্ষের উত্তেজনায়,—কখন কখনও উত্তেজনা না পাইয়াও নির্দ্দোষ সন্তানকে কত কত বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিবার সহায়তা করিয়াছ;—তুমিও করিয়াছ, আর আমার সহোদরও করিয়াছেন।

সেই অভাগা স্বর্ণভূষণও করিয়াছিল। সমস্তই আমি জানি, সমস্তই আমি শুনিয়াছি, কতক কতক স্বচক্ষেও দেখিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! তোমাদের কাহারও দোষ নাই। আমারই অদৃষ্টের দোষ। তোমরা কেহই সত্য কথা জানিতে না, কে ত কে; বিদেশী, সামান্য লোকের সন্তান বিবেচনা করিয়াই তোমরা আমার এই প্রাণাধিকের প্রতি ঘৃণা করিতে। কেবল ঘৃণা করিয়াই যদি ক্ষান্ত থাকিতে, তাহা হইলে আমার প্রাণে তত আঘাত লাগিত না। কিন্তু তাহা ত নয়। তোমরা যাহা করিয়াছ, তোমাদের মত পদস্থ লোকে কখনও তাহা করিতে পারে, ইহা আমার জানা ছিল না।"

মস্তক নত করিয়া রাজা মহানন্দ রাও এই কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। রাণী নিস্তব্ধ হইলে একান্ত অপ্রতিভ হইয়া ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন, "আর আমাকে লজ্জা দিও না দেবি! না জানিয়া যে দোষ করা যায়, অবশ্যই তাহার ক্ষমা আছে। তুমি সতি, আমাকে ক্ষমা করিতে পার। আরও মনে কর, আমি নিষ্ঠুর নই। তুমি আমাকে কৌশলক্রমে একপ্রকার নিষ্ঠুরতা শিখাইয়াছিলে। ভূপেশচন্দ্র আমাদের অবৈধ বিবাহের ফল নয়। তথাপি কেন যে তুমি আমার নিকটে এ কথা গোপন রাখিয়াছিলে, কেন যে তোমার অকারণ লজ্জাভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বিবাহসম্বন্ধ লোকের কাছে গোপন রাখিতে বলিয়াছিলে, রাখিয়াছি; সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছিলে, সে অনুরোধ আমি রক্ষা করিয়াছি; পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুমতি করিয়াছিলে, তাহাও পালন করিয়াছি। কিন্তু দেবি! সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত আমার নিকট গোপন রাখা তোমার মত বুদ্ধিমতী রমণীর উচিত কার্য্য হয় নাই।"

"উচিত অনুচিত আমি বুঝি না মহারাজ! অজ্ঞাতে তোমরা ভূপেশচন্দ্রকে যেরূপ বিপদ্‌জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলে, আমি কেবল সেই কথাই বলিতেছি। আচ্ছা মহারাজ! আর একটী কথা। যখন তুমি পত্র প্রাপ্ত হও, পত্রে যখন দেখ, রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র, তখনও কি তোমার একটুও সংশয় জন্মে নাই? ভূপেশচন্দ্রকে তখনও কি সামান্য মজুর বলিয়া তোমার জ্ঞান ছিল?"

"ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ।" দীর্ঘ একটী হাই তুলিয়া মহানন্দ রাও কহিলেন, "ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ। তুমি যে, বলিতেছ দেবি! সে পত্র তুমিই লিখিয়াছিলে, ইহার প্রমাণ আমি কিরূপে প্রাপ্ত হইব? একে ত পত্র বেনামী, তাহাতে আবার নূতন হস্তের লেখা, তোমার হস্তাক্ষর আমি ভাল চিনি, সে পত্রে তোমার হস্তাক্ষর ছিল না, তাহা আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি।"

"ছিল নাই ত সত্য, ভূপেশচন্দ্র যখন গর্ভে, তখন আমি তোমারে শেষ পত্র লিখি। তাহাতেই কহিয়াছিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আর কোন সংশ্রব রাখিব না। তুমিও আমারে আর পত্র লিখিও না, আমিও তোমারে আর পত্র লিখিব না। সে কথা কি বিস্মৃত হইয়াছ মহারাজ? ভূপেশচন্দ্রের নামে যে পত্র তোমার হস্তে গিয়া উপস্থিত হয়, সে পত্র আমি স্বহস্তে লিখি নাই, অপরের হস্তে লিখাইয়া লইয়াছিলাম; স্বাক্ষরও করি নাই। সুতরাং বেনামী। কিন্তু তাহাতে কি হইল? আমিই লিখি, অথবা অপরেই লিখুক, তাহা লইয়া ত কথা হইতেছে না; যাহাকে তোমরা মজুর বলিয়া বিশ্বাস কর, সামান্য লোকের পুত্র বলিয়া জান, যে কেন হউক না, একজন তাহাকে রাজকুমার বলিয়া পত্র লিখিতেছে। কাহার পুত্র তুমি, তাহাও তুমি জান না; এ কথাও লিখিতেছ। তুমি তোমাকে যাহা ভাবিতেছ, তাহা তুমি নও; সে পত্রে এ কথাও লিখিতেছে। পরিচয় দিও না, যেমন আছ, তেমনিই থাক। ইহাও লিখিতেছে। পত্রলেখক অথবা পত্রলেখিকা স্পষ্টাক্ষরে রাণী বিরজাসুন্দরীর নাম করিতেছে। এতদূর নিগূঢ় রহস্য পাঠ করিয়াও কি রাজবুদ্ধিতে কিছুমাত্র দ্বিধা জন্মিল না? তাহার পরেও তুমি কুলোকের পরামর্শে ভূপেশচন্দ্রের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলে। ক্ষমা কর মহারাজ! আমি তোমারে অনেক কথা বলিলাম। এ ক্ষেত্রে এ সকল কথা না বলিলেও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইত না। আমি ভিন্ন, আর একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি ভিন্ন এই গুহ্য রহস্য আর কেহ জানিত না। এই নিমিত্তই মহারাজ! স্থানে স্থানে রূঢ় হইলেও স্থূল স্থূল রহস্যগুলি আমারে নিজমুখে প্রকাশ করিতে হইল। ক্ষমা কর।"

"তুমিও আমাকে ক্ষমা কর দেবি! আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার যেরূপ

হওয়া উচিত, তাহা হইল। কেবল একমাত্র প্রবোধ, জানা ছিল না। না জানিয়া পুত্রের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছি। এত দিনের পর অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আসিল।"

"কেবল আসিল কেন মহারাজ! প্রায়শ্চিত্ত ত হইয়া গেল। নিজমুখে পাপ স্বীকার করার নাম অনুতাপ। সেই অনুতাপের দ্বিতীয় নাম প্রায়শ্চিত্ত। ভূপেশচন্দ্র নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপ্সরাসুন্দরী নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন মহারাজ! আর একটী কার্য্য ব কী আছে।"

"বুঝিয়াছি। তুমি মনে করিতেছ, শ্রীমতী অপ্সরাসুন্দরীর সহিত শ্রীমান্ ভূপেশচন্দ্রের বিবাহ।"

অপ্সরাসুন্দরী অধোমুখী হইলেন। যশেশ্বরী দেবী কহিলেন, "তাহা ত বটেই মহারাজ! উদয়পুরাধিপতি স্বয়ং যখন ভূপেশচন্দ্রের হস্তে দেবী চামুণ্ডার সাক্ষাতে অপ্সরাসুন্দরীকে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন ত একপ্রকার বিবাহ হইয়াইছে। এখন কেবল প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রমাণে সেই শুভ কার্য্যটী সম্পাদিত হওয়া অবশিষ্টমাত্র। আমি এখন সে কথা বলিতেছি না, বিবাহের পূর্ব্বে আর একটী কার্য্য আমাদের বাকী আছে!"

"অনেক কার্য্য বাকী থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি কোনটী লক্ষ্য করিয়া এই বাকীর কথা বলিতেছ, স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা রঘুবর রাও পূর্ব্বাবধি যেভাবে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া রহিয়াছেন। শোক, ভয়, লজ্জা, অপমান, বৈরাগ্য, এককালে তাঁহার হৃদয়সাগরকে আকুলিত করিতেছে। কুমার হরবিলাস বাহাদুর সমুৎসুক নয়নে বিমাতার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। যশেশ্বরী দেবী কি বলিবেন, তাঁহার পক্ষে ও পক্ষ অনুকূল কি প্রতিকূল হইবে, এই সন্দেহে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে। ভূপেশচন্দ্র স্বভাবতই শান্ত-প্রকৃতি, তিনিও অনুমান করিতে পারিতেছেন না, জননীর রসনা হইতে কি বাক্য বিনির্গত হইবে। অপ্সরাসুন্দরীও বুঝিতে পারিতেছেন না। রাজা মহানন্দ রাও অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ কার্য্যটী এখন আমাদের বাকী আছে দেবি?"

"রাজা বিরাটকেতুর উদ্দেশ।" সহসা দণ্ডায়মান হইয়া সকৌতূহলে অপ্‌সরাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া যশেশ্বরী দেবী রাজপ্রশ্নে উত্তর করিলেন, "রাজা বিরাটকেতুর উদ্দেশ। অপ্‌সরাসুন্দরীকে তিনি যথার্থ কন্যার মতই স্নেহ করিতেন। ইহাঁরে হারাইয়া তিনি যেন একপ্রকার পাগলের মত হইয়াছেন। যদিও তিনি আমাদের হিতৈষী নন বটে, শেষকালে যদিও তিনি আমার ভূপেশচন্দ্রের পরমবৈরী, তথাপি,—তথাপি মহারাজ! শত্রুর প্রতি দয়া করা ভাল। শত্রুর দুঃখে দুঃখিত হইলে মনে একপ্রকার নূতন আনন্দের উদয় হয়। যাহারা বৈরনির্য্যাতনপ্রিয়, আমি তাহাদের অধিক প্রশংসা করি না। বীরপুরুষের বীরধর্ম্মে যেরূপ কর্ত্তব্য হউক, কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি, বৈরনির্য্যাতনকে আমি ভাল বলি না। শত্রুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে উচিত নির্য্যাতন সাধন করা হয়। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ যৎকালে রাজা দুর্য্যোধনকে সসৈন্য সপরিবার বন্দী করিয়া গন্ধর্ব্বপুরীতে লইয়া যান, বনবাসী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ইহা কি সামান্য নির্য্যাতন মহারাজ? রাজা বিরাটকেতু আমাদের অনেক অপকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত। একপ্রকার উন্মাদদশা প্রাপ্ত;—যাঁহার জন্য এই দশা, তাঁহাকে যদি একবার দেখাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের উচিত কার্য্যই হয়। কি বল মা অপ্‌সরা! পিতাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়?"

নলিনী যেমন নিশাপ্রভাতে উল্লাসিনী হইয়া নলিনীকান্তকে অবলোকন করে, যশেশ্বরীর বাক্যে উল্লাসিনী হইয়া অপ্সরাসুন্দরী সেইরূপে ভূপেশচন্দ্রের মুখপানে চাহিলেন। তাঁহার দুটী পদ্মচক্ষু যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া হাস্য করিল। মুখের হাসি অপেক্ষা চক্ষের হাসি আরও চমৎকার। ভূপেশচন্দ্র সেই হাস্যের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। কুমার হরিকৃষ্ণ বুঝিলেন। রঘুবর রাও মাথা তুলিলেন না।

মৃদুহাস্য করিয়া মহানন্দ রাও কহিলেন, "দেবী যশেশ্বরি! নামেও তুমি যেমন যশেশ্বরী, ব্যবহারেও সেইরূপ দয়ামায়ার ঈশ্বরী। তোমার আশা ফলবতী হয়, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা বটে, কিন্তু সংঘটনে বিভ্রাট।"

"কেন মহারাজ? বিভ্রাট্ কিসে?—তুমি যাইবে, আমি যাইব, আমার

ভ্রাতা, রঘুবর রাও যাইবেন, ভূপেশচন্দ্র যাইবে, হরবিলাস যাইবে, সকলে আমরা অপ্সরাসুন্দরীকে বেরিয়া লইয়া যাইব। বিভ্রাট্ ভাবিতেছ কিসে ?—এত লোকের সম্মুখে বিভ্রাট্ আসিয়া কি সাহসে দাঁড়াইবে ?”

“যাইব সত্য, যাইবে সত্য, বিভ্রাট আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিবে না, ইহাও হয় ত সত্য, কিন্তু দেবি ! রাজা বিরাটকেতুর উদ্দেশ নাই। তুমি স্ত্রীলোক, অন্তঃপুরে থাক, কোন সংবাদ রাখ না, একপ্রকার পাগল হইয়াছেন, কেবল এই মাত্র শুনিয়াছ, কিন্তু কিসের জন্য পাগল, তাহার তুমি কিছুই জান না। অপ্সরাকে তিনি কন্যার মত ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, জানি ; কিন্তু অপ্সরার শোকে তিনি পাগল হন নাই। কেন পাগল হইয়াছেন, রাজা রঘুবর রাও ভাল জানেন।”

“ভাল জানেন” কথাটী সমাপ্ত হইবামাত্র উন্মত্তবৎ রঘুবর রাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেন গৃহ হইতে পলায়ন করিবার অভিলাষে চঞ্চলচরণে প্রস্থান-দ্বারের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন।

“কোথায় যাও, রাজা ! কোথায় যাও ? দাঁড়াও, স্থির হও, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমি ও কথা বলি নাই। রাজা বিরাটকেতুর উদ্দেশ করিতে হইবে, তুমি তাঁহার সন্ধান জানিতে পার, শত্রুভাবেই হউক, অথবা মিত্রভাবেই হউক, আমি শুনিয়াছি, সর্ব্বদা তুমি তাঁহার চালচলনের প্রতি দৃষ্টি রাখ। দাঁড়াও, একসঙ্গে যাইতে হইবে।”

গোপনে হাস্য করিয়া এই সকল কথা বলিতে বলিতে রাজা মহানন্দ রাও ব্যস্তভাবে রঘুবর বাহাদুরের হস্ত ধারণ করিলেন। যাহারা ভল্লুক নাচাইয়া বেড়ায়, তাহারা যষ্টিদ্বারা ভল্লুকের অঙ্গস্পর্শ করিলে বন্যভল্লুক যেমন জড়সড় হয়, রাজা মহানন্দের করস্পর্শে রঘুবর রাও সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। নড়িতেও পারিলেন না, কথা কহিবারও শক্তি হইল না। যেখানে ছিলেন, ধীরি ধীরি সেই খানে আসিয়া বসিলেন। তিনি ছাড়া সকলেই মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন।

সকলকে নীরব দেখিয়া কুমার হরবিলাস বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে কহিতে লাগিলেন, “বহুদিন বিরাটকেতুর সংবাদ নাই। সত্য কথা। কোথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহাও নিশ্চয় জানা যাইতেছে না। আমি

অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণ করাই আমার অভ্যাস। অনেক স্থানেই আমার গতিবিধি আছে। কিন্তু রাজা বিরাটকেতু এখন যে কোথায়, সে কথা কেহই আমাকে বলিয়া দিতে পারে নাই। আমার শঙ্কা হইতেছে, তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হওয়া কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র সার হইবে। অতএব আপাততঃ সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আর একটী সৎসঙ্কল্পে প্রবৃত্ত হওয়া আমার ইচ্ছা।"

"কি তোমার ইচ্ছা হরবিলাস? তোমার গুণ, তোমার চরিত্রচর্য্যা, আমি বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তোমা হইতেই আমার ভূপেশচন্দ্রের জীবন রক্ষা হইয়াছে। ভূপেশচন্দ্র আমার যেরূপ স্নেহের সামগ্রী, তুমিও আমার তদ্রূপ। বরং আরও কিছু বেশী। যদিও গর্ভে স্থান দিই নাই, কিন্তু বাছা! আমি তোমার মা, তুমি আমার পুত্র। বল দেখি বাছা, বিরাটকেতুর অন্বেষণ ছাড়িয়া আর কি অন্বেষণ করা তোমার ইচ্ছা?" মহাকৌতূহলে আক্রান্ত হইয়া দেবী যশেশ্বরী আপন সপত্নীপুত্রকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন।

যশেশ্বরীর চরণে প্রণিপাত করিয়া হরবিলাস উত্তর করিলেন, "আমার ইচ্ছা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বিরাটকেতুর সন্ধান না করিয়া অপ্সরাদেবীর প্রকৃত পিতা মহারাজ উদয় সিংহের অনুসন্ধান করাই এখনে উচিত।"

"না বাছা! এটী তুমি বালকের মত কথা কহিলে। মহারাজ উদয়-সিংহের অনুসন্ধান করিতে হইবে না। স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন রাজা তিনি। সূর্য্যবংশের মহাপ্রতাপান্বিত সমুজ্জ্বল রত্ন। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না। তিনি অবশ্য স্বরাজ্যেই বিরাজ করিতেছেন। ইচ্ছা করিলে আমরাও সেখানে যাইতে পারি, কিম্বা এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তিনিও এখানে পদার্পণ করিতে পারেন। বিরাটকেতুর অন্বেষণ করাই আবশ্যক।" হরবিলাসকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাণী যশেশ্বরী সস্নেহ-ভঙ্গীতে অপ্সরাসুন্দরীর উৎকলিকাকুল লোচন পানে কটাক্ষপাত করিলেন। অপ্সরাসুন্দরী অবনতবদনে গাত্রোত্থান করিয়া রাজা মহানন্দ রাও আর দেবী যশেশ্বরীর চরণে প্রণাম করিলেন। তাহার পর দায়ে পড়িয়া যেন

অগত্যা রাজা রঘুবর রাওকেও তাচ্ছিল্যভাবে একটী প্রণাম করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, বিরাটকেতুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অপ্সরাসুন্দরীর অভিলাষ হইয়াছে। আহা! তাহা আর হইবে না? শৈশবাবধি পরমযত্নে যিনি প্রতিপালন করিয়াছেন, সরলা বালিকা শৈশবাবধি যাঁহাকে পিতা জানিয়া, পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, বহুদিনের পর তাঁহাকে দর্শন করিবার আশা হৃদয়মধ্যে যে, বলবতী হইবে, ইহা কি বড় বিচিত্র কথা? আশা কখন যে, কোন্ ভাবে থাকিয়া কাহার হৃদয়ে কোন্ ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেয়, আশাজীবী জীবমাত্রেই তাহা অবগত থাকিতে পারে। অপ্সরাসুন্দরীর আশা বিচিত্র আশা নহে। কেবল এইটুকু মাত্র বিচিত্র যে, সকলেই জানেন, আশা চপলা।

কতক্ষণ তাঁহারা যে, সেই গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, কেহই তাহা গণনা করেন নাই। যখন সকলের সম্মতিতে বিরাটকেতুর অন্বেষণ করাই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল, তখন সকলেই সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা রঘুবর রাও ব্যতীত সকলের অন্তরেই আশাদেবীর খেলা হইতে লাগিল। এ মেয়েটী খেলা করিতে বিলক্ষণ পটু। খেলা দেখিয়া দেখিয়া দিন দিন আমি আদর করিয়া বলি, আশা চপলা।

অষ্টষষ্টিতম প্রবাহ।

সাত ঘাটের জল !!

"শৈল দক্ষ ভূত যক্ষ লম্ফ ঝম্প বাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দবন্দ বাড়িছে॥"

অন্নদামঙ্গল।

এক মাস গেল। কুমার হরবিলাস একাকী স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া রাজা বিরাটকেতুর কোন সংবাদই প্রাপ্ত হইলেন না। আর কত মাস

পরে একদিন অমৃতসরের পথে একজন শীখ সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বের দুই একদিনের পরিচয় ছিল, অল্পক্ষণের কথোপকথনেই সেই পরিচয় নূতন হইয়া দাঁড়াইল। সেই সৈনিকের নাম ভক্তগোপাল সিংহ। কথা কহিতে কহিতে তিনি হরবিলাসকে কহিলেন, "এ প্রদেশে বহুদিন তোমায় দেখি নাই। এতদিন তুমি কোন্ কার্য্যে, কোন্ রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলে?"

"অনেক রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছি। কার্য্যগতিকে কিছুদিন প্রয়াগরাজ্যে ছিলাম। পুনরায় নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এই রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

"কেবল ভ্রমণের অছিলায় অথবা আর কোন উদ্দেশ্য আছে? তোমার মত বীরপুরুষেরা বিনা কারণে কেবল ভ্রমণাশা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কদাচ স্বদেশ পরিত্যাগ করেন না। আমি বোধ করি, তোমার কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।"

"আছে কিছু। কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এখানে দাঁড়াইয়া সে সকল কথা বলিতে পারিব না। নিকটে যদি কোন বিরামগৃহ থাকে, সেই স্থানে গমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।"

"বিরামগৃহের অপ্রতুল নাই, অভ্যাগতের নিমিত্ত সমস্ত বিরামগৃহই সর্ব্বক্ষণ অবারিত। তোমার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটী সাধারণ বিরামগৃহে লইয়া যাইতে পারি।"

"বাধিত হইলাম। তুমি আমার বিশেষ বন্ধু। পূর্ব্বপরিচয়ে তোমার সদ্ব্যবহার আমি বিশেষরূপে জানিয়াছিলাম। তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমি সেই খানেই যাইতে প্রস্তুত আছি।"

ভক্তগোপাল আহ্লাদপূর্ব্বক হরবিলাসকে সঙ্গে লইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে গমন করিলেন। যে গৃহে উভয়ে প্রবেশ করিলেন, সেটী ভক্তগোপালের নিজেরই আবাসগৃহ। কুমার হরবিলাস সেই গৃহে যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগোপাল কোথায় কিরূপে হরবিলাসকে দেখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় হইবে না। যে উদ্দেশে এ যাত্রা হরবিলাসের আগমন, তাহাতে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের অবসর নাই। যে সময়ে সাক্ষাৎ

হইয়াছিল, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। এখন সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর ভক্তগোপালের অনুরোধে হরবিলাস স্বীকার করিলেন, সেই গৃহেই নিশা যাপন করিবেন। নানাপ্রকার কথা হইতেছে, কথার সঙ্গে সঙ্গে রজনীদেবী অগ্রসর হইতেছেন, গৃহমধ্যে আরও দুই একটী লোক প্রবেশ করিতেছে, তাহারাও পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া হরবিলাসকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, হরবিলাস বিদেশী ভ্রমণকারী হইয়াও সে দিন সুখী। গৃহের চারি ধারে চারিটী, এবং মধ্যস্থলে একটী, এই পাঁচটী আলো জ্বলিতেছিল। গৃহভিত্তিতে অনেক প্রকার দেবদেবীর ছবি ঝুলিতেছিল। গ্রীষ্মকাল, সমস্ত গবাক্ষ উন্মুক্ত, ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, ইহারই নাম সুশীতল সমীরণ। কিন্তু সেই সুশীতল সমীরণ কিঞ্চিৎ উষ্ণভাব ধারণ করিয়া অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ প্রবলবেগে বহিল;—এককালে পাঁচটী বাতী নিবিয়া গেল। একেবারে অন্ধকার। গৃহস্থিত সমস্ত লোকই এককালে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সেই অন্ধকারেই কহিলেন, "সে দিন আমি এক জায়গায় গিয়াছিলাম। কাহাকেও বলিতে মনে হয় নাই, আজিকার হাসি দেখিয়া মনে পড়িল, সেখানেও ঘরে ঘরে এই প্রকার হাসির গোল।"

যিনি এই কথা কহিলেন, তাঁহার নাম বৃন্দাবন পন্থী। কথা কহিয়াই তিনি আবার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিলেন। এই অবকাশে আর একজন লোক সেই নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকা পাঁচটী পুনঃপ্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে যে বাক্যতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল। গৃহস্বামী ভক্তগোপাল মহাকৌতূহলপরবশ হইয়া বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দিন তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কোথায় কি দেখিয়াছ? কোথায় কি শুনিয়াছ? কোথায় কাহাদের ঘরে ঘরে হাস্যকোলাহল?"—তদপেক্ষা আরও জ্বলন্ত কৌতূহলে, আরও জ্বলন্ত আগ্রহে, কুমার হরবিলাস সেই প্রশ্নে প্রতিধ্বনি করিলেন।

মৃদু হাসিয়া, একটু মাথা নাড়িয়া বৃন্দাবন কহিলেন, "সে বড় চমৎকার স্থান। প্রকাণ্ড এক বাড়ী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বহুকালের প্রাচীন প্রাচীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সেই সকল বৃক্ষে কত রকমের কত যে পাখী,—সেই সকল পাখীরা যে কতপ্রকার স্বরে কলরব করিতেছে, তাহা আর কি

বলিব। এক একটী পাখীর রব শুনিয়া কৌতূহল জন্মে, আনন্দ জন্মে, প্রীতি জন্মে;—এক একটা পাখীর ডাক শুনিয়া ভয় হয়। শকুনি, বাজ, চিল, কাকাতুয়া, আর আর কতরকম, নাম জানি না;—সেই সকল পাখী ভয়ানক ভয়ানক চীৎকার করে। তাহাদের ভরে বিনাবাতাসেও বড় বড় গাছের বড় বড় ডালগুলি কাঁপে। পাতারা ত থরহরি কম্পবান্। বাহিরের গাছেও যেরূপ, ভিতরের ঘরে ঘরেও সেইরূপ। কত চীৎকার, কত কলরব, কত কোলাহল, কত ক্রন্দন, কত হাসি, তাহার পরিমাণ করা যায় না। কত যে লোক তাহার ভিতর, তাহাও গণনা করা ভার। কেন যে আমি সেখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। দূর হইতে পাখীর কলরব শুনিয়া কৌতূহল জন্মিয়াছিল, পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়াছিলাম, নিকটে গিয়া শুনি, ভিতরে আরও গোল। মনে করিলাম, চিড়িয়াখানা আর পশুশালা একত্র। প্রবেশদ্বারে দুইজন প্রহরী ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ চিড়িয়াখানা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন হাস্য করিয়া উত্তর করিল, 'ভারি তাজ্জব। প্রবেশ নিষেধ',—কৌতূহল আমাকে যেন উন্মত্ত করিয়াছিল। সেই কৌতূহলবশেই আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, দর্শনী প্রদান করিলেও কি সে নিষেধের নিষেধ হইতে পারে না?"

"দুইজন প্রহরী চুপি চুপি কি পরামর্শ করিল। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া, কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া একজন কহিল, 'কর্ত্তাপক্ষের অনুমতি না পাইলে আমরা এ কথার উত্তর দিতে পারি না।' সৌভাগ্যক্রমে আমার পোশাকটা কিছু জাঁকাল ছিল; দ্বিতীয় প্রহরী একটু সম্ভ্রম দেখাইয়া গম্ভীরভাবে কহিল, 'সাধারণের প্রবেশের অনুমতি নাই, কিন্তু আপনার মত সম্ভ্রান্তলোকের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম। দর্শনী প্রদান করিলে আমাদের সঙ্গে গিয়া দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু আর একটী শক্ত নিয়ম।—যতক্ষণ ইহার মধ্যে থাকিবেন, ততক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিতে হইবে; কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিবেন না'।"

"তাহাতেই আমি সম্মত হইলাম। তাহারা যে দর্শনী চাহিল, দ্বিরুক্তি করিলাম না, তাহাই প্রদান করিলাম। একজন আমাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। অতি বিভীষণ দৃশ্য! অপূর্ব্ব ব্যাপার!

কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কুত্রাপি কখনও আমি দেখি নাই। ভাবিয়াছিলাম, চিড়িয়াখানা, ভাবিয়াছিলাম, পশুশালা, সে অনুমান ঘুরিয়া গেল। সমস্তই মানুষ। মেয়ে, পুরুষ, নানাজাতি অনেক মনুষ। সারি সারি অনেক কাটগড়া। প্রত্যেক কাটগড়ার মধ্যে এক এক লোক। বাস্তবিক চিড়িয়াখানায় যেমন বানরভল্লূকাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচরণ করে, সেখানে মানুষেরাও সেইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। আট দশজন একত্র হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। চক্ষে হস্তাবরণ দিয়া উল্লূকের মত চারি পাঁচজন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে। কোন কোন কাটগড়ায় এক একটা লোক অৰ্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় মুখ বাঁকাইয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিলে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। অথচ এক একটাকে দেখিলে ভয়ও হয়। এক এক স্থানে এক একটা লোক মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে। কোথাও বা দেখিলাম, এক একজন লোক ফুলের মালা হাতে লইয়া ঘন ঘন আঘ্রাণ করিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া বিরহগীত গাইতেছে। কেহ বা শুদ্ধ টাকা টাকা বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কেহ বা গুরু নানক, গুরুগোবিন্দ বলিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। কেহ কেহ যেন অচেতন হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। কোন কোন কাটগড়ার মধ্যে পূরীষমূত্রপূর্ণ-পাত্রসম্মুখবর্ত্তী মানুষমানুষীরা বিষ্ঠামূত্র মাখিয়া যেন পিশাচ সাজিয়া বসিয়া আছে। কোন কোন মানুষ হাত ঘুরাইয়া শৃগালের রব করিতেছে, কেহ কেহ কুকুর ডাকিতেছে, কেহ কেহ মার্জ্জারের ন্যায় ছলি পাতিয়া কাটগড়ার ধারে হস্ত বিস্তার করিতেছে, কেহ কেহ বা পোষাপাখীর মত চমৎকার চমৎকার বুলী বলিতেছে। এক একটা রোগা লোক পেট উচু করিয়া গুলীখোরে যেমন করিয়া গুলী খায়, ঠিক সেইরূপ ভঙ্গী দেখাইতেছে। কেহ কেহ বা শূন্য হস্তে গাঁজা টিপিবার মত আঙুল টিপিতেছে। এইরূপ কত যে কি দেখিলাম, কত কি দেখিয়া কৌতুক বাড়িল, কত কি দেখিয়া হাসি আসিল, কত কি দেখিয়া ঘৃণা জন্মিল, কত কি দেখিয়া ভয় পাইলাম, এখনও তাহা মনে হইলে সকল ভাবগুলিই মনে যেন একত্র হয়। শেষকালে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর হইল। একজন লোক, দিব্য আকারপ্রকার, দিব্য

বর্ণ, সময়ে বোধ হয় দিব্য সুশ্রীও ছিল, সেখানে যেন লাঙ্গুলবিহীন হনুমানের মত কাটগড়ার গরাদে বাহিয়া খুঁটীর উপর সড়্ সড়্ করিয়া উঠিতেছে, সড়্ সড়্ করিয়া নামিতেছে, এক একবার চীৎকার করিয়া কথা কহিতেছে। কথা কেবল 'লক্ষ টাকা!—বিশ হাজার!—মোকদ্দমা!—জগৎ!—স্বর্গ!—' বার বার কেবল এই সব কথা। থাকিয়া থাকিয়া রোদন, থাকিয়া থাকিয়া হাস্য, থাকিয়া থাকিয়া লম্ফ। তেমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড তত বড় বাড়ীতে আর কোথাও আমি দেখিলাম না। সেই লোকটা—"

আর শুনিবার ইচ্ছা না করিয়া কুমার হরবিলাস ব্যগ্রভাবে সবিস্ময়ে ভক্তগোপালের দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "মিত্রবর! ঠিক হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি। তুমিও হয় ত বুঝিয়াছ। বৃন্দাবনজী যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াছি।—****—কি বল পণ্ডিজী! তোমার কি অনুমান হয়?"

বৃন্দাবন উত্তর করিলেন, "অনুমান করিতে আমি জানি না, তেমন কাণ্ড কখনও আমি দেখি নাই।"

হাস্য করিয়া ভক্তগোপাল কহিলেন, "তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এমন চমৎকার বর্ণনায় আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বৃন্দাবন কহিলেন, "হাঁ, হাঁ! ঠিক্ ঠিক্! আমি তবে তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। যে সকল চেহারা দেখিয়াছি, তাহা মানুষের। সত্য যদি তাহারা মানুষ হয়, তাহা হইলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।"

"পারে না, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিজি! তোমার কাছে আমি পরম বাধিত হইলাম। তুমি তোমার সেই চিড়িয়াখানাটী আমাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

হরবিলাসের এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভক্তগোপাল কহিলেন, "এই লও! এই এক আশ্চর্য্য তামাসা দেখ! আচ্ছা, ভাল, তাহাই যেন হইল, তোমার সঙ্গে ভাল, চিড়িয়াখানার কি সম্বন্ধ?"

"আছে কিছু। পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি, আছে কিছু। সম্বন্ধ না থাকিলে বৃন্দাবনজীর অত কথায় বাধা না দিয়া শেষ কথায় বাধা

দিলাম কি জন্য? তুমি মনে করিতেছ রহস্য, অবশ্য মনে করিতে পার; কিন্তু যদি তুমি এই রহস্য অপেক্ষাও নিগূঢ় রহস্য জানিতে, জানিতেও হইবে,—এখন যদি জানিতে, তাহা হইলে প্রশ্ন করিতে হইত না।"

"যাহাতে প্রশ্ন করিতে না হয়, মৈত্রবিশ্বাসে সেইরূপ স্পষ্ট করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও। সমুদ্রে অনেক জল আছে, জলে অনেক জলজন্তু আছে, তাহা ছাড়া লুক্কায়িত রত্নও আছে, ধরিতে গেলে মানুষের মন এক এক সমুদ্র। তোমার মানস-সাগরে--"

"আমার মানস-সাগরে?—আমার মানস-সাগরে কি রত্ন লুকানো আছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? আচ্ছা, সমস্ত রাত্রি আমি জাগরণ করিব। তোমরা নিচিন্ত হইয়া শয়ন কর, বিশ্রাম কর, আমার সহচরী চিন্তা, আমি জাগরণ করিব। রজনী প্রভাত হউক, সেইখানে লইয়া চল, বৃন্দাবনজী পথপ্রদর্শক হইবেন, লইয়া চল, সেইখানেই জানিবে, আমার মানস-সাগরে কি মৎস্য, কি জন্তু, কি শুক্তি, কি মুক্তা, অথবা কি রত্ন ডুবিয়া রহিয়াছে।"

এমন সংক্ষিপ্ত আভাস প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকে কি সকল কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? কুমার হরবিলাসের আভাসবাক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে ভক্তগোপাল সে সময় সমর্থ হইলেন না। বৃন্দাবনপন্থী চমৎকৃত হইলেন। প্রভাতে কি হইবে, ঔৎসুক্যে জ্বলন্ত তাহা ভাবনা করিতে করিতে সকলেই যেন বিভোর হইয়া রহিলেন। নিদ্রার সঙ্গে কাহারই সাক্ষাৎ হইল না।

রজনী প্রভাত হইল। সকলেই জাগরণ করিয়াছেন, প্রসঙ্গ বাড়াইয়া পরস্পর অনেক কথার বিনিময় হইয়াছে। যেখানে যেখানে গ্রন্থি ছিল, তাহা শ্লথ্ হইয়া গিয়াছে, হরবিলাস অত্যন্ত ব্যস্ত। যাঁহারা অকারণে জাগিয়াছেন, তাঁহারাও কৌতূহলী। বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে সকলেই যথাসম্ভব সুসজ্জিত হইয়া বাতুলালয় পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। যে প্রণালীতে বৃন্দাবনপন্থী সেই চিড়িয়াখানা দর্শন করিয়াছিলেন, দলবদ্ধ হইয়া সে দিনেও সেই প্রণালীতে তাঁহারা সকলে সেই স্থান দর্শন করিলেন। বৃন্দাবনের মুখে যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, অধিক কৌতুকাবহ দৃশ্য, অধিক ভয়াবহ কাণ্ড, অধিক হাস্যজনক ব্যাপার তাঁহাদের নেত্রগোচর হইল। সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে বীভৎস দৃশ্যই অধিক। হরবিলাসের কিছুই ভাল লাগিল না। কিছুতেই কৌতুক জন্মিল না, কিছুতেই ভয় আসিল না। যাহা তাঁহার দেখিবার, তাহারই জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। শেষকালে সেই কাট্‌গড়া দেখিলেন। এ কি চমৎকার ইন্দ্রজাল! কাট্‌গড়াটী শূন্য রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কেহই নাই। বিরক্ত হইয়া হরবিলাস ভাবিলেন, বৃন্দাবনটাও পাগল! শেষের কথাগুলি সে ব্যক্তি হয় ত অন্য লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। শ্রোতালোকের কৌতুক উদ্দীপন করিবার অভিপ্রায়ে গল্পের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছে।" অস্থির হইয়া বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ পণ্ডিজী! কৈ তোমার হনূমান কোথায়?—কত কথা বলিয়া,—কত নাম করিয়া যে ব্যক্তি কাটগড়ার খুঁটী বাহিয়া উঠিত, নামিত, সে দিন যাহাকে দেখিয়া গিয়াছিলে, সে ব্যক্তি কোথায়?"

অপ্রতিভ হইয়া বৃন্দাবন উত্তর করিলেন, "আমি মিথ্যাকথা বলি নাই। গল্পে যেমন ভোজবাজী শুনা যায়, চণ্ডীগ্রন্থে যেমন শ্রীমন্তের কমলে কামিনী পাঠ করা যায়, ইহাও যেন ঠিক সেইরূপ বোধ হইতেছে।"

"তাহা ত হইতেছে, কিন্তু তোমার হনূমান গেল কোথায়?"

"প্রহরী জানে।"

প্রহরীর দিকে চাহিয়া কুমার হরবিলাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রহরি! এই কাটগড়ায় কি এক হনূমান থাকিত? অনেক লোকের নাম করিয়া, অনেক টাকার কথা বলিয়া, সেই হনূমান কি লম্ফঝম্প প্রদান করিত?"

কুমার হরবিলাস রাজবেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রহরী তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাজোচিত সম্মানে অভিবাদন করিয়া উত্তর করিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার! ছিল। থাকিত। অনেক দিন ছিল।"

"যদি ছিল, তবে গেল কোথায়?"—কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে এই প্রশ্ন করিয়া রাজকুমার বাহাদুর তীব্রদৃষ্টিতে সেই প্রহরীর দিকে দারুণ বিশাল কটাক্ষ বিনিক্ষেপ করিলেন।

প্রহরী ভয় পাইল না, কুণ্ঠিত হইল না, একটু সঙ্কুচিতও হইল না,

পরিষ্কার পরিষ্কার উত্তর করিল, "সে লোক মহারাজ বদ্ধপাগল। তাহাকে একস্থানে স্থির রাখা যায় না। কখনও রাজা বলিয়া পরিচয় দেয়, কখনও ফকীর বলিয়া কাঁদে, কখনও স্ত্রীলোকের নাম করে, কখনও রাজপুত্রের কথা আনে, কখনও বা টাকার শোকে লাফাইয়া উঠে।"

"হাঁ, হাঁ! তাহা ত বুঝিলাম, অনেক কথায় তুমি আমাকে বুঝাইতে পার, কিন্তু একটী স্থূলকথার উত্তর দিতে পারিতেছ না। আমি তাহাকে খালাস করিতে আসিয়াছি, সে লোক গেল কোথায়?"

একটু যেন শঙ্কিত হইয়া প্রহরী উত্তব করিল, "এ রাজ্যের নিয়ম বড় ভাল মহারাজ! তদারক খুব ভালই আছে, অনুসন্ধান খুব ভালই আছে। রাজার আদেশে পরীক্ষকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, কোন্ ব্যক্তি কি কারণে, কিসের জন্য পাগল। যে যাহা চায়, যে যাহা বলে, যে যাহা দেখিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে তাহা দেওয়া হয়, তাহাকে তাহার উত্তর দেওয়া যায়, তাহাকে তাহা দেখানো হইয়া থাকে।"

বাজে কথায় আড়ম্বর করিতেছ। যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার ঠিক্ ঠিক্ উত্তর কর। যে লোক এই ঘরে ছিল, তাহাকে কোথায় তোমরা লুকাইয়া রাখিয়াছ? বাদসাহী কায়দা ছাড়িয়া শীঘ্র করিয়া বল, স্পষ্ট করিয়া বল, শীঘ্র বল।"

"তাই ত বলিতেছি মহারাজ! সে লোক অনেক কথা কয়। অনেক টাকার কথা বলে। মেয়েমানুষের নাম করে। সেই জন্য,—শুদ্ধ সেই জন্য এখানকার অধ্যক্ষেরা তাহাকে দিন দিন ভিন্ন ঘরে সরাইয়া রাখিতে বলেন, স্ত্রীলোক দেখান, সম্মুখে টাকা ছড়াইয়া দেন, স্পর্শ করিতে দেন না, কিন্তু যাহাতে তাহার মন ভাল থাকে, লোকটা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আরাম হয়, কেবল সেই চেষ্টাই করেন। এখানকার অধ্যক্ষেরা বড়ই দয়ালু।"

হস্তের চাবুক কম্পিত করিয়া হরবিলাস কহিলেন, "কাহারা তোমাদের দয়ালু অধ্যক্ষ, আমি দেখিতে চাই। ডাক। পাগলকে লুকাইয়া রাখা কোন রাজ্যের নিয়ম নয়। ভারতবর্ষের রাজারা সকল প্রজার প্রতি সমান দয়া দেখাইয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যদোষে এখন যবন রাজা, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনে আজিও আকবরের নাম আছে বলিয়া আমি তোমাদের এত দূর

কপটতা এখনও ক্ষমা করিতেছি। ডাক, কে তোমাদের অধ্যক্ষ, শীঘ্র ডাক। অনুমানে যাহা বুঝিতেছি, তাহাই ঠিক্। আমার পাগল আমাকে তোমরা দেখাইয়া দাও।"

প্রহরী আর উত্তর করিতে সাহস করিল না;—সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। কুমারের সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, ভাবভঙ্গি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু পরেই সেই প্রহরীর সঙ্গে একজন অধ্যক্ষ উপস্থিত। অধ্যক্ষের পরিধান সর্ব্বাঙ্গে নীল বসন, মস্তকে নীল টুপী, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণে ঢাকা। বাহিরে কেবল তাম্রবর্ণ মুখখানি জাগিতেছে। দেখিবামাত্রেই হরবিলাস তাহাকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি চিনিয়াও যেন ভিন্নরূপে চিনিল। বিস্ময় গোপন করিয়া জোর জোর কথায় কহিল, "ভূপেশচন্দ্র! তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ? আমি মরি নাই, আমার সহধর্ম্মিণী মরে নাই; তত শীঘ্র শীঘ্র কি কাহারও প্রাণান্ত হইয়া থাকে? তোমাদের দর্প আমরা পদতলে দলন করি, সেই জন্য মূর্চ্ছার ছলে ভয় দেখাইয়াছিলাম,—সরিয়া গিয়াছিলাম, আমাদের দুইখানি লেপ্ আর দুটী বালিশ কেবল শয্যার উপর পড়িয়া ছিল। তুমি গৃহে ছিলে না, বিরাটকেতুর কন্যা প্রায় অজ্ঞান ছিল, আমরা সরিয়া গিয়াছিলাম। এখন তোমাকে পাইয়াছি, আর তুমি পলায়ন করিতে কখনই পার না।"

কুমার হরবিলাস এই সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হাস্য করিয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই গারদে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই পাগল! প্রহরী আসিয়াছিল, সেটাও পাগল, অধ্যক্ষ বলিয়া যেটাকে আনিল, সেটাও পাগল।"

পাগলে কি করিতে না পারে? মনে মনে এই সংশয় ভাবিয়া কুমার হরবিলাস অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া মৃদুমৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "হনুমন্ত সিংহ! তুমি পাগল হইয়াছ কতদিন? মরিয়াছিলে, এ কথাই বা তোমার মনে হইয়াছে কত দিন? অপর্ণাসুন্দরী বাঁচিয়া আছেন, আমাকে ইহা শুনাইবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তুমি জান, রাজপুত্র হইয়াও আমি কৌমার ব্রহ্মচারী। সে কথা থাক, তুমি এই

বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ।—ওঃ! এমন না হইলে মহাপ্রতাপান্বিত মোগল-বংশের এমন অধঃপতন হইবেই বা কেন? পাগলেই পাগলা গারদের কর্ত্তা হয়। আচ্ছা, সে কথাও থাক্, এই ঘরে যে পাগল থাকিত, সে পাগল কোথায়, আমাকে দেখাইয়া দাও।"

আলয়ের অধ্যক্ষ বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া প্রহরীসমভিব্যাহারে হরবিলাসকে লইয়া অনেক দূরের একটী নির্জ্জন গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহেই সেই পাগল।—কাটগড়ার ভিতর একা।—সম্মুখভাগে অনেক মোহর, অনেক টাকা। বামে দক্ষিণে আর দুটী ছোট ছোট কামরায় দুটী সুন্দরী নারী।—একটী রক্তবাসা, একটী পীতবাসা।—পৃষ্ঠদেশে এলো চুল, কর্ণদেশে নীল দুল। মুখে মৃদুমৃদু হাসি। পাগল একবার এদিকে চাহি-তেছে, একবার ওদিকে চাহিতেছে। একবার একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিতেছে, টাকা।—কিন্তু ঘন ঘন বেড়া দিয়া ঘেরা। স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। তিন দিকেই না। সম্মুখে গিয়া হরবিলাস দাঁড়াইলেন। পাগল তাঁহাকে দেখিয়া বিকটভঙ্গীতে যেন দংশন করিতে আসিল। হরবিলাস হাস্য করিলেন। একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ?"

দন্ত বিকাস করিয়া কট্‌মট্ চক্ষে চাহিয়া মিহিসুরে গান করিতে করিতে পাগল কহিল, "পার না পার না চিনিতে!—আমায় চিনিতে!—অপ্সরা-সুন্দরি! আয় মা! ঘরে আয়! এত দিন কোথায় ছিলি মা? জগৎকুমারী? ঐ বুঝি! ঐবুঝি! ঐ বুঝি জগৎকুমারী? রাণি! কোথা ছিলি মা! আমি কোথায় আছি? স্বর্গভূষণ! সব কি মিথ্যাকথা?"—এই তিন নাম করিয়া,—এই সব কথা বলিয়া,—বৃন্দাবনকে যেমন যেমন বলিয়াছিল, ঠিক্ তেমনিভাবে পাগলটা লাফাইতে লাগিল। গম্ভীরভাবে হরবিলাস কহিলেন, "তোমার যে এই দশা হইবে, তাহা আমি জানিতাম। থাকো কিছু দিন। শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিতেছি।" অধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, তরবারি বিকম্পিত করিয়া, রাজকুমার কহিলেন, "তুমি হনুমন্ত, তুমিও থাকো কিছু দিন। মরিয়াও মর নাই, ভালই হইয়াছে। তোমার অপর্ণাসুন্দরী আমার মা হন, গর্ভধারিণী মায়ের মত তাঁরে পূজা করি

আমি। থাক তুমি কিছুদিন। ভূপেশচন্দ্র তোমার যম। আমি ভূপেশচন্দ্র নই। এক প্রকারে যমরাজের কিঙ্কর আমি। দেখিতেছ আমার অসি, ইহা শিষ্টের পক্ষে,—মিত্রের পক্ষে অমৃতবারি,—দুষ্টের পক্ষে,—শত্রুর পক্ষে ভীষণতরবারি। যাহা দেখিবার ছিল, যাহা জানিবার ছিল, এই ভক্ত-গোপালের অনুগ্রহেই, এই বৃন্দাবনজীর অনুগ্রহে তাহা দেখিলাম, তাহা জানিলাম। শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইবে। প্রহরি! পুরস্কার গ্রহণ কর।" প্রহরীকে শতমুদ্রা পুরস্কার দিয়া দলবলসহিত কুমার হরবিলাস বাহাদুর বাতুলালয় হইতে বহির্গত হইলেন। ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে যে সকল কার্য্য হইয়া গেল, কেহই কিছু বুঝিলেন না।

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে ভক্তগোপালের গৃহে মহা সমারোহ। আর কি এখন সমারোহ ভাল লাগে? সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই কুমার হরবিলাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ভক্তগোপালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ডাকের অশ্বারোহণে একাকী অমৃতসহর হইতে প্রস্থান করিলেন, আর কেহ জানিতে পারিলেন না।

সুখের দিন শীঘ্র শীঘ্র যায়। সুখের রাত্রি শীঘ্র শীঘ্র প্রভাত হয়। বিপদের দিন যায় যায়, যায় না; বিপদের রাত্রি পোহায় পোহায়, পোহায় না। কিন্তু পথে হরবিলাসের কত দিন, কত রাত্রি, কোথা দিয়া গেল, তিনি যেন তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি পথে।—এই সময়ে আমাদের একটী কথা।

যে সময়ের আখ্যায়িকা, সে সময় মোগলবংশের শেষ রাজত্ব। তখনও ভারতরাজ্যে পাগলা গারদ ছিল। যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সে সময় ভারতে ইংরাজের রাজত্ব। এ সময়েও রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে পাগ্‌লা গারদ আছে। ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দেয়, ইংরাজের সমস্তই ভাল। বৎসরে বৎসরে রাজ্যের বাতুলালয় সমূহের এক এক বিজ্ঞাপনী বাহির হয়। বিজ্ঞাপনী যেন একটী বৃক্ষ। তাহার গাত্রে লতা পাতা অনেক। বর্ষাকালে সেই সকল লতাপাতা বেশ মুঞ্জরিত হইয়া প্রফুল্ল হইয়া গজায়। কিসের জন্য কে পাগল, গণিতশাস্ত্রানুসারে ভগ্নাংশ সূত্রে বিজ্ঞাপনী তাহার প্রমাণ দেয়। কিন্তু পাগলেরা পাগলা গারদে কি

করে, অবিচ্ছেদে রাজ্যের লোকেরা তাহা জানিতে পারে না। উকীলেরা বলেন, "জেলখানায় যেমন কয়েদী খাটে, বাতুলালয়ের বাতুলেরা রাজ-পুরুষের ইচ্ছায় ডাক্তারসাহেবের হেপাজতে সেইরূপ কিম্বা তদপেক্ষা অধিকতর খাটুনী খাটিয়া প্রাণধারণ করে। তথাপি আরাম হয়। ভগ্নাংশ একটী বেশ কথা।—গাঁজায় শতকরা সত্তর, আফিঙে শতকরা পঞ্চাশ, মদে শতকরা ত্রিশ, টাকার শতকরা কুড়ী, প্রেমে শতকরা দশ,—আর আর কারণে গড়ে শতকরা পাঁচ। এই যে ভগ্নাংশ, ইহা ভারতবর্ষের লোকে গণনা করিয়া সহজে সূক্ষ্মরূপে ঠিক্ করিতে পারে না। কেন না, ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্র নাই। বিলাতের পূর্ব্বদিকে গণিতশাস্ত্র থাকিতে পারে না। কেবল গণিত কেন, কোন শাস্ত্রই থাকিতে পারে না।—হিন্দু-রাজত্ব ত অনেক দিন গিয়াছে। যবনের রাজত্ব সাতশত বৎসরের পূর্ব্বেই অতীত হইয়াছে। অসভ্যকাল এখন ভূতকালের গর্ভে। আর্য্যবর্ষে এখন সভ্য রাজার রাজত্ব।—এখনকার বিধিব্যবস্থা সমস্তই সভ্য।—আইন বল, আদালত বল, কারাগার বল, বাতুলালয় বল, দাতব্যালয় বল, সমস্তই সভ্য। যবনেরা এত সভ্যতা শিক্ষা করিতে পারেন নাই। তথাপি এখনকার বিলাতী ইতিহাসেরা বলে, আর্য্য অপেক্ষা যবন সভ্য, যবন অপেক্ষা ইংরাজ সভ্য। বিলাতী প্রসাদপ্রাপ্ত আর্য্যসন্তানের মুখে প্রতিধ্বনি হয়, তাহাই সত্য। কিন্তু আমাদের কথা এখন বাতুলালয়। মোগলের বাতুলালয়ের সঙ্গে সাহেবের বাতুলালয়ের তুলনা করিতে যদি কেহ সাহস করেন, আমরা তাঁহাকে আর এক সময়ে ধন্যবাদ দিয়া নমস্কার করিব।

কুমার হরবিলাস প্রয়াগে আসিয়াছেন। যাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। ভ্রমণের কি ফল, অন্বেষণের কি ফল, যাঁহার যাঁহার কাছে গোপন রাখিবার প্রয়োজন, তাঁহাদের কাছে গোপনে গোপনে যাঁহাদের কাছে সত্য প্রকাশের প্রয়োজন, গোপন ;—সেই সেই স্থলে প্রকাশ।

আবার পঞ্জাবে। কুমার হরবিলাস বাহাদুর সঙ্গিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া কত দিন পরে অমৃতসহরে উপস্থিত হইয়াছেন। অমৃতসহরের একটী নাম অমৃতসর, আর একটী নাম অমৃতনগর। আমাদের পুরাণ যদি সত্য

হয়, তাহা হইলে আমরা এই দুই নাম খারিজ করিয়া সংসারবাসিগণকে জানাইয়া দিব, মানুষ যেখানে মরে না, সেই স্থানের নাম অমৃতসহর বা অমরনগর। প্রাচীন সংস্কৃতভাষায় বুঝাইতে হইলে আমরা বলিব, পৃথিবীর অমরাবতী। এই অমরাবতীতে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিবস অনেকগুলি লোক একত্র। স্বর্গের যে অমরাবতীতে পৌরাণিক দেবতারা বাস করেন, সে অমরাবতী সাধারণ মানুষে দেখিতে পায় না। কিন্তু পৃথিবীর এই অমরাবতীতে অনেক লোক একত্র।

ইত্যগ্রে যিনি হরবিলাসকে অভ্যাগতরূপে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই ভক্তগোপাল সিংহ, আর যিনি বাতুলালয়ের ইতিহাস বর্ণন করেন, সেই বৃন্দাবনপল্লীও কুমার হরবিলাসের দলের সহিত যোগ দিলেন। সকলেই এক সঙ্গে বাতুলালয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রক্ষীবর্গপরিবেষ্টিত একজন অধ্যক্ষ, একজন দারোগা, আর একজন পরিদর্শক, সেই আগন্তুক-দিগকে প্রত্যেকে গৃহের দর্শনীয় বাতুল দেখাইতে চলিলেন। অন্যান্য বাতুলে তাঁহাদের তত প্রয়োজন ছিল না, তবে মনুষ্যমাত্রেই কৌতূহলের দাস। দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে, সুতরাং গমন করিতে করিতে তাঁহারা যাহা কিছু দেখিলেন, তাহার অধিকাংশই হাস্যজনক, দুঃখজনক, বীভৎস আর শোকাবহ। যাহাকে দর্শন করিবার আশা, তাহার গৃহসমীপে উপনীত হইয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। লোকটী অবিকল উল্লূকের ন্যায় রব করিয়া গৃহের ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান করিতেছিল। লোকগুলিকে দেখিয়া সে যেন কিছু ভয় পাইল। কেন, কে বলিতে পারে,—যাহাকে পাগ্‌লা গারদে রাখা হইয়াছে, সে যে ভয়-নির্ভয়ের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতে পারে, এমন ত প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু সেই লোকটা যেন কিছু ভয় পাইল।—চঞ্চল হইয়া লাফাইতেছিল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষু জবাবর্ণ। স্বাভাবিক চক্ষু অপেক্ষা তাহার চক্ষু যেন দুইগুণ বড় হইয়াছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে রুক্ষ রুক্ষ গোফ্‌দাঁড়ী, সর্ব্ব শরীরে ধূলাকাদা মাখা, পরিধান অত্যন্ত মলিন একখানা ছিন্ন বাস। সহসা দেখিলেই দুঃখের উদয় হয়। ভয়ও হয়।

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা কে কে, পাঠকমহাশয় হয় ত

অনুমানে অনেক দূর বুঝিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু বোধ হয়, সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। অতএব কিছু পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক হইল। প্রথম মহারাজ মহানন্দ রাও বাহাদুর, দ্বিতীয় রাজা রঘুবর রাও বাহাদুর ; তৃতীয় রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র রাও বাহাদুর ; চতুর্থ রাজকুমার হরবিলাস রাও বাহাদুর ; পঞ্চম শ্রীমতী যশেশ্বরী দেবী ; ষষ্ঠ শ্রীমতী রাণী বিরজাসুন্দরী ; সপ্তম শ্রীমতী রাণী মহালক্ষ্মী ঠাকুরাণী ; অষ্টম শ্রীমতী অপ্সরাসুন্দরী দেবী। নবম ভক্তগোপাল সিংহ, দশম বৃন্দাবনপন্থী।

আগন্তুক দর্শক এই দশজন স্ত্রীপুরুষ। মহারাজ মহানন্দ রাও অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা!"

এই সম্বোধন শ্রবণে বাতুলালয়ের অধ্যক্ষেরা চমকিত হইয়া উঠিলেন, পরিদর্শক মহাশয় সবিস্ময়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তি কি রাজা ছিল ? ইহার—"

"তোমরা চুপ্ কর!" প্রশ্নকর্ত্তাকে এইরূপে থামিতে বলিয়া পাগলকে সম্বোধনপূর্ব্বক মহারাজ মহানন্দ রাও পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা! এখানে তুমি কেমন আছ ? কত দিন এখানে আসিয়াছ ? আমাদের কি চিনিতে পার ? দিব্য বড় বড় চক্ষু হইয়াছে তোমার। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি, এই মেয়েটীকে কি চিনিতে পার ?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী নম্রমুখী অপ্সরাসুন্দরীর হস্তধারণ করিয়া কাট্‌গড়ার ঠিক্ সম্মুখভাগে দাঁড় করাইলেন। একটীবার মাত্র পাগল রাজার মুখের দিকে চাহিয়া নতমুখী আরও নতমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। পাগলের চক্ষে আর পলক পড়ে না। মহারাজ মহানন্দ রাও অপ্সরাসুন্দরীর চিবুকে হস্তার্পণপূর্ব্বক চন্দ্রবদনখানি উত্তোলন করিয়া আবার কহিলেন, "রাজা! দেখদেখি, এই চন্দ্রমুখ তোমার মনে পড়ে কি না ? এই কুমারীটীকে তুমি চিনিতে পার কি না ? ভাল করিয়া দেখ ; সকলের দিকে চাহিতে হইবে না। এই কুমারীটীকেই ভাল করিয়া দর্শন কর।"

পাগল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া কাটগড়ার প্রান্তভাগে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইল। অপ্সরাসুন্দরী সসম্ভ্রমে চারি পাঁচ পদ পশ্চাতে হটিয়া

দাঁড়াইলেন। পাগল আরও উচ্চহাস্য করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "চিনেছি!—ঐ!—ঐ—চিনেছি,—চিনেছি!—অপ্সরা—আমার অপ্সরা!—আঃ!—পালাস্ কেন মা! উঃ!—ওরা কারা? সব অপ্সরা!—এত অপ্সরা একত্র?—মা!—এক ছিলি, এত হলি কবে?"

পাগলের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া আবার কহিল, "মা! একবার কাছে আয়। গায়ে হাত দিয়া দেখি, গায়ে কি ধূলা লাগিয়াছে? অত ঢাকাঢোকা কেন মা? শীত করিতেছে কি? কাছে আয়। উঃ! এতগুলি অপ্সরা! আয় মা! ধূলা ঝাড়িয়া দিই।"

রোদনমুখী অপ্সরাসুন্দরী আশৈশব পালকপিতার এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া অতিশয় কাতরা হইলেন। বসনাঞ্চলে পুনঃপুন নেত্রমার্জ্জন করিয়াও অশ্রুবেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না। সজল নয়নে, বাষ্প-নিরুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "পিতা! অভাগিনীকে এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিতে হইবে, ইহা ত একদিনও মনে ভাবি নাই। পিতা! কে তোমার এমন অবস্থা করিল পিতা?"

অপ্সরাসুন্দরী আর কথা কহিতে পারিলেন না। কণ্ঠবাষ্প, নেত্রবাষ্প, যেন তাঁহার রসনাকে শুষ্ক করিয়া দিয়া বাক্‌শক্তি হরণ করিল।

পাগল আবার বালকের মত হাস্য করিতে লাগিল। অপ্সরাসুন্দরীকে পশ্চাতে রাখিয়া ভূপেশচন্দ্র সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। যে সময়ের যেমন উচিত ব্যবহার, ভূপেশচন্দ্রের তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না। মিষ্ট মিষ্ট বাক্যে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমাকে কি চিনিতে পারেন? আমি আপনার অন্নে লালিত পালিত। আপনার অনুগ্রহের অভাবেই আমার যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ। চাহিয়া দেখুন, আমাকে কি চিনিতে পারেন?"

"কেন মা তুই অমন কথা বলিতেছিস্? প্রাণ আমার ধড়্ফড়্ করিতেছে। অপ্সরা! আঃ! এ নাম আর শুনিতে পাইব, ও মুখ আর দেখিতে পাইব, আশা ছিল না। তুই মা রকম রকম সাজ সাজিয়া আসিতেছিস্! এমন বহুরূপীর সাজ কে তোরে শিখাইয়া দিল মা? বেশ করিয়াছিস্। নূতন নূতন সাজ দেখিলে সে আর তোরে চিনিতে পারিবে না।

তাহাকে ত ভুলিয়া গিয়াছিস্? কি নাম সেটার?—এখন আয় মা! ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আয়! ভুপ—ভুপ—উঃ! নামটা শুনিলেও মাথায় আগুন জ্বলে। ঐ গেল! ঐ গেল!—মাথা জ্বলিয়া গেল! দেখ্! দেখ্! ধর্! ধর্! আগুন নিবাইয়া দে! অপ্সরা! তোর কি মনে আছে মা? এক লক্ষ টাকা! ঐ যেন আমার চক্ষের কাছে চক্ চক্ করিতেছে, এক লক্ষ টাকা! কৈ মা তুই? আর যে দেখিতে পাইতেছি না। আবার বুঝি পলাইয়া গেলি?—সেই শেয়ালের সঙ্গে আবার বুঝি পলাইয়া গেলি? রাণী কোথায়? আমার জগৎকুমারী কোথায় গেল? আয় মা! তোরা দুজনে আয়! স্বর্গভূষণ কোথায় গেল? ঐ বুঝি! কে ওখানে দাঁড়াইয়া? ওখানে কাঁদে কে?"

পাগল এই কথাটী ঠিক বলিল। স্বর্গভূষণের নাম শুনিয়া রাজা রঘুবর রাও নয়নে হস্তাবরণ দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। রাণী মহালক্ষ্মী পুত্র-শোকে কাতরা হইয়া অনর্গল নেত্রজল নিক্ষেপ করিতেছেন। পাগলের সম্মুখে তাঁহারা দর্শন দিলেন না। পঞ্জাবীরা কিছুই জানেন না, তাঁহারা সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কুমার হরবিলাস, রাণী বিরজাসুন্দরী, আর শ্রীমতী যশেশ্বরী দেবী, দুটী একটী কথা কহিয়াছিলেন, পূর্ব্বের অনেক কথা মনে করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। পাগল কিছুই বুঝিল না।—গম্ভীর হইয়া গম্ভীরে কহিল, "তোমরা কারা গা?—আমার উকীল বুঝি?—বেশ করিয়াছ!—মকদ্দমার কি হইল?—কম নয়;—বিশ হা—জা—র!—আমার কি জিত হইয়াছে?—না,—তোমরা উকীল নও;—তোমরাও আমার অপ্সরা।—এত অপ্সরা এত দিন কোথায় ছিল? আমার চক্ষে ঝাঁঝ্‌রি বসিয়াছে, পুরু পুরু জাল পড়িয়াছে, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আয় মা! আমার চক্ষের জালগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দে!—আমি মরি! আমারে এ অবস্থায় ফেলিয়া তুই মা কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া আছিস্!—না,—আমি বাঁচিব না!—না বাঁচাই আমার পক্ষে ভাল!—আমি ত মরিয়াছি!—মরার সময় অপ্সরা আসিয়াছে!—বাঃ!—হাঃ হাঃ হা!—এইবার বুঝি স্বর্গভূষণ হারিয়াছে। বি—শ—হা—জা—র!—না,—আর আমার টাকায় কি হইবে?—জগৎকুমারী রাক্ষসী!—জগৎকুমারী যে পথে গিয়াছে, বিশ হাজার টাকাও

আত্মার সেই পথ ধরুক!—আমার সর্ব্বেশ্বরী জগৎকুমারী যে পথে গিয়াছে, বিশ হাজার টাকাও সেই পথে চলুক!”

মাথা হেঁট করিয়া রঘুবর রাও দুইবার তিনবার বিশালনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কৃপণ পাঠকেরা জানেন, পুত্রশোক অপেক্ষা টাকার শোক বেশী। স্বর্গভূষণ মরিয়াছে, তাহাতে বেশী শোক হয় নাই, কিন্তু মোকদ্দমায় বিশ হাজার টাকা দাবী। ফরিয়াদী পাগল হইয়াও বাঁচিয়া আছে। আরাম হইলেই দিতে হইবে, এই শোক রঘুবরের বড় শোক।—মোগলরাজ্যের শেষ দশার হাকিম।—বর্ষাকালের মেঘশূন্য অপরাহ্নের সূর্য্য।—বড় জালা দেয়। হাকিমেরা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া কতদিন হুকুম জারী করেন নাই। প্রতিবাদী মরিয়াছে, তথাপি বাতুলালয়ে সেই মোকদ্দমার কথা। যাহাদের জীবন আছে, যাহাদের জীবনীশক্তি আছে, তাহারা বোধ হয় ইহা ধারণা করিতে পারে। কিন্তু পাগলের জীবন এক প্রকারে কামারের জাঁতা। নিশ্বাসপ্রশ্বাস আছে, কিন্তু জীবনীশক্তি নাই। পাগলটা মুখে হাত ঢাকা দিল, চক্ষে হাত ঢাকা দিল, ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিল, আর কথা কহিল না। কহিবার শক্তি থাকিলে কহিতে পারিত, কিন্তু সে শক্তি তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। চক্ষু কেবল চক্ষের শক্তি দেখাইল, তাহাও ভুল। কর্ণ কেবল শ্রবণশক্তি শুনাইল, তাহাও কেবল ভ্রান্তি। পাগল কি দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কেবল পাগল জানে; কি বলিতেছে, পাগলের রসনাই তাহা জানে। যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহারা গোলমাল করিয়া আপনারাই সকল কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। অধ্যক্ষ, দারোগা, পরিদর্শক, তিন জনেই বিস্ময়ে বিস্ময়ে চমকিত। কিছুই বুঝিতেছেন না, কিছুই বুঝিলেন না, কিছুই বুঝিবেন না, তথাপি হাকিমের নামে জোর আছে। হুকুমের স্বরে পরিদর্শক কহিলেন, “তোমরা সকলে সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াও। এ পাগল তোমাদের কি কাহাদের, তাহা আমি দেখিব।”

মহারাজ মহানন্দ রাও সেই কথায় অপমান জ্ঞান করিয়া আজ্ঞাকর্ত্তাকে কহিলেন, “তোমরা চুপ্ করিয়া থাক। যাহা দেখিতেছ, দেখ, যাহা শুনিতেছ শোন, কথার উপর কথা কহিলে এক এক কশাঘাতে তোমাদের হাকিমত্ব দূর করিয়া দিব।”

যেখানে যাহাদের ক্ষমতা চলে, সেখানে তাহারা রাজার অপেক্ষাও প্রবল। আজমের কর্ত্তারা ক্ষেপিয়া উঠিলেন। অপমানের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ক্রোধরিপু প্রবল হইল। এ সকল লোকের সঙ্গে অবশ্যই অস্ত্র থাকে, অস্ত্র বাহির করিয়া তাঁহারা খুনোখুনি করিবার উপক্রম করিলেন।

হা ক্ষত্রিয়বীর্য্য! নিস্তেজ হইয়া তুমি এখন কোথায় লুকাইয়া গিয়াছ? এক সময় ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে বীর্য্য ব্রহ্মবীর্য্য হইলেও ক্ষত্রিয়বীর্য্য। এক সময়ে সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ফলমূলাশী বনবাসী হইলেও সে বীর্য্য ক্ষত্রিয়বীর্য্য। এক সময়ে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রাজ্যহীন, বন্ধুহীন হইলেও সে বীর্য্য ক্ষত্রিয়বীর্য্য। এখনও ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়জাতি আছে, কিন্তু সে বীর্য্য কোথায় লুকাইয়া গেল? চক্ষের নিকটে খেলা করিতে করিতে কোথায় বিলুপ্ত হইল? এখন এক বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ, এক দারোগা, এক পরিদর্শক, (মশা, মাছী টিক্‌টিকী) ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া ক্ষত্রিয়রাজকুমারগণের সম্মুখে বীরদর্প প্রকাশ করে, ইহা অসহ্য।

কিন্তু কেন করিবে না? ক্ষত্রিয়সন্তানেরা যবনের দাস হইয়াছে। মোগলবংশের উজ্জ্বল রত্ন আক্‌বর সাহ নাই, সাধুশান্ত জাঁহাগীর শাহ নাই, সন্ধিশান্তিপ্রিয় সাহজাঁহা নাই, মহাপ্রাজ্ঞ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আলম্‌গীর ঔরঙ্গজেব যমালয়ে গমন করিয়াছেন, এখন আছে কাহারা? ইঁদুর, বাঁদর, নকুল, আর ছুঁচো। ইহাদের প্রতাপে বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়সন্তানেরা গাধা হইয়া গিয়াছে। বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়সন্তানগণকে অপমান করিতেছে কাহারা?—কতদূর ক্ষমতা প্রাপ্ত পাগ্‌লাগারদের রক্ষাকারী প্রহরীরা।—সূর্য্যতাপ সহ্য হয়, সাধারণ কথাই আছে, সূর্য্যকিরণে তপ্ত হয় যে বালী, তাহার উত্তাপ সহ্য হয় না।

কুমার হরবিলাস সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "আমাদের কথা আমরা কহিতেছি, এ কথার উপর কথা কহিবার তোমরা কে? যদি রাজক্ষমতা ধারণ কর, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। দর্প দেখাইলে এক দণ্ডেই সে দর্প আমি চূর্ণ করিয়া ফেলিব। যদি প্রাণের ভয় রাখ, সে দিন বলিয়া গিয়াছি, আজিও বলিতেছি, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। আমাদের

পাগল, আমরা লইয়া যাইব। জোর করিলে নিস্তার পাইবে না। অনেক কথা শুনিবার আছে, অনেক কথা বলিবার আছে, অনেক কথা জানিবার আছে, তফাতে থাকিয়া শ্রবণ কর। নিকটে আসিও না, গর্জ্জন করিও না, বাধা দিও না, ঠুস্ করিয়া মারা যাইবে। মোগলকে আমরা এখনও মান্য করি, তোমরা মোগলের দাস; যদি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের উপর কর্তৃত্ব দেখাইতে চাও, তরবারিধারী ক্ষত্রিয়ের তরবারি হইতে সতর্ক থাক।"

"অপ্সরা!—অপ্সরা, তুই মা কি কথা কহিতেছিস্? ইহারা কি কথা কহিতেছে? রাজা! রাজা!—কাহারা রাজা?—আঃ! চক্ষু আমার এত ঘুরিতেছে কেন?—চুল আমার এত বড় বড় হইয়া চক্ষের উপর পড়িতেছে কেন?—তুই বুঝি এলি?—স্বর্গভূষণ! আমার জগৎকুমারী কোথায়?—হাঁ! হাঁ! মনে হইয়াছে।—মন! কোথায় তুমি? না ত!—মনে ত হয় না! আমার মন বুকের ভিতর লুকাইয়া গিয়াছে!—আমার মন আমার অপ্সরাকে খুঁজিবার জন্য খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে!—ঘরগুলা ফার্ফোর্!—এ কোথাকার আলো?"—এইরূপ অনেক প্রকার ছড়িভঙ্গ কথা বলিতে বলিতে পাগল রাজা যেন চর্কীবাজীর মত কাট্‌গড়ার মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন।

"রাজা! এত অস্থির হইতেছ কেন? আমরা সকলেই তোমার কাছে রহিয়াছি। সে দিন আমাকে দেখিয়াছ, অপ্সরা বলিয়া ভ্রান্তি হইয়াছিল, আজও দেখিতেছি, সেই ভ্রান্তি। মহারাজ! তোমার অভাব কিসের? তোমার কি নাই? সংসারে যাহা যাহা থাকিতে হয়, যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্তই তোমার আছে।"

"আছে?—আছে অপ্সরা?"—কুমার হরবিলাসের শান্তকথাগুলি শুনিয়া পাগল যেন লাফাইয়া উঠিল। উদাসভাবে হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আছে অপ্সরা?"—বক্ষে করাঘাত করিয়া পুনরায় কহিল, "হায় হায় হায়!—আমার আর কি আছে?—হায়, হায়, হায়!—পৃথিবী অন্ধকার হইয়াছে! অন্ধকারের ভিতর একটী আলো জ্বলিতেছিল,—তুই মা কি দেখিতেছিস্?—কেমন সুন্দর আলো!—আলোটাও যেন বহুরূপী।—

এই দেখি নীল, ঐ দেখি সবুজ, আবার দেখি রাঙা—এই দেখি শাদা, ঐ দেখি কালো!—হা, হা, হা!—আলো কি কখনো কালো হয়?—অপ্সরা! তুই মা একটু দাঁড়া।—ঐ কালো আলোতে তোকে রাখিয়া আমি একবার হাততালি দিয়া নাচি।"

সত্য সত্য পাগল রাজা নৃত্য করিতে লাগিল। যাঁহারা দর্শক, অন্য সময় হইলে তাঁহারা কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যেরূপ শোচনীয় দৃশ্য, তাহাতে কেবল নিঃসম্পর্কীয় লোকেরা ছাড়া সকলের মনেই দুঃখের উদয় হইল। সকলের মুখেই হাস্যের পরিবর্ত্তে বিষাদচিহ্ন দেখা দিল। অন্য লোকেরা অন্য দিকে মুখ করিয়া নীরবে মৃদুহাস্য করিল। তাহারা কে? ভক্তগোপাল, বৃন্দাবন, আর গারদের হুজুরী লোক।

পাগল নৃত্য করিতেছে। উন্মত্তভাবে আপনা আপনি কহিতেছে, "বাঃ! দর্জ্জীটা কি দুষ্ট! আমি এত পরিশ্রম করিয়া কাপড়খানি বুনিলাম, হাঃ হাঃ হা! তাঁতি আমি।—এত পরিশ্রমে কাপড়খানি তৈয়ারি করিলাম, বেটা কি না আমারই মুখের কাছে পাঁই পাঁই করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল!—কোথায় গেল অপ্‌সরা,—কোথায় গেল স্বর্গভূষণ,—কোথায় গেল জগৎকুমারী!—পাতা কুড়াইয়া জড় করিয়াছিলাম, আগুন পোহাইতে পাইলাম না! হায়! হায়! হায়! আমার কি দশাই হইল!"

যদিও পাগলের কথা, তথাপি কথার কিছু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সকলে সে তাৎপর্য্য বুঝিলেন না। বিস্ময়স্তম্ভিত নয়নে সকলেই পাগলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজা মহানন্দ রাও অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন। দূরে দেখিলেন, একটী লোক স্ত্রীলোকের মত ঘোম্‌টা দিয়া অতি ধীর মৃদুপদে দূরের একটী কাট্‌গড়ার নিকটে পরিক্রমণ করিতেছে। এক একবার সেই লোকবেষ্টিত কাট্‌গড়ার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। যিনি তাহাকে দেখিতেছেন, তাঁহার গা কাঁপিতেছে। বদন অনাবৃত না থাকিলেও, কোন গতিকে,—কোন লক্ষণে,—তিনি যেন তাহাকে চিনিতেছেন। পিতামহীঠাকুরাণীরা রাত্রিকালে ত্রিপান্তর মাঠের যে সকল আলেয়া ভূতের গল্প করেন, সেই মুখঢাকা লোক সেইরূপে এক একবার

মুখ খানি খুলিয়া আবার তখনি তখনি ঢাকা দিয়া ফেলিতেছে। যে বস্ত্রের অবগুণ্ঠন; সে বস্ত্র কালীবর্ণ। রাজা মহানন্দ রাও ভিন্ন আর কেহ তখন সে দিকে চাহেন নাই। হঠাৎ ভূপেশচন্দ্রের চক্ষু সেই দিকে বিনিক্ষিপ্ত হইল। কেবল সেই দিকে নয়, একবার সেই দিকে, একবার পিতার নয়নের দিকে।—দেখিলেন যেন, আকাশের উত্তর দিক,—আকাশের উত্তর-তারা। সেই লোকের অবয়ব আর মহারাজ মহানন্দের নয়ন যেন সমসূত্রে গাঁথা। কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহার কটিবন্ধের তরবারি তখন কোষমুক্ত ছিল না। কোষাবৃত তীক্ষ্ণাস্ত্রের মূলভাগ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া তিনি চঞ্চলপদে সেই লোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর নাই!—যে লোক তত মৃদুগতিতে ভ্রমণ করিতেছিল, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে সেই লোক সে স্থান হইতে বাহির হইয়া গেল। কোথায় গেল, কিছুই জানা গেল না। এ কি কোন দৈবমায়া? কিম্বা ভোজরাজের কোন ইন্দ্রজাল? ইন্দ্রজাল-মায়াপ্রভাবে যেন সেই লোক কোথায় উবিয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার কাণে কাণে চুপি চুপি কহিলেন, "মহারাজ! লোকটাকে যেন আমি চিনি চিনি করিলাম।"

রাজাও সেইরূপ চুপি চুপি কাণে কাণে কহিলেন, "আমিও যেন চিনিয়াছি।"

পিতাপুত্রের এই গুপ্ত কথোপকথন আর কেহই শুনিতে পাইলেন না। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল, কিম্বা তাহা অপেক্ষা আরও বেশীক্ষণ সকলের মৌন-ভাবে অতিবাহিত হইল। যেদিকে সেই অবগুণ্ঠনাবৃত নূতন লোক পাই-চারী করিতেছিল, পুতুলের ঝাঁকের মত সেই দিকে আর কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ আসিয়া জড় হইল। ঝাঁকের মধ্যেই সেই লোক। কারা এরা? ভাল করিয়া মুখ না দেখিলে চিনিতে পারা দুর্ঘট। আলয়ের পরিদর্শক, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই দিকে গমন করিলেন। কেন তাহারা, কে তাহারা, কাহার অনুমতিতে কেন প্রবেশ করিয়াছে, হুজুরী স্বরে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তর পাইলেন না। যাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাসা, তাঁহাদের মধ্যে একজন বীরদর্পে সেই পরিদর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীমবজ্রস্বরে কহিলেন, "লেকায়েৎ খাঁ! তুমি এখানে কত দিন?

হুসেন! এ নাম আমার কর্ণে যেন শূল বিদ্ধ করে। যতদিন তুই লিঙ্গেশ্বর, ছিলি, ততদিন আমি তোরে মশামাছীর মত টিপিয়া মারিতে পারিতাম। এখন তোরে সংহার করিতে অস্ত্র প্রয়োজন হইবে। সেই দস্যু বিতাস্থ আর তুই লিঙ্গেশ্বর, তোরা উভয়েই পাঠান। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কতক কতক আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু বল অপেক্ষা স্থান প্রধান। তোরা স্থানে ছিলি। যদিও মোগলসূর্য্য কালের গতিকে জোনাকী হইয়া আসিয়াছে, তথাপি দেশের রাজা। রাজার লোককে আমরা শীঘ্র অস্ত্রাঘাত করি না। কিন্তু এখন?—এখন তোকে কে রক্ষা করে? দলবল ত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তুই লেকায়েৎ, এই বাতুলালয়ের পরিদর্শক হইয়াছিস্, আর ঐ মায়াভূত হনূমন্ত সিংহ অধ্যক্ষ সাজিয়াছে। আর ঐ পাপিষ্ঠ শূকরের বাচ্ছা, আনোয়ার বখ্ত দারোগা হইয়াছে। আমি সব জানি; আমার হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। পৃথিবী যদি মহাপ্রলয়ে প্রলয়সাগরে ডুবিয়া যায়, ক্ষুদ্র মক্ষিকা যদি হিমালয়পর্ব্বতকে উড়াইয়া লইয়া যায়, ক্ষুদ্র চটকপক্ষী যদি মহাজলধির অনন্ত বারি এক চুমুকে শুষিয়া খায়, পূর্ব্ব দিকের প্রভাকর যদি কখনও পশ্চিমে উদয় হয়, জোনাকী পোকা যদ্যপি কখনও চন্দ্রমার দীপ্তি ধারণ করে, হরিদ্রার চারুবর্ণ যদি কখনও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তথাপি,—তথাপি লেকায়ৎ! আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে না।। তুই আমাদের ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস্? কুকুরের দাঁত দেখিয়া ক্ষত্রিয়-কুমার ভয় করে না।”

দূরে এইরূপ কাণ্ড হইতেছে, দূরে দাঁড়াইয়া কুমার হরবিলাসের দল তাহা দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন। কুমার ভূপেশচন্দ্র বীরবেশে দণ্ডায়মান। কেহ যেন কাহাকেও চিনিত না, সেই ভাবে মুখামুখী করিয়া দুই দল একত্র হইল। ইহা ত রণক্ষেত্র নহে। যোদ্ধা আছে, বীর আছে, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র আছে, বেশী কথা বলিব কি, স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহা ত রণভূমি নহে;—তবে কি?

পুরাতন দলে যাঁহারা আসিয়াছেন, পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নূতন দলে কাহারা? যিনি পুরোবর্ত্তী হইয়া কথা কহিলেন, তিনি কে? যাহারা মুসলমানের চাকর, তাহাদের ত সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেল। তাহাদের

"যতদূর বীর্য্য, তাহাও ত বুঝা গেল। তিন জনেই সমান। একজন লিজেশ্বর, দ্বিতীয় নামে লেকায়েৎ খাঁ। একজন আনোয়ার, দ্বিতীয় পদে নূতন দারোগা। একজন হনুমন্ত সিংহ, দ্বিতীয় পদে গারদের অধ্যক্ষ। বাপ্ পরপাঁও, মা লঙ্কা!—থাক্ তারা।

নূতন দলে কাহারা? যিনি সম্মুখে, তিনি নূতন। আমরা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ জোরে জোরে কথা কহিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হইবেন। নিকটে অগ্রসর হইয়া তিনি আবার কহিলেন, "হনুমন্ত সিংহ! আনোয়ার বখ্ত! লেকায়ৎ খাঁ! এখনও মিষ্টবাক্যে বলিতেছি, তোমরা সরিয়া যাও। প্রাণে বাঁচিবার যদি সাধ থাকে, পলায়ন কর। আমাদের কথা যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে, দূরে দাঁড়াইয়া শ্রবণ কর। কথা কহিও না। গোঁপদাড়ী নাড়িয়া হাকিমত্ব দেখাইতে আসিও না। টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া কাটিয়া ফেলিব। মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা তোমরা কিছুই জান না।—জান কেবল ভূপেশচন্দ্রকে পদে পদে বিপদস্থ করিতে, জান কেবল পদে পদে যন্ত্রণা দিতে,—জান কেবল পদে পদে দগ্ধ করিতে,—জান কেবল পদে পদে উৎপীড়ন করিতে, জান কেবল প্রাণবিনাশে সংকল্প করিতে! কিন্তু এখন ত আর সে দিন নাই। এখন ত ভূপেশচন্দ্র নিঃসহায় নহেন।—ভাব, যদি তাহাই হয়, তাহাতেই বা কি? ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়।—প্রকৃতির গাত্রে গাত্রে লেখা আছে, ধর্ম্মের জয়।—নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। ভাব তোমরা, ভূপেশচন্দ্র একাকী, হানো অস্ত্র তাঁহার শরীরে। কিন্তু একা ভূপেশচন্দ্র যাহা করিতে পারেন, তোমাদের মত শত শত কাপুরুষ তাহা করিতে পারে না। আমরা তাঁহার সহায় আছি।—মহারাজ!"—মহারাজ মহানন্দ রাওকে সম্বোধন করিয়া নূতন বীরপুরুষ কহিলেন, "মহারাজ! চিনিতে পারুন, আর নাই পারুন, বিপক্ষবিনাশে অনুমতি দান করুন।—চিনিতে পারিবেন কি? আমি বিশ্বেশদয়াল।"

কতদিনের কত কথা মনে করিয়া মহারাজ মহানন্দ রাও বাক্‌শূন্য হইলেন। ঘোম্‌টা ঢাকা লোকটী সম্মুখে আসিয়া কহিল, "রাজা! সব ত ঠিক্ ঠাক্ হইয়াছে, এখন আর কেন?—আমাকে কি চিনিতে পার?

এই আমি ঘোম্‌টা খুলিলাম। দেখ! আর আমার ঘোম্‌টায় প্রয়োজন নাই। দেখ! চিনিতে কি পার?"

মহানন্দ রাও সবিস্ময়ে চাহিয়া সেই লোকটীকে চিনিলেন। ভূপেশচন্দ্র চিনিলেন, রাজা রঘুবর চিনিলেন, রাণী যশেশ্বরী চিনিলেন, আর আর যাঁহাদের চিনিতে পারা সম্ভব, তাঁহারাও চিনিলেন। কিন্তু কেহই কথা কহিলেন না। পাগল কেবল হাসিতেছে, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতেছে। হাসিতেছে আর নাচিতেছে। অপসরাসুন্দরী নিকটে গিয়া কহিলেন, "পিতা! আমি আর এখানে দাঁড়াইতে পারিতেছি না। অনেক লোক আসিয়াছে। তুমি আমারে বর্জ্জন করিয়াছ, ত্যজ্য কন্যা করিয়াছ, তাই ভাল! আমি এখন—"

কথা শেষ হইবার অগ্রে সেই ঘোম্‌টাঢাকা লোক ঘোম্‌টা খুলিয়া ভূপেশচন্দ্রের নিকটে হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। কি যেন বলিবে, অনুমতি চাহিল। ভূপেশচন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া তলোয়ারখানি লুকাইলেন। সম্ভ্রমের স্বরে কহিলেন, "চতুর্ভুজ! তুমি আসিয়াছ? তবে আর—"

"না! আমি আসি নাই। অনেক লোক আসিয়াছে। রাজপুত্র! সংসারসাগরের প্রিয়রত্ন। অস্ত্রধারী হইয়া দাঁড়াও! যাহারা আসিয়াছে, তাহারা তোমার শত্রু কি মিত্র, তাহা আমার জানা নাই।"

এ কথা শুনিলে অন্য লোকের মনে, অন্য লোকের প্রাণে বিস্তর ভয় আসিতে পারিত, কিন্তু যাঁহার সঙ্গে কথা হইল, তিনি ভয়কে বড় ভয় করেন না, বরং ভয় তাঁহাকে ভয় করে। মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "নাম লুকাইয়া সংসারে তুমি কত দিন বিচরণ করিতে ইচ্ছা কর সাধু? আমি অপরিচিত, বিদেশী, দীনহীন দরিদ্র; তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব সম্ভবে না; আমীর ওমরাহ, রাজা, মহারাজ, ইহাঁরাই তোমার সমকক্ষ কিম্বা আর কিছু হইতে পারেন। রাজা রঘুবর রাও তোমার মুরুব্বি হইতে পারেন। আমি কে?—কিন্তু চতুর্ভুজ! তোমার অন্য নাম আমি জানি না, সুতরাং অপরাধী হইলেও ঐ নামে সম্ভাষণ করি;—কিন্তু একটী কথা। বিশ্বেশদয়াল,—যে বালক আপনাকে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া আমার সম্মুখে,—এই সকল রাজার সম্মুখে,—আমার পরমপ্রিয়তম ভ্রাতা হরবিলাসের সম্মুখে

"যতদূর বীর্য্য, তাহাও ত বুঝা গেল। তিন জনেই সমান। একজন লিঙ্গেশ্বর, দ্বিতীয় নামে লেকায়েৎ খাঁ। একজন আনোয়ার, দ্বিতীয় পদে নূতন দারোগা। একজন হনুমন্ত সিংহ, দ্বিতীয় পদে গারদের অধ্যক্ষ। বাপ্ পরপাঁও, মা লক্ষা!—থাক্ তারা।

নূতন দলে কাহারা? যিনি সম্মুখে, তিনি নূতন। আমরা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ জোরে জোরে কথা কহিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হইবেন। নিকটে অগ্রসর হইয়া তিনি আবার কহিলেন, "হনুমন্ত সিংহ! আনোয়ার বখ্‌ত! লেকায়ৎ খাঁ! এখনও মিষ্টবাক্যে বলিতেছি, তোমরা সরিয়া যাও। প্রাণে বাঁচিবার যদি সাধ থাকে, পলায়ন কর। আমাদের কথা যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে, দূরে দাঁড়াইয়া শ্রবণ কর। কথা কহিও না। গোঁপদাড়ী নাড়িয়া হাকিমত্ব দেখাইতে আসিও না। টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া কাটিয়া ফেলিব। মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা তোমরা কিছুই জান না।—জান কেবল ভূপেশচন্দ্রকে পদে পদে বিপদস্থ করিতে, জান কেবল পদে পদে যন্ত্রণা দিতে,—জান কেবল পদে পদে দগ্ধ করিতে,—জান কেবল পদে পদে উৎপীড়ন করিতে, জান কেবল প্রাণবিনাশে সংকল্প করিতে। কিন্তু এখন ত আর সে দিন নাই। এখন ত ভূপেশচন্দ্র নিঃসহায় নহেন।—ভাব, যদি তাহাই হয়, তাহাতেই বা কি? ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়।—প্রকৃতির গাত্রে গাত্রে লেখা আছে, ধর্ম্মের জয়।—নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। ভাব তোমরা, ভূপেশচন্দ্র একাকী, হানো অস্ত্র তাঁহার শরীরে। কিন্তু একা ভূপেশচন্দ্র যাহা করিতে পারেন, তোমাদের মত শত শত কাপুরুষ তাহা করিতে পারে না। আমরা তাঁহার সহায় আছি।—মহারাজ!"—মহারাজ মহানন্দ রাওকে সম্বোধন করিয়া নূতন বীরপুরুষ কহিলেন, "মহারাজ! চিনিতে পারুন, আর নাই পারুন, বিপক্ষবিনাশে অনুমতি দান করুন।—চিনিতে পারিবেন কি? আমি বিশ্বেশদয়াল।"

কতদিনের কত কথা মনে করিয়া মহারাজ মহানন্দ রাও বাক্‌শূন্য হইলেন। ঘোম্‌টা ঢাকা লোকটী সম্মুখে আসিয়া কহিল, "রাজা! সব ত ঠিক্ ঠাক্ হইয়াছে, এখন আর কেন?—আমাকে কি চিনিতে পার?

এই আমি ঘোম্‌টা খুলিলাম। দেখ! আর আমার ঘোম্‌টায় প্রয়োজন নাই। দেখ! চিনিতে কি পার?"

মহানন্দ রাও সবিস্ময়ে চাহিয়া সেই লোকটীকে চিনিলেন। ভূপেশচন্দ্র চিনিলেন, রাজা রঘুবর চিনিলেন, রাণী যশেশ্বরী চিনিলেন, আর আর যাঁহাদের চিনিতে পারা সম্ভব, তাঁহারাও চিনিলেন। কিন্তু কেহই কথা কহিলেন না। পাগল কেবল হাসিতেছে, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতেছে। হাসিতেছে আর নাচিতেছে। অপ্‌সরাসুন্দরী নিকটে গিয়া কহিলেন, "পিতা! আমি আর এখানে দাঁড়াইতে পারিতেছি না। অনেক লোক আসিয়াছে। তুমি আমারে বর্জ্জন করিয়াছ, ত্যজ্য কন্যা করিয়াছ, তাই ভাল! আমি এখন—"

কথা শেষ হইবার অগ্রে সেই ঘোম্‌টাঢাকা লোক ঘোম্‌টা খুলিয়া ভূপেশচন্দ্রের নিকটে হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। কি যেন বলিবে, অনুমতি চাহিল। ভূপেশচন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া তলোয়ারখানি লুকাইলেন। সম্ভ্রমের স্বরে কহিলেন, "চতুর্ভুজ! তুমি আসিয়াছ? তবে আর—"

"না! আমি আসি নাই। অনেক লোক আসিয়াছে। রাজপুত্র! সংসারসাগরের প্রিয়রত্ন। অস্ত্রধারী হইয়া দাঁড়াও! যাহারা আসিয়াছে, তাহারা তোমার শত্রু কি মিত্র, তাহা আমার জানা নাই।"

এ কথা শুনিলে অন্য লোকের মনে, অন্য লোকের প্রাণে বিস্তর ভয় আসিতে পারিত, কিন্তু যাঁহার সঙ্গে কথা হইল, তিনি ভয়কে বড় ভয় করেন না, বরং ভয় তাঁহাকে ভয় করে। মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "নাম লুকাইয়া সংসারে তুমি কত দিন বিচরণ করিতে ইচ্ছা কর সাধু? আমি অপরিচিত, বিদেশী, দীনহীন দরিদ্র; তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব সম্ভবে না; আমীর ওমরাহ, রাজা, মহারাজ, ইহাঁরাই তোমার সমকক্ষ কিম্বা আর কিছু হইতে পারেন। রাজা রঘুবর রাও তোমার মুরুব্বি হইতে পারেন। আমি কে?—কিন্তু চতুর্ভুজ! তোমার অন্য নাম আমি জানি না, সুতরাং অপরাধী হইলেও ঐ নামে সম্ভাষণ করি;—কিন্তু একটী কথা। বিশ্বেশদয়াল,—যে বালক আপনাকে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া আমার সম্মুখে,—এই সকল রাজার সম্মুখে,—আমার পরমপ্রিয়তম ভ্রাতা হরবিলাসের সম্মুখে

এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—যাহাকে দেখিয়া আমার হস্তের তরবারি ভূমির দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে, তুমি মাননীয় চতুর্ভুজ! জান তুমি সব, পরিচয় দিয়া দাও, বল, ঐ বালকটী কে?"

একটু হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "আমি পরিচয় দিয়া দিতে জানি না। বালক এখনই আপনার পরিচয় আপনি দিয়া দিবে।"—আবার হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "আমরা ছাড়া তোমরা এখানে কে আছ? তফাৎ হও, দরজা বন্ধ কর,—সমস্ত দরজা বন্ধ কর। অধ্যক্ষ হও, দারোগা হও, পরিদর্শক হও, গ্রাহ্য করি না। ভাল ফাঁদ পাতিয়াছিলে, ভাল ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়াছিলে, কিন্তু জান? যাহারা কখনও কোন অপরাধ করে নাই, তাহাদিগকে কেহই অবরুদ্ধ করিতে পারে না। জীবন থাকিতে যমরাজও পারেন না। পাপী লোকেরা সরিয়া যাও। দরজা বন্ধ কর।"

হাকিমের লোকেরা কথা শুনিল না।—ভূপেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন," রাজকুমার! তোমার অস্ত্রধারী নাম বৃথা। যাহারা গোলামের গোলাম, একদিন তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে, আজিও এখনও অগ্রাহ্য করিতেছে, এখনও কি দিন ফিরিয়া আসিতেছে না? সূর্য্য তোমাকে চিনিয়াছেন। প্রচণ্ডকরে তখনও তোমাকে দগ্ধ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা কি তুমি জান?—বড় অন্ধকার! তত অন্ধকারে চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু এখন ত মেঘ নাই। যদি দিন ভাব, সূর্য্য আছেন, যদি রাত্রি ভাব, চন্দ্র আছেন। আলো দেখিতেছি, কিসের আলো রাজকুমার? আচ্ছা! জবা-কুসুম সঙ্কাশম্। সূর্য্যদেবকে নমস্কার! হিমকুন্দতুষারাভম্! শশিদেবকে নমস্কার! তাঁহারা প্রসন্ন হইবেন, আলো দেখাইয়া দিবেন, অন্ধকারেও আমরা আলো দেখিতে পাইব। দিন ত নাই। দিনমণি ত আকাশে নাই। তবে কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি? কাহার উদ্দেশে কথা কহিতেছি? আকাশ-কাননে নক্ষত্র ফুল ফুটিয়াছে। সেই সকল ফুলের মধ্যে একটী বড় ফুল,—চাঁদ। সেই চাঁদ আমাদিগকে রাত্রিকা—"

শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা না শুনিয়াই ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "আর আমি শুনিতে পারি না। ঐ সেই বিপক্ষদল সম্মুখে।—আমাকে এখন সাক্ষাৎ

করিতে হইবে। মারিব না কাহাকেও। কেহ মারিতে আসিলে রক্ষা পাইবার—জান তুমি, এই আমার সঙ্কল্প।"

ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে চতুর্দ্দিকের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ঘরের আলো যত উজ্জ্বল ছিল, তদপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চতুর্ভুজ অতি সুন্দর নাম। কিন্তু আমি দেখিতে চাই, সম্মুখে দেখি, দ্বিভুজ। সেই দ্বিভুজ চতুর্ভুজ বাতুলালয়মধ্যে সুস্থিরভাবে ক্রীড়া করিতেছেন।

কাট্‌গড়ার মধ্য হইতে এক সখী গাইয়া উঠিল :—

গীত।

"কপাল কপাল মূল এই কি ছিল কপালে।
নিদয় বিধাতা মম এই লিখেছিল ভালে॥
যারা মম প্রাণধন, যতনে করি যতন,
যতনেরি সে রতন, কেবা কোথা লুকাইলে॥
অনন্ত জলধিজলে, রত্ন অন্বেষণছলে,
প্রবেশ করিয়ে আমি, করি অন্বেষণ :—
খুঁজি সেই প্রাণধনে, দেখা পাইব কেমনে,
হেরি হৃদয়দর্পণে সেরূপ তাহার ;—
কালে কাল মিশাইল, খেলা ধূলা ফুরাইল,
আশা ভরসার সায়, গরাসিল মহাকালে॥"

গীত শুনিয়া শ্রোতারা বুঝিলেন, পাগলী সখীটী বিরহিণী।—"যতনের রতন" হারাইয়াই এ অভাগিনী পাগলিনী।—বাতুলালয়ের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে। চতুর্ভুজলাল অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাগলকে কহিলেন, "রাজা! চাহিয়া দেখ, তোমার সপরিবার একত্র। কিসের অভাব তোমার মহারাজ? আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আজ না,—অনেক দিন পূর্ব্বে আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু মহারাজ! তুমি কেন বাতুলালয়ে?—চাহিয়া দেখ, স্বর্ণলতা অপ্সরাসুন্দরী তোমার সম্মুখে,—রাজকুলচূড়ামণি ভূপেশচন্দ্র

তোমার সম্মুখে,—মহারাজ মহানন্দ বাহাদুরের প্রিয়পুত্র হরবিলাস বাহাদুর তোমার সম্মুখে,—আর আমি,—মহারাজ, তোমাদের গৃহচিকিৎসক।—ভ্রম হইতেছে কি? চতুর্ভুজ বলিয়া কোন লোক ছিল, মনে হইতেছে কি?—রাজা! এই দেখ!"

চতুর্ভুজ সরিয়া গেলেন। নূপুর বাজাইয়া একটী রমণী পাগলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখে কথা নাই। হস্তের ভঙ্গী আছে, নয়নের ভঙ্গী আছে, সর্ব্ব শরীরে চঞ্চলতা আছে। দুইজনে দুইজনের মুখের দিকে চাহিতেছে।

সত্যই এই বাতুলালয়। যাহারা নাচে, যাহারা গীত গায়, যাহারা কথা কয়, তাহারা কাহারা, শুদ্ধ তাহারাই তাহা বুঝিতে পারে। চীৎকার এত উচ্চে যায় যে, শব্দমাত্র শুনা যায়, কথা বুঝিতে পারা যায় না। বানরে কথা কয়, বানরে বুঝিতে পারে, কুকুরে কথা কয়, কুকুরে বুঝিতে পারে, পশুর কথা পশুরা বুঝিতে পারে, মানুষে পারে না।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। যে কাণ্ড দিনমানে হইতেছিল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। সূর্য্য কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, গারদের লোক তাহা দেখিতে পায় নাই। সন্ধ্যা আসিয়াছিল, তাহাও হয় ত কেহ দেখে নাই। এখন রাত্রি অনেক। ঝম্ ঝম্ করিয়া একটী রমণী কাটগড়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাগলের অনেক ভুল হয়। যে পাগল এই কাট্‌গড়ায়, সে পাগল এই নারীকে যেন চিনিতে পারিল না। হাস্য করিয়া কহিল, "এত বঞ্চনা কি জানিস্ তুই অপ্সরা?"

সম্মুখে আর একজন। হাসিতে হাসিতে সেই লোক কহিল, "কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ রাজা? আমার নাম শশিকুমার।"

আরও উচ্চ হাসি হাসিয়া পাগল কহিল, "শশিকুমারের পায়ে কি মল্ বাজে?—নূপুর বাজে? আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু ফুটিতে পারিতেছি না। তুই কত ছলনা জানিস্ মা অপ্সরা? আয় মা। এই সকল আলো ছিল, কোথায় গেল? মা! এই না ছিলি, এই না কে আসিয়াছিল? অনাথা তুই? পাপ পরিত্যাগ কর। ঐ—ঐ—ঐ আবার সেই রক্তবস্ত্র! ঐ

আবার সেই ফার্ফোর্! ঐ আবার সেই বিকট দর্শন! ভূপেশ! আর আমি তোমাকে শত্রু ভাবিব না। আমার অপ্সরাকে রক্ত মাথাইয়া আর তুমি আমার কাছে আনিও না! সেই—তুমি আবার কে? আমার অপ্সরা কোথায় গেল? নূপুর বাজিতেছিল, কে তাহা নিবাইয়া দিল?"

"চাহিয়া দেখ!—দেখ রাজা! আমি চতুর্ভুজ। আরো চাহিয়া দেখ, এই তোমার মিহি—(শ্রীবিষ্ণুঃ) তা না, এই দেখ তোমার জগৎকুমারী।"

"অ্যাঁ! জগৎকুমারী? উঃ! এখনো জগৎকুমারী আমার সম্মুখে আসে? এখনও আমার জগৎকুমারী কি জগতে আছে?"

"আছে না ত কি রাজা! জগৎকুমারী যাবে কোথায়? তুমি শুনিয়াছিলে, নূপুরের নৃত্য।"

আলয়ের সমস্ত পাগল নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রন্দন করিতে লাগিল। হাস্য করিতে লাগিল। এক পাগল চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ বিরাটকেতু! শশিকুমার আসিয়াছে।"—উত্তেজিতভাবে ভূপেশচন্দ্র সম্মুখে আসিয়া পাগলকে কহিলেন, "শান্ত হও রাজা! শান্ত হও! চাহিয়া দেখ,—সম্মুখে চাও। শশিকুমার নয়, আমি।"

নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে পাগল কহিল, "তুই কে? তুই আবার কে?—অপ্সরা?"

"হাঁ রাজা! আমি অপ্সরা। তোমার এমন দুর্দশা আমরা—"

"কে বলিতেছিল জগৎকুমারী? আহা! আমার জগৎকুমারী কি এই জগৎসংসারে আর আমার আছে?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিতে পারিলেন না। হুপ্ করিয়া একজন পাগল অপর কাটগড়ায় লাফাইয়া সেই কথার উত্তর দিয়া কহিল, "আছে না ত গিয়াছে কোথায়? তোমার জগৎকুমারী রাজা?—তোমার জগৎকুমারী—

নাচিতে নাচিতে আসিছে ওই,
লইয়ে শশিকুমারে।
চাহিয়ে চাহিয়ে দেখহ রাজন্!
মিহিরমোহিনী রূপেতে॥

বঞ্চিয়ে তোমারে আসিছে সে সতী,
দেখিতে তোমারে সপ্রেমে।
আমিও পাগল, তুমিও পাগল,
চেন চেন করি তোমারে!
কিন্তু তুমি রাজা, চিনিতে কি পার,
চেন কি শশিকুমারে?”

সকলের কথা বন্ধ হইয়া গেল। এক দণ্ড, দুই দণ্ড, তিন দণ্ড অতীত। এক দরজা খুলিয়া এক তরবারি হস্তে আনোয়ার বখ্ত গৃহমধ্যে উপস্থিত। জোরে জোরে প্রশ্ন করিল, “ক্ষণকালের জন্য আমরা তোমাদিগকে অধিকার দিয়াছিলাম, এত বিলম্ব ক্ষমা করা যায় না। বাহির হইয়া যাও। যেখানকার পাগল, সেই খানেই থাকিবে। বাহির হও!—নারী দেখাইয়া,—ভূত দেখাইয়া, পাগলকে বিভ্রান্ত করা—”

“আর না! তলোয়ারে তলোয়ারে সাক্ষাৎ!”

হাস্য করিয়া হরবিলাস কহিলেন, “আবার তুই? যেদিন তোদের শক্তি ছিল,—যে দিন তোদের স্বেচ্ছাচার ছিল,—যে দিন তোরা স্বর্গভূষণের পোষা কুকুর ছিলি, সে দিনের কথা এক, এখনকার কথা আর এক। ভূপেশচন্দ্র এখন স্বর্গীয় কবচের অন্তরালে আচ্ছাদিত রহিয়াছেন, তাঁহার গাত্রে করস্পর্শ করে, কাহার সাধ্য? আয়! সাধ্য থাকে, অস্ত্র থাকে, আয়! কিন্তু না ত, এখন সময় নাই।”

“রাজা! ঝম্ ঝম্ করিতেছে কে? মিহিরমোহিনী? তুমি মিহিরমোহিনী জান? আর আমি কে? তাহা কি তুমি জান? উঃ! অনেক দিনের কথা! রাজা! পাগ্‌লা গারদে তোমাকে কে আনিয়াছে?”—এক ব্যক্তি গম্ভীর-স্বরে পাগলকে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

সব কথা চাপা পড়িয়া গেল। চুপি চুপি আর একটী লোক আসিয়া পাগলকে কহিল, “স্থির হও রাজা! স্ত্রীপুত্র দর্শন কর!”

না বলিলে ভাল হইত। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কাহার জন্য পাগল,

তাহা সকলে জানে। পাগলকে ভাল করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা হাঁ করিয়া রহিল। স্বধু কথায় তাহা কি কখনও হইতে পারে? যাহাদের স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, তাহারা হারাইয়াছে, সে মায়া, সে স্নেহ, কেহ কি ভুলাইয়া দিতে পারে? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আশাকে চপলা বলিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছি। সত্য হইতে পারে, কিন্তু অন্য লোকে হয় ত উপহাস করিতে পারে।

গারদে অনেক লোক। যাহারা রক্ষাকর্ত্তা ছিল, তাহারা পলায়ন করিল। নাম জানি আর না জানি, চতুর্ভুজ আসিয়া পাগলকে কহিল, "রাজা। শশিকুমারকে মনে পড়ে? তোমার একটী পুত্রকে চোরে লইয়া গিয়াছিল। তোমরা ভাবিয়াছিলে, ভূতে উড়াইয়া লইয়াছে, কিম্বা গহনার লোভে ডাকাতে মারিয়াছে। কিন্তু তা না ত রাজা! তোমার ইচ্ছা ছিল, জগৎকে বঞ্চনা করিবে, অপ্সরাকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিবে। অপ্সরার বিবাহে,—(হইয়াই থাকে) লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিবে। হইল না। ছেলে থাকিল না। অপ্সরা পলাইল। রাজা। তুমি এখন পাগল, কে তোমাকে বলে পাগল? মায়া, মমতা, স্নেহ, বাৎসল্য, সমস্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, টাকার শোকে তুমি পাগল হইয়াছ, কিন্তু এখন চাহিয়া দেখ দেখি, সম্মুখে কে? অপ্সরাকে দেখাইব না। অপ্সরা তোমার কন্যা নয়। কন্যা বলিয়া অপ্সরাকে তুমি প্রতিপালন করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা না। অপ্সরাসুন্দরী তোমাদের— তুমি রাজা, অপ্সরাসুন্দরীকে পালন করিয়াছ। অপ্সরা—"

"ঐ আবার কে?"

"রাজা বিরাটকেতু! ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি, ঐ আবার কে? শশিকুমার। তুমি অপুত্রক, সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া একটী কন্যা লইয়া তুমি অহঙ্কার করিতেছিলে। অপ্সরাসুন্দরী তোমার কন্যা, সকলকে তুমি ইহা জানাইতেছিলে। কিন্তু সে সত্য কোথায় রহিল রাজা? কন্যা ত সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিল। কিন্তু আর একটী বড় কথা। গারদে স্পষ্ট স্পষ্ট পরিচয় হইতেছে, দেখা যাউক, তোমাতে আমাতে কিরূপ পরিচয় হয়।"

সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া চতুর্ভুজলাল পুরোবর্ত্তী হইলেন। যেন সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় কহিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজা বিরাটকেতু! আমি দেখিতেছি, আমি জানিতেছি, সমস্তই তোমার ছল। মানুষকে দেখাইতেছ, যেন তুমি পাগল, কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে, তুমি পাগল নও। সকল মানুষের চক্ষে তুমি ধাঁদা দিতে পার, কিন্তু আমার চক্ষে পার না। আমি সব জানি। ভূপেশচন্দ্র তোমার গৃহে পালিত হইয়াছিলেন, তাহা আমারই কর্ত্তৃক;—অপ্সরাসুন্দরী তোমার কন্যা হইয়াছিলেন, তাহাও আমারই সহায়ে। রাণী কমলাসুন্দরী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, কন্যা প্রসব করেন নাই। অকালে তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন, তোমার লীলাখেলা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই সতীলক্ষ্মী কুলাঙ্গনা এই সকল কাণ্ড কিছুই জানিলেন না। এখনও অনেক লোকে মনে করে, পুণ্যবান্‌পুণ্যবতীরা ইহলোক পরিত্যাগ করিলে আকাশে গিয়া নক্ষত্র হয়। লোকের সংস্কারে নিতান্ত অবিশ্বাস করিতে নাই। জনপ্রবাদকে আমি যদি অবিশ্বাস না করি, তাহা হইলে হয় ত আমিই বলিব, রাণী কমলাসুন্দরী নক্ষত্ররূপিণী হইয়া গগনমণ্ডল হইতে তোমার সমস্ত চাল্‌চলন অবলোকন করিতেছেন; তোমার চরিত্রচর্য্যা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অণুবীক্ষণে,—দূরবীক্ষণে মানুষে যেমন ছোট বস্তু বড় দেখে, দূরের বস্তু নিকটে দেখে, রাণী হয় ত সেইরূপ দেখিতেছেন। স্বর্গে গেলেই পৃথিবীর লোকের হাসি আসে। স্বর্গনামে যদি কোন পদার্থ থাকে, সে স্বর্গে সাধুলোকের বাস হয়। তুমি আমি হয় ত সে স্বর্গের অধিকারী হইতে পারিব না। স্বর্গে পাপীলোকের স্থান নাই। আমি বলিতে পারিব না,—জ্ঞানকৃত পাপ নাই, মনে করিতেছি সত্য, কিন্তু বলিতে পারিব না, আমি পাপী নই। পাপ লুকাচুরী খেলে। কোথা দিয়া প্রবেশ করে, নির্ম্মল লোকের নির্ম্মল চক্ষুও তাহা দেখিতে পায় না। তুমি বিরাটকেতু! সাধ করিয়া পাগল সাজিয়াছ, কিম্বা পাগল হইয়াছ, আমি তাহা জানিতে পারিতেছি না, তোমার মনের কথা, তোমার মনের ছল, কেবল তুমিই জান। এখন এসো দেখি রাজা! তোমাতে আমাতে জন্য পরিচয়।"

হো হো শব্দে হাস্য করিয়া রাজা বিরাটকেতু স্বর কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া

কহিলেন, "কেন আর অভাগাকে বঞ্চনা করিস্ মা অপ্সরা ? দগ্ধ হইতেছি রোমে রোমে, আগুন জ্বলিতেছে রোমে রোমে, দগ্ধমানুষকে দগ্ধ করিয়া তোর কি অভিলাষ পূর্ণ হইবে মা ? লোকটা বলিয়া গেল, অপ্সরা আমার কন্যা নয়!"—ক্রন্দন করিয়া আবার কহিলেন, "তুই ভাল কেমন লোক ? এতক্ষণ কাছে ছিলি,—এতক্ষণ চক্ষে ছিলি, এখন কোথায় পলাইয়া গেলি ? অপ্সরা আমার কন্যা নয়! প্রতারকের কথায় তুই ভাল এতদিনের পর কি বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলি ?" দুই চক্ষে দুই হস্ত আবরণ করিয়া পাগল রাজা আবার কহিলেন, "কৈ তবে ? নাই ত! একবিন্দুও জল নাই। এতক্ষণ আমি কাঁদিতেছিলাম। তবে জল কোথায় গেল ? বরফ হইয়া জমিয়া গেল!—কৈ, তাহাও ত না! যদি বরফ থাকিত, ঠাণ্ডা হইয়া যাইত, এ যে দেখিতেছি অগ্নি। ঐ যায়—ঐ যায়—প্রতারক পলাইয়া যায়। অপ্সরা! উহাকে ধর!"

সমান শান্তভাবে দাঁড়াইয়া,—সমান প্রশান্তস্বরে চতুর্ভুজ কহিলেন, "না রাজা! আমি প্রতারক নই। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিতে আসি নাই। ভাগ্য বলিয়া মানো, আমি তোমাকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, তুমি পেয়াদা! আমিই তোমাকে রাজা করিয়া দিয়াছিলাম। সে সকল কথা কি মনে পড়ে না ?"

তফাতে থাকিয়া রাজা মহানন্দ রাও শিহরিয়া উঠিলেন। বিমর্ষ রাজা রঘুবর বাহাদুরের গায়ে কাঁটা দিল। দেবী যশেশ্বরী চক্ষের ইঙ্গিতে বক্তাকে যেন নিষেধ করিলেন,—পার্শ্বে ছিলেন,—সম্মুখে আসিয়া কাণে কাণে যেন কহিলেন, "ও কথা আর না।"

চতুর্ভুজলাল ইঙ্গিত বুঝিলেন, পরামর্শ শুনিলেন, প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন, পাগলকে সম্বোধন করিয়া মিষ্টমিষ্টবাক্যে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "রাজা বিরাটকেতু! তুমি কি মনে করিতে পার, রাণী কমলা-সুন্দরীর জরায়ুপ্রসূত সন্তানটী কোথায় গিয়াছে ? সূতিকাগৃহ হইতে ভূতে লইয়া গেল, সকলেই বলিল,—তুমিও শুনিলে, কিন্তু এখন জান কি ?—মনে করিতে পার কি ? উঃ! আমার কি কঠিন প্রাণ! সেই দুর্দ্দিনের কথা এখনও জল্‌জ্বল্ করিয়া আমার মনে জ্বলিতেছে। রাজা বিরাট! সত্যই তোমার

জনকজননী নাম দিয়াছিল, বিরাট। দেহ বিরাট, প্রাণ বিরাট, মন বিরাট, হৃদয় বিরাট! তোমার বিরাট মনে কিছুই স্থান না পাইতে পারে,—না পাওয়াই সম্ভব, শিশুকে সূতিকাগার হইতে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু জান তুমি, কে সেই ভূত?"

একহাতে বক্ষাঘাত করিয়া, একহাতে চুল ছিঁড়িয়া, রাজা বিরাটকেতু যথার্থ পাগলের মত হাস্য করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রাণের পুতুলি! তুই কি মা আমার ভাগ্যে ভূত হলি? কেন আর কাঁদাস্ অপ্সরা?"

"কৈ আর কাঁদিতেছ তুমি রাজা? এই মাত্র আপনার মুখেই তুমি কহিলে, চক্ষে জল নাই। চক্ষে বরফ, চক্ষে আগুন। আবার কেন এ প্রকার প্রলাপ?—প্রলাপ ছাড়িয়া দাও, শোন যাহা বলি। কে জান সেই ভূত?"

"আবার ঐ কথা?" বানরের মত লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃত চীৎকার-স্বরে পাগল কহিল, "আবার ঐ কথা? প্রাণের অপ্সরা আমার ভূত?"

"আমিই সেই ভূত। বরফ থাকুক, আগুন থাকুক, চাহিয়া দেখ, চিনিতে পারিবে, আমিই সেই সূতিকাগারের ভূত।"

"ভূত! অ্যাঁ—অ্যাঁ!—ভূত খাইয়া ফেলিতে আসিয়াছে বুঝি? আগুন ওখানে কেন? অপ্সরাসুন্দরি! তোমার ঘরে জল আছে?"

"জল থাকিলে কি হইবে মহারাজ?"

"আগুন নিবাইয়া ফেলিব।"

"এ আগুন নিবিবে না।—এ আগুন নিবিবার নয়।"

"তবে আমি পুড়িয়া মরি!—মা!—অপ্সরা!—আমি পুড়িয়া মরি! শেষদশায় একবার আমার মুখের কাছে বসিয়া,—না,—স্বর্গভূষণ!—হা! জগৎ!—তুমি—আমি—দেখ,—দুজনে দেখ,—বিরাটকেতু পুড়িয়া মরে! পৃথিবী হইতে পলায়ন—"

"বিলম্ব আছে।" গম্ভীরভাবে চতুর্ভুজ কহিলেন, "এখনও বিলম্ব আছে। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া এই রঙ্গভূমি হইতে তুমি পলায়ন করিতে পারিবে না। পথে অনেক দরোয়ান, পাপীলোকে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে না।

উচিতও না—তুমি মহাপাপী! অনেক পাপ তোমার বুকে! একটু থাক, দেখিয়া যাও, আমাকে ভাল করিয়া চিনিয়া লও। আগুন—"

"উঃ!—উঃ!—মুখ পুড়িয়া গেল!—সীতাদেবি! একটু অমৃত দাও!—হাত কালো হইয়া গেল!—পা কালো হইয়া গেল! মুখ কালো হইয়া গেল!—অমৃত দাও!—আমার,—আমি অমৃতফল খাইব না। সীতার ফল,—রামের ফল,—লক্ষ্মণের ফল—আর আমি উচ্ছিষ্ট করিব না,—দেবি!—দেখ, দেখ, দেখ!—আমি হনুমান হইলাম!"

"হইতেই হইবে। হইবার অগ্রে একবার চাহিয়া দেখ দেখি, কে আমি? চিনিতে পারিবে,—নাম বলিলে চিনিতে পারিবে, আমি চতুর্ভুজ।"

"তাহাই ত বটে! এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, আকাশে উঠিতেছিলাম, ঝুপ্ করিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছি! তুমি চতুর্ভুজ!"

দুইবার কপালে করাঘাত করিয়া পাগল রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন, "বুকের ভিতর আলো ছিল, সেই আলোতে দেখিতেছিলাম, চতুর্ভুজ! কিন্তু মা! চতুর্ভুজ তুই কতদিন?—খড়্গপাণি! কাটামুণ্ড হাতে! কাটামুণ্ড কাণে! কাটামুণ্ড গলায়! অপ্সরা! না,—আর বলিব না, আমার অপ্সরা চতুর্ভুজ! তবে—তবে—"

দ্বারে আঘাত হইল। সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার কে আসিবে? ঘরে অনেক লোক একত্র, বাহির হইতে কে আসিবে, কে ডাকিবে, কেহই জানিতেন না। সর্ব্বাগ্রের বক্তা দরজা খুলিয়া দিতে উদ্যত হইতেছিলেন, হাত ধরিয়া নিবারণ করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "স্থির হও। এ গৃহে এখন কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। বিরাটকেতু পাগল নয়। ইহাকে ভূতে পায় নাই। লক্ষণে বুঝিতেছি, টাকার শোকে চঞ্চল। স্বর্ণভূষণকে মনে পড়িয়াছে, স্বর্ণভূষণের নাম করিয়াছে। পূর্ব্বের সব কথাই ইহার মনে আছে। অপ্সরা! তুমি একবার কাছে এসো মা! কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিতেছে। এতক্ষণ যেরূপ প্রলাপ ছিল, তাহা যেন কমিয়া আসিতেছে, তুমি একবার কাছে এসো মা! অপ্সরা! এখনও কি তুমি মনে করিতেছ, বিরাটকেতু পাগল?"

"না,—মনে করিবে কি? মনে করিবে কে?—বিরাটকেতু পাগল না।"

হি হি করিয়া হাস্য করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "বিরাটকেতু পাগল না। মুখ পুড়িয়া গিয়াছে! হনুমান হইয়াছে, অপ্সরা আসিবে!—অপ্সরার সঙ্গে কথা! আবার অপ্‌সরা কাছে আসিবে! ছি! বিশ লক্ষ! ছি! দশ লক্ষ! ছি! এক লক্ষ! তোরা কত অপ্‌সরা আনিয়াছিস্?"

পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত।—জোর জোর আঘাত।—কাণ্ড বুঝিতে না পারিয়া, আঘাতের আভাস বুঝিয়া, কাহারও অনুমতি না লইয়া, কুমার হরবিলাস সম্মুখদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মনে করিলেন, বিপক্ষ, মুখেও বলিলেন,—"বিপক্ষ!"

"বিপক্ষ?—কেন অপ্‌সরা?—আবার বিপক্ষ সম্মুখে কেন? চলিয়া যাইতেছি, অনেক পাপ করিয়াছি, পাপসংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; আবার আমার সম্মুখে বিপক্ষ কি জন্য? বারণ কর, আসিতে দিও না, দ্বার খুলিও না। মনে আছে, একটু জুড়াইব।—অপ্‌সরা! মা!—তুই কি ভূত হলি মা?"

কুমার হরবিলাস দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। একজনের হাত বাঁধা, মুখ ঢাকা। আর একজন যেন তাহার প্রহরী। আর একজন সহাস্যবদনে স্বাধীন।

কাহারও উপদেশে নয়, উপদেশের কর্ত্তাই বা তখন কে?—দেবী যশেশ্বরী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়া সেই মুক্তদ্বার স্বহস্তে বন্ধ করিয়া দিলেন।

পাঠকমহাশয় একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছেন, এত লোক এক ঘরে জড়, কিন্তু একজন কি দুইজন ভিন্ন আর কাহারও মুখে কথা নাই। স্থান পাইলে হাটবাজার বসিতে পারিত, যুদ্ধক্ষেত্র হইলে অস্ত্রের ঝন্ ঝনার সঙ্গে হুহুঙ্কার গর্জ্জন শুনা যাইত, কিন্তু এ ঘরে তাহা কিছুই না। যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনিও চুপ্ করিয়াছেন। পাগল হাসিতেছিল, বকিতেছিল, তাহারও রসনা নিস্তব্ধ। যে তিন জন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন,—যে একজন হাতবাঁধা লোকের বন্ধনরজ্জু ধরিয়া ছিল, সেই লোক তর্জ্জন করিয়া কহিল, "এই ত সেই ঘর, কে তোর জামিন হইবে? তোর হইয়া কে বিশ হাজার টাকা দিবে? আয়, আবার চল্, আয় না।"

একটী পাতা নড়িলে গৃহপালিত ঘুমন্ত শিকারী কুকুর যেমন শীঘ্র শীঘ্র

জাগিয়া উঠে, প্রবেশকারীকে দংশন করিবার উপক্রম করিয়া সম্মুখের দুই হাত তুলিয়া যেমন গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়, সেইরূপে সজাগ হইয়া কাটগড়ার ভিতর নাচিতে নাচিতে বিরাটকেতু কহিলেন, "প্রাণ গেল!—যাইতেছিল, আরও গেল!—আরও যায়!—আয় তোরা কে এলি! কে এমন মধুর বুলী শুনাইলি!—বিশ—হা—জা—র! ধড়ে বুঝি আবার প্রাণ বসে!—বিশ—হা—জা—র!—কারা তোরা?—অপ্সরা বুঝি?"

চতুর্ভুজ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া ছিলেন। পাগলের কথা শুনিয়া তিনি একটী কথা কহিলেন। সে কথা অন্য সকলে শুনিতে পাইল না, কেবল ভূপেশচন্দ্র শুনিলেন। কথাটী ছোট।—অর্থ ঔষধ।

তিনখানি তরবারি এককালে উন্মুক্ত।—ভূপেশের, হরবিলাসের, আর বিশেশদয়ালের।—তরবারিরা কথা কহিতে জানে না, কিন্তু বিপক্ষ সম্মুখে আসিলে তাহারা যত কথা কহিতে জানে, ভগবানদত্ত রসনা তত কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। বন্ধনরজ্জু ছাড়িয়া দিয়া রক্ষীলোকটা সাত হাত তফাতে হটিয়া গেল। কুমার হরবিলাস সেই বন্দীলোকের হস্তবন্ধন,—মুখবন্ধন খুলিয়া দিলেন। কহিলেন, "পাগলা গারদে যাহারা আসে, তাহারাই পাগল হয়। এত ভদ্রলোক এস্থানে, কিন্তু কেহই কথা কহিতেছেন না। কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় বড় বড় ধার্ম্মিক,—বড় বড় বীর উপস্থিত ছিলেন, দুষ্ট দুঃশাসনকে কেহই নিবারণ করেন নাই। এখানেও দেখিতেছি, তাহাই। স্বর্ণভূষণকে ইহারা বাঁধিয়া আনিয়াছে কি জন্য? তোমরা সকলেই যে, চুপ্ করিয়া রহিলে? হরবিলাসের তরবারিতে কি ধার নাই? ইচ্ছা করিলে এই তরবারি শতশত মুণ্ড এই স্থানে গড়াইয়া দিতে পারে। আমি সওদাগর হইয়াছিলাম, তাহাই বুঝি তোমরা জান? স্বর্ণভূষণ বাঁচিয়াছে, আমি বাঁচিয়া আছি। রাজা রঘুবর! মুখ তুলিয়া আমার পানে চাও,—শোকতাপ পরিত্যাগ কর, দেখ, তোমার স্বর্ণভূষণ যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সাতঘাটের জল একঘাটে! রক্তমুখে আমি যেখানে দাঁড়াইয়া থাকি, সেখানে পৃথিবীর মাটী পর্য্যন্ত দুলিয়া দুলিয়া যেন রসাতলে প্রবেশ করিতে যায়। ইহাদের প্রাণে ভয় নাই, লজ্জা নাই, হিতাহিত জ্ঞান নাই। স্বর্ণভূষণকে বাঁধিয়া আনিয়াছে।

চুরী করে নাই, ডাকাতী করে নাই, খুন করে নাই, কোন লোকের স্ত্রীকন্যা বাহির করে নাই, (মুখ লুকাইয়া হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন) আর কোন দুষ্ট কার্য্যও করে নাই, তথাপি বাঁধিয়া আনিয়াছে! আমি ত ইহা সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু করি কি? হুকুম দেয় কে? পিতা বিদ্যমান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান, গর্ভধারিণী জননী সম্মুখে, একা আমি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারি না।"

"কেন পার না রাজকুমার?"—ক্রোধে অস্থির হইয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, এক্ষেত্রে কেন তুমি স্বেচ্ছাচারী হইতে পার না হরবিলাস? কুরুক্ষেত্রসমরে অভিমন্যু কি করিয়াছিলেন? নারায়ণী সেনার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন যখন মহারণে ব্যাপৃত, দ্রোণাচার্য্যের চক্রব্যূহ কে তখন ভেদ করিয়াছিল? হরবিলাস! তুমি আজ বীরের মত কার্য্য কর। অবিচার দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। তুচ্ছ অর্থের নিমিত্ত হস্তমুখ বন্ধন? আকবর শাহ! তোমার রাজত্ব কেন যায়? জাঁহাগীর! সচ্ছন্দে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিয়াছ। দেখিলে না, তোমার পিতৃরাজ্যে কি অবিচার হয়! সাহজাঁহা! শান্ত হইয়া ছিলে, এখন দেখিতে পাইলে না, তোমাদের বংশে কত পাপ প্রবেশ করিয়াছে। ঔরঙ্গজেব! আমাদের উপর তুমি অনেক অত্যাচার করিয়াছ, তথাপি তোমার নামে আমরা নমস্কার করি। জন্মদাতা পিতাকে তুমি কয়েদ করিয়াছিলে, তাহাও ভুলিয়া গিয়া তোমার মহা প্রতাপকে আমরা সেলাম করি। অবিচার ছিল, কিন্তু এত না। এত পাপ কি জন্য? তুচ্ছ টাকার দায়ে একজন রাজপুত্রের হাতমুখ বাঁধা? তোমার পুত্রপৌত্রেরা এইরূপ বিচার করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের গৌরব রক্ষা করিবে? হস্তিনার যে সিংহাসনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উপবেশন করিতেন, সেই সিংহাসন কি আজ তুলসীবৃক্ষ? ওঃ! কথা কহিবার অবসর নাই।"

হরবিলাসের তরবারি চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। নিবারণ করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "শান্তি।"—শান্তির মহিমা কত লোকে জানে? যেখানে অত লোক জড় হইয়াছে, সেখানে শান্তি থাকিতে পারে, অশান্তিও আধিপত্য করিতে পারে। রাজা রঘুবর রাও ছুটিয়া পলাইতেছেন। কিন্তু পলাইবার পথ কোথায়? আটঘাট বন্ধ। কুমার হরবিলাস তাঁহার অনুধাবন করিয়া

সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া সান্ত্বনাবচনে কহিলেন, "রাজা! কাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? স্বর্গভূষণ বাঁচিয়া আসিয়াছেন।"

"তুমি কে? আবার সেই নাম আমার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিতেছ? ঐ যায়!—ঐ যায়!—ঐ গেল!—ঐ এলো!—সেই ভূত!—ছাড় আমাকে! কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! হায়, হায়, হায়! মরিতে যাইতেছিলাম, মরিতে পারিলাম না। আবার ঐ মূর্ত্তি দেখিতে হইল! জ্বালার উপর এত জ্বালা দিতেও বিধাতা জানেন? দগ্ধ লোককে দগ্ধ করিতে দগ্ধবিধি এতই কি পটু? স্বর্গভূষণ ভূত হইয়াছে। ভূতের চেহারা বেশ দেখা যায়! আহা! সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নাক, সেই কাণ, সেই চুল; ঠিক্ যেন সেই স্বর্গভূষণ। কিন্তু এখন ত আমার কাছে আসিছে না? ছায়া দেখাইয়া মায়া করিতেছে। আমি যদি কাছে যাই, ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিয়া ফেলিবে। হাঁ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। রাণী বুঝি এখানে?—পালাও! শীঘ্র পালাও!—মহালক্ষ্মি! তোমার গর্ভে ভূত ছিল?—কে এক জন সে দিন বলিয়া গিয়াছে, তোমার গর্ভে—"

রাজকুমার হরবিলাস দ্বিতীয় বক্তা। উন্মত্তের ন্যায় রঘুবর রাও বকিতেছিলেন, আর সকলেই বাক্যশূন্য। কেবল হরবিলাস দ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়া রঘুবরের কথায় কথা কহিলেন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কথা কহা নহে, সকলের উদ্দেশে আকাশে মুখ তুলিয়া প্রচণ্ড ভীম-স্বরে কহিলেন, "আশ্চর্য্য! পাগল গারদে যারা যারা প্রবেশ করে, তারাই যেন পাগল হয়। রাজা রঘুবর পাগল হইয়াছেন। এই সকল মহা বিপদের হেতুভূত কে? এই সকল উৎপাতের মূলীভূত কে? আমি সব জানি। ঘৃণিত পাপপিশাচ দুরন্ত যবন আনোয়ার বখ্ত লুকাইয়া পলাইয়া এখানে এখন এই গারদের কর্ত্তা সাজিয়া রহিয়াছে। টানিয়া আন। দরজা বন্ধ আছে,—ভাঙ্গিয়া ফেল। সেই পাপাত্মাকে এখনি কাটিয়া ফেলিব। শত শত খণ্ডে তাহার মুণ্ডকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া সেই রক্তে সমস্ত পাপের পাপকলেবর ধোয়াইয়া দিব। এখানে কি কোন বীরপুরুষ উপস্থিত নাই? আর্য্যবংশের কোন রাজা মহারাজা এখানে কি আমার ক্ষুদ্রবাক্যে কর্ণপাত করিতেছেন না? যবন কাটিব, যবনের

রক্তে বসুমতীকে কলঙ্কিত করিব না, বাতাসকে ডাকিয়া, বাতাসের পূজা করিয়া সেই দুষ্টরক্ত নরকে উড়াইয়া ফেলাইব। স্বর্গভূষণ জীবিত রহিয়াছেন। না থাকিলেই ভাল হইত। যবনের দাস। হিংসাবিদ্বেষের কলঙ্কিত আধার! দুষ্ট অভিপ্রায়ে যবনকে উৎকোচ প্রদান করিয়া একজন রাজপুত্রের অপমান করা যাহার সঙ্কল্প, দস্যুহস্তে কেন তাহার জীবন গেল না? গিয়াও কেন গেল না? যে তাহার বন্ধু, যে তাহার সহায়, যে তাহার মন্ত্রী, তাহারই হস্তে তাহার জীবন যাইতেছিল। সে হস্তও ছদ্মবেশী যবনের হস্ত।—স্বর্গভূষণ! তুমি যে চুপ্ করিয়া রহিয়াছ? ধিক্কার কি তুমি এতই ভালবাস? ধিক্ তোমাকে। বার বার স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছ যবনকে ঘুস দিয়া, ধনের নামে, ধনের ছলে, সহস্র সহস্র মুদ্রা উৎসর্গ করিয়া স্বজাতির অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছ। কৃতকার্য্য হইতে পার নাই, কিন্তু টাকা উড়িয়া গিয়াছে। আবার ঘুস্ দিতে যাইতেছিলে, সেই টাকার জন্য প্রাণ হারাইতেছিলে, পিতাকে পাগল করিয়াছিলে, এখন দেখ দেখি, তোমার সেই ঘুস্খোর যবনের আমার হাতে কি দশা হয়! কাঁটা দিয়া পায়ের কাঁটা বাহির করিব। রাজা রঘুবর রাও এখন তোমাকে ভূত বলিয়া ভয় পাইতেছেন। যথার্থই তুমি ভূত হইয়া আসিয়াছ। স্বর্গভূষণ! যাও, আমি হুকুম করিতেছি, তুমি যাও। তোমার প্রধান মুরুব্বি সেই যবনাধম আনোয়ার বখ্তকে ধরিয়া আন। ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তাহাকে দেখাইব। বাতুলালয়ের পরিদর্শক কিম্বা দারোগা, কিম্বা অধ্যক্ষনামে কর্ত্তা। যে নামে, যে পদে সাজিয়া রহিয়াছে, সেই নামে সেই পদে তাহাকে তুমি বাঁধিয়া আন। কত ধূর্ত্ততা যবনহৃদয়ে বাস করে, আমি দেখিব। চাপ্দাড়ীসজ্জিত মুণ্ড এই বাতুলালয়ে গড়াগড়ি যাইবে।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অতি ধীর মৃদুস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "ভাই! অত উগ্রমূর্ত্তিধারণ করা আমার ইচ্ছার বিরোধী। হিংসার বদলে প্রতিহিংসা আছে, ইহা বোধ হয় তোমার অপেক্ষা আমি অধিক জানি। কিন্তু মানুষ মারিয়া সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা সকল সময়ে পৌরুষের কার্য্য হয় না। বিতাসু নামে পরিচিত' যবন যেপ্রকারে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকারে সকল শত্রুই দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তাহাও আমার ইচ্ছা

নয়। আমাদের উপরে, জগৎসংসারের উপরে, একজন অনন্তবিশ্বের অনন্ত অধিপতি আছেন, তাঁহার বিচারে আর পৃথিবীর রাজার বিচারে তুলনা করা যায় না। তুমি ইচ্ছা করিলে চক্ষের নিমেষেই আমোরারকে কাটিয়া ফেলিতে পার, তাহা আমার জানা আছে। রাজপুত্র তুমি, যদিও পূর্ব্বে ইহা জানিতাম না, কিন্তু তোমার বীরত্ববীর্য্য, তোমার সাধুতা, তোমার ধৈর্য্য, তোমার সাহসিকতা, আমার অজ্ঞাত ছিল না, এখনও নাই। হরবিলাস! ধৈর্য্যের ফল অতি মধুময়। একটা যবনকে কাটিয়া সে কেন নষ্ট কর? যাঁহারা এখন এখানে শোকেদুঃখে ভয়ে বিভ্রমে অনাকুল হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শান্ত করাই এখন আমাদের কার্য্য।"

হরবিলাস একটু স্থির হইয়া ভূপেশচন্দ্রের কথাগুলি শুনিলেন। হাস্য করিয়া কহিলেন, "এমন না হইলে তত মহামহাবিপদে ধর্ম্ম তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া পদে পদে রক্ষা করিবেন কেন? সাধু রাজকুমার! যথার্থই তুমি সাধু।"

আর এক লম্ফ প্রদান করিয়া দন্তবিকাসপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে বিরাটকেতু কহিলেন, "আমার অপ্সরা এখন বড় হইয়াছে, আমার অপ্সরা এখন অনেক কথা শিখিয়াছে। একটী ছিল, অনেক হইয়াছে; আমার জগৎকুমারীও অপ্সরা হইয়া আসিয়াছে। মা! তোরা মা কেন এত কাটাকাটির কথা কহিতেছিস্?"

মধ্যস্থল হইতে চতুর্ভুজ উঠিয়া বিরাটকেতুর সম্মুখে গিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "কাটাকাটির কথা হইতেছে না। তুমি ভাল হও, সকল কথা বুঝিতে পারিবে। স্বর্গভূষণকে ডাকাতে কাটিয়াছিল।"

"হাঁ! আমি ত সেই কথাই বলিতেছি।"—রোদন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অধৈর্য্যভাবে রঘুবর রাও কহিলেন, "আমি ত সেই কথাই বলিতেছিলাম। স্বর্গভূষণকে ডাকাতে মারিয়াছে। আবার সেই স্বর্গভূষণ তবে কোথা হইতে আসিল? টাকার লোভে—"

কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া নয়নে হস্তার্পণ করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "আবার সেই কথা? তোমরা কেবল ঐ কথাই বলাবলি করিতে আসিয়াছ? লক্ষ টাকা? কত লক্ষই বা তোমরা জান, আমার প্রাণে

অনেক লক্ষ লক্ষ শূল বিঁধিয়া রহিয়াছে। অপ্সরা যদি—আমার সুকুমারী অপ্সরা যদি এই সময় আমার—"

যে প্রহরী স্বর্গভূষণকে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, বেগতিক দেখিয়া সেই লোক সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সম্ভবমত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "টাকা দাও, দিতে না পার, জামিন দাও।"

অনেকক্ষণের পর নিস্তব্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ মহানন্দ রাও সেই পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের দাবী তোমার?"

"আদালতের হুকুম।"

দেনদারের নাম কি?"

"কুমার স্বর্গভূষণ রাও।"

"মোকদ্দমার নাম কি?"

"বিবাহিতা স্ত্রীকে গৃহ হইতে বাহির করা।"

"এ অপরাধে ত ফৌজদারী মামলা হয়, টাকার কথা বলিতেছ কেন?"

"ফরিয়াদী আছে। যাহার স্ত্রী, সেই লোক ফরিয়াদী।"

"ভাল বুঝিতে পারিলাম না,—নাম কর। সে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কে হইয়াছিল, নাম কর।"

"একজন রাজা বিরাটকেতু।"

কক্ষবাদনপূর্ব্বক লম্ফ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বিরাটকেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "বিরাটকেতু? বিরাটকেতু? ফরিয়াদীর নাম বিরাটকেতু? আমার নাম কি? মনে হয় হয়, ভুলিয়া যাই, এক দিন আমার নাম ছিল বিরাটকেতু। আমি কি তবে সেই মোকদ্দমায় ফরিয়াদী? হাঃ, হাঃ, হা! টাকা!—কত টাকার দাবী?—টাকা!—বল্ পেয়াদা বল্, কত টাকা?"

কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, জিজ্ঞাসা না করিয়া পেয়াদা উত্তর করিল, "বিশ হাজার।"

"বিশ—হা—জা—র! এই বই আর না? কুল্লে বিশ হা—জা—র! তবে হয় ত আমিই ফরিয়াদী।"

মহারাজ মহানন্দ রাও সান্ত্বনাবাক্যে বিরাটকেতুকে চুপ করাইয়া পুনর্ব্বার পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরোয়ানা আছে?"

"আছে।" কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া,—কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া পরোয়ানাধারী প্রহরী কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমের স্বরে উত্তর করি[illegible]ছে।"

"বাহির কর।"

পরোয়ানাবাহক পরোয়ানাখানি বাহির করিয়া মহারাজের হস্তে করিল। পার্সী অক্ষরে লেখা, মোহর করা পরোয়ানা। মহারাজের পার্সী বর্ণপরিচয় ছিল না। যাঁহারা যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা হিন্দী বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু পার্সী অক্ষর পড়িতে পারিতেন না। কেবল একমাত্র ভূপেশচন্দ্র পার্সী জানিতেন। মহারাজ মহানন্দ রাও আপন অজ্ঞাত পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধেও অজ্ঞাত। তিনি জানিতেন না, কিন্তু হরবিলাস জানিতেন। পিতার হস্ত হইতে পরোয়ানাখানি লইয়া কুমার হরবিলাস ভক্তিপূর্ণনয়নে ভূপেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সেইখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। ভূপেশচন্দ্র সকলকে শুনাইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী পাঠককে পার্সী কথা শুনাইতে আমাদের ইচ্ছা নাই, সুতরাং বাঙ্গালা করিয়া সেই পরোয়ানার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হইবে। পরোয়ানায় লেখা আছে :—

"এলাহাবাদপ্রবাসী রাজা রঘুবর রাও বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীস্বর্গভূষণ রাও বাহাদুর এক রাজা বিরাটকেতুর বিবাহিতা স্ত্রী শ্রীমতী জগৎকুমারী ওরফে মিহিরমোহিনী ওরফে কীর্ত্তিরাণী দেবীকে ফুস্‌লাইয়া ঘরের বাহির করা অপরাধে উক্ত রাজা বিরাটকেতু কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া অত্রাদালতে আসামী হওয়া এবং সাক্ষীগণের জোবানবন্দীতে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া এবং গোপনে পলায়ন করা প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি বিবরণে নথীর কাগজপত্র মোলাহেজায় চারি পাঁচ বার মুলতুবীসূত্রে ফরিয়াদীকে হাজির না পাওয়া বিধায়ে এক তরফা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সবতে হুকুম হইল যে, সম্ভ্রমের দাবী বিংশতি সহস্র মুদ্রা অত্র পরোয়ানার দ্বারা আসামীর নিকট হইতে আদায় করিয়া ফরিয়াদীকে দেওয়া যায়। ইতি"

মোকদ্দমার কথা সকলেই শুনিয়াছিলেন, সুতরাং কর্ণে তাহা নূতন বোধ হইল না, কেবল হুকুমটীই নূতন প্রকাশ। রাণী জগৎকুমারী বসিয়া বসিয়া যেন ঝিমাইতেছিলেন, মানুষের ঠিকুজীকোষ্ঠিতে যেমন ভূতভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান লেখা থাকে পরোয়ানার পাঠে সেইরূপ ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান শবণ . তিনি যেন অজ্ঞানে হইয়া শয়ন করিলেন। সে চক্ষু গেল না। মূর্চ্ছিতা রাণী একাকিনী সমস্ত লোকের .ত মূর্চ্ছার কোলে নিদ্রা গেলেন। রাজা বঘুবরের মহিষী মহালক্ষ্মী একবার দাঁড়াইয়া খানিকদূর গিয়া একটা সিন্ধুকের পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। কেন যে এই রহস্য, পাঠকমহাশয় তাহা ইতিপূর্ব্বে অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াছেন। গৃহমধ্যে যাঁহারা, তঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সে রহস্য জানেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। কেহ জগৎকুমারীকে, কেহ মহালক্ষ্মীকে সচেতন করিতে গেলেন। অজ্ঞানের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ভূপেশচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হইয়া জননীকে কহিলেন, "যতই কেন শত্রু হউক না, অযত্নে আমার সম্মুখে কেহ মরে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। যাহাতে উহাদের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়, দেবি! করুণাময়ি! তুমি তাহার চেষ্টা কর।"

এ দিকে ত এই পর্য্যন্ত। ও দিকে মহারাজ মহানন্দ রাও পর্ব্বতের মত অচঞ্চলভাবে সুস্থির গম্ভীরস্বরে পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আসামীকে চেন?"

"জী!"

"আচ্ছা! এ পরোয়ানা কি তুমি আজ পাইয়াছ?"

"জী!"

"কত দিন হুকুম হইয়াছে, তাহা কি তুমি জান?"

"জী!"

"অনেক দিন পূর্ব্বেই হুকুম হইাছে?"

"জী!"

"তবে এত দিন জারী করিতে আইস নাই কেন? ভুলিয়া গিয়া ছিলে কি?"

"জী!"

রাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া মহারাজ কহিলেন, "আ মোলো! আরে, এটাও পাগল! যত কথা জিজ্ঞাসা করি, সকল কথাতেই বলে, জী!

গায়দের মাহাত্ম্যই বোধ হয় এই রকম! একটা পে খানা পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছে, এটাও দেখি, বদ্ধপাগল!"

নারীসুলভ লজ্জায় কেবলমাত্র একটু মৃদুহাস্য করিয়া মহারাণী বিরজা-সুন্দরী অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। সেই মৃদুহাস্যেই রাজার অতগুলি কথার প্রকৃত উত্তর হইল।

গৃহ আবার নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। কথা আছে কেবল বিবাটকেতুর মুখে। নিস্তব্ধের সময় তিনি নিস্তব্ধ। কিন্তু পাগলের খেলা, আর চৈত্রমাসের চপলার খেলা, যাঁহারা এক সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদেব কথায় কথা কহিতে পারিবেন, হাঁ কিম্বা না। এক ঘরে দশজন। পাঁচজন হাসিতেছে, তিনজন কাঁদিতেছে, দুইজন চুপ্ করিয়া আছে। যদি হারহারিমতে ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে কে প্রফুল্ল, কে অপ্রফুল্ল, মীমাংসা করিতে হইবে। এখানে গণিত-শাস্ত্রের প্রয়োজন। ত্রৈরাশিকমতে গণনা করিলে যদি ভগ্নাংশ বাকী থাকে, তাহা হইলে সেই বাকী স্বর্গভূষণ। এই স্বর্গভূষণের মর্ম্মে মর্ম্মে কত তুষানল, তাহা অপরে জানে না। একটী যেন গল্পের কথা তাঁহার মনে পড়িল। জননী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, পিতা অধোমুখে বসিয়া আছেন, কাহারও দিকে চাহিতে পারিতেছেন না, তথাপি কল টিপিয়া দিলে কলের পুতুল যেমন উচুঁতে উঠে, নীচুতে নামে, তালে তালে নৃত্য করে, থাকিয়া থাকিয়া হাঁ করে, থাকিয়া থাকিয়া হাত মুখ নাড়ে, স্বর্গভূষণ ঠিক্ তেমনি খেলা করিতেছেন। বিড়্বিড়্ করিয়া আপনার মনে কি বকিতেছেন। কখনও দাঁড়াইতেছেন, কখনও বসিতে-ছেন, সর্ব্বক্ষণ অস্থির। মনে তাঁহার কি আছে, কেহই হয় ত জানিতেছেন না। কর্ণে একটী নাম প্রবেশ করিয়াছে। সে নাম মিহিরমোহিনী। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গল্পের কথা। গল্পে তিনি শুনিয়াছেন, জননীর কুমারী অবস্থায় ঐ নামে তাঁহার একটী ভগ্নী জন্মিয়াছিল। কে সে নাম দিয়াছিল, কে প্রতিপালন করিয়াছিল, কাহার গৃহে মিহিরমোহিনী ছিল, স্বর্গভূষণ তাহা জানিতেন না। নাম শুনিয়া আকাশ হইতে যেন তিনি পাতালে পড়িয়া গেলেন। নাম আবার কোথায়? মুসলমানের

আদালতের পরে পরে লেখা। দুই নাম জানা, এক নাম নূতন। রাগ হইল। পিতা যে তিনি ভূত বলিতেছিলেন, সেই ভূতের নয়নে বদনে রাগ। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বিরাটকেতু! কত প্রবঞ্চনা তুমি জান?"

কাটগড়ার ভিতর বিরাটকেতু তখন হাস্য করিতেছিলেন। নাম ধরিয়া কে ডাকে, জানিবার নিমিত্ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, সঙ্গী পাইয়াছেন। তিনিও যেমন রাজা, প্রশ্নকর্ত্তা ও সেইরূপ রাজপুত্র! পাগলে পাগলে বেশ মিল হয়। নূতন নূতন যাহারা কবি হইবার আকিঞ্চন পায়, সর্ব্বাগ্রে তাহারা বাক্যের মিল অন্বেষণ করে। পাগলের সঙ্গে কিসের মিল, অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত পঞ্চাশ অক্ষর আবৃত্তি করিয়া দাঁড় করায়। যেমন পাগল আর ছাগল। স্বর্গভূষন, মিহিরমোহিনী, আর রাজা বিরাটকেতু, এ তিনটী কেবল কবিতার বাক্যের মিলন মাত্র।

বলা হইয়াছে, গৃহমধ্যে তিনখানি তরবারি কোষমুক্ত। বিপক্ষ প্রবেশ করিলে নিস্তার পাইবে না, এটীও নিশ্চয়। কিন্তু যাঁহারা বিমুক্ত তরবারিধারী, তাঁহারা তখন স্বর্গভূষণকে বিপক্ষ জ্ঞান করিলেন না। পাগল মনে করিলেন। রাজা রঘুবর রাও যাহাকে ভূত ভাবিতেছিলেন, রঘুবর অপেক্ষা যাঁহারা জ্ঞানবান, তাঁহারা ভাবিলেন, পাগল।

মিহিরমোহিনীর চৈতন্য হইয়াছে। মহালক্ষ্মীর চৈতন্য হইয়াছে। যিনি যেখানে পড়িয়া ছিলেন, সেইখানেই বসিয়া অধোবদনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাপের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহাকে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত বলে না। মনে তাঁহাদের যে পাপ জাগে, অনুধ্যানে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতে নাই। পাপ কেহ জানেন, কেহ জানেন না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অনেক নক্ষত্র একত্র। কিন্তু এক দিকে যদি মেঘ থাকে, সে মেঘ গৃহস্থের রন্ধনগৃহের ধূমের মত শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া যায়। রাণী জগৎকুমারী হস্ত সঞ্চালনে কাহাকে যেন নিকটে আসিতে নিবারণ করিলেন। আবার যেন সেই গৃহ জনমানবের বাক্‌সঞ্চারশূন্য হইয়া গেল।

কে আসিল, কে কথা কহিতেছে, সম্মুখভাগে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এত লোকের মধ্যে কেহই তাহা মনোযোগ দিয়া চাহিয়া দেখিলেন না।

কিন্তু কে একজন আসিয়াছে। তাহার মুখে জোর জোর কথা। সে কহিতেছে, "দুই দণ্ডের জন্য অনুমতি ভিক্ষা, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিড় করিতেছ, কে তোমরা? মনে করিতেছ, তোমরাই বুঝি এই গৃহের রাজা? বাহির হইয়া যাও! এতদূর ধৃষ্টতা আমি সহ্য করিব না। আত্মীয় লোক যদি পাগল হয়, আত্মীয় লোক যদি দেখিতে চায়, অল্পক্ষণের জন্য আমরা অনুমতি দিয়া থাকি। দিয়াছিও তা, তোমরা তাহা পালন করিলে না; স্বহস্তে রাজক্ষমতা ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ভিতর হইতে গারদের দরজা বন্ধ করিয়াছ, রাজার হুকুম, বাহির হইতে এক দরজা ভগ্ন করিয়া আমি আসিয়াছি। মানে মানে তোমরা বাহির হইয়া যাও। রাজার হুকুম যদি অমান্য কর, এখনই গুলি করিয়া মারিব।" এই কথা বলিয়া সেই লোক বামহস্ত বিস্তারে দক্ষিণহস্ত সঙ্কোচে একটা বন্দুক প্রদর্শন করিল।

ব্যাঘ্রের মত ঝম্প দিয়া কুমার ভূপেশচন্দ্র তাহার সেই বন্দুকটা পদতলে পেষণ করিলেন।—দুই খণ্ডে চূর্ণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে এক পদাঘাত করিলেন। জলদস্বরে কহিলেন, "জানোয়ার! এত অহঙ্কার শোভা পায় না তোকে। অনেক ক্ষমা করিয়াছি, আরও অনেক ক্ষমা করিতে জানি। কিন্তু জানিস্ তুই নীচাশয়! ভূপেশচন্দ্র এখানে বর্ত্তমান, এই সকল মাননীয় রাজা, মহারাজা, এই সকল রাণী, মহারাণী, আর এই সকল স্নেহপাত্র রাজকুমার, রাজকুমারী কদাচ যবনের হাতে অপমান সহ্য করিবেন না। পেয়াদা! তুমি বিদায় পাও। বিংশতি সহস্র মুদ্রা তোমাদের প্রাপ্য নয়, রাজা বিরাটকেতুর প্রাপ্য। রাজা বসুবর রাও সেই টাকার জন্য দায়ী, স্বর্গভূষণ নয়। রাজা বিরাটকেতু আদালতের আজ্ঞানুসারে সেই টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া তুমি বিদায় পাও। জগৎকুমারী-আগুনে স্বর্গভূষণ পতঙ্গ। স্বইচ্ছায় দগ্ধ হইতে আসিয়া যাহারা দগ্ধ হইয়া মরে, মানুষ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। তোমরা হয় ত শুনিয়াছিলে, স্বর্গভূষণ মরিয়া গিয়াছে। তোমাদের হাকিমেরাও হয় ত শুনিয়াছিলেন, ঘুসের টাকার লোভে একটা ডাকাত রাত্রিকালে নদীর ধারে স্বর্গভূষণকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। কথা সত্য বটে, কিন্তু স্বর্গভূষণ মরে নাই। মনে কর, টাকা আদায় হইল। ফরিয়াদী পাগল, তাঁহার কন্যা

পরের কন্যা, কে তবে উত্তরাধিকারী? ছিল একজন। সূতিকাগৃহ হইতে তাহাকে ভূতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে! তবে আর রাজা বিরাটকেতুর উত্তরাধিকারী কে?—রাণী জগৎকুমারী?—নাম করিতে রসনা কলঙ্কিত হয়।—সেই বেশ্যা?—পেয়াদা! তুমি বিদায় হও। বিংশতি সহস্র মুদ্রা! তাহা এখন দিল্লীর ভাণ্ডারে জমা থাকুক্। প্রতাপান্বিত মোগলবংশের হীনাবস্থা,—দুরবস্থা। বিংশতি সহস্র এখন আকবরের বংশধরগণের অনেক উপকারে আসিতে পারিবে। রাজা বিরাটকেতুর আর অর্থে প্রয়াস নাই। থাকিলেই বা কি? নিমেষে নিমেষে, লহমে লহমে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন, বিংশতি সহস্রে তাহার আর কি প্রয়োজন? যদি প্রয়োজন থাকে, আমি দিব, আমি দায়ী থাকিলাম, আমি জামিন হইল্যাম, তুমি বিদায় পাও।"

আদালতের পেয়াদা চলিয়া গেল। আবার বলিতে হইল, তিনখানি তলোয়ার কোষমুক্ত। যে মুসলমান বীরত্ব দেখাইতে প্রবেশ করিয়াছিল, এক বালক তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিল। বুকের উপর দাঁড়াইল। দুই চক্ষে পদাঘাত করিল। আনোয়ার বখ্ত অজ্ঞান। কাট্‌গড়ার ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "বিংশতি সহস্র তোমরা হারাইয়া ফেলিলে? টাকার জন্যই আমি অপ্‌সরাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। টাকার জন্যই আমি স্বর্গভূষণকে আদর করিয়াছি। টাকার জন্যই আমি রঘুবর রাওকে বন্ধু বলিয়াছি। তোমরা কি ইহা জান না? কে কে তোমরা এখানে আছ? লক্ষ টাকা! ওঃ! আমার লক্ষ টাকা! আমার অপ্সরার দাম এক লক্ষ টাকা! সে দিন যখন আমার অপ্‌সরাকে—"

অপ্সরাসুন্দরী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "পিতা,—না,—আর আমি তোমাকে পিতা বলিব না,—মহারাজ! অপ্সরাসুন্দরীর দাম এক লক্ষ টাকা?—এক লক্ষ টাকার লোভে অপ্সরাসুন্দরীকে বাজারে তুমি বিক্রয় করিতেছিলে? কেন বল দেখি রাজা! অপ্সরা এখনও বাজারের দোকানে দোকানে, গৃহস্থের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে না। মনে এক নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্মভাব আছে, সেই ধর্ম্মভাব জলে, জঙ্গলে, রণস্থলে,

অনলে, বায়ুকোপে, সর্পমুখে, ব্যাঘ্রমুখে, শত্রুবিগ্রহে, কুগ্রহগ্রাসে, সকল স্থলেই সদাসর্ব্বদা অহরহ এই অপ্সরারে রক্ষা করে।"

মার মার কাট্ কাট্ বলিয়া তিনজন লোক সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অসি উত্তোলন করিয়া বিশ্বেশদয়াল তাহাদিগকে কাটিতে গেলেন। কতই গোলমাল হইয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র দাঁড়াইলেন। বিরোধে বাধা পড়িল। একটী লোক আসিয়া ভূপেশের কাণে কাণে কহিলেন, "তুমি যেমন চুপ্ করিয়া বসিয়া ছিলে, তেমনি থাক। আমি রহিয়াছি, আমিই তোমার উকীল হইব। উহারা কাহারা?"

রাণী জগৎকুমারী একটু পূর্ব্বে জ্ঞান পাইয়াছিলেন, আরও জ্ঞান পাইবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল। সেই জ্ঞানকে টানিয়া আনিবার জন্য তিনি প্রয়াস পাইতেছিলেন, কিন্তু কথা কহিবার অবকাশ হইল না। আর একজন কথা কহিলেন। এত জড়ান জড়ান কথা, সচরাচর সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। সে কথা স্বর্গভূষণের। তিনি কহিতেছিলেন, "কীর্ত্তি একটী নাম।"—অনেক কষ্টে বুঝিতে হইল, স্বর্গভূষণের রসনা উচ্চারণ করিল, "কীর্ত্তি একটী নাম।—সেই নাম,—আর এক নাম মিহিরমোহিনী।—মরিলাম না কেন? মিহিরমোহিনী যদি জগৎকুমারী, জগৎকুমারী যদি কীর্ত্তিদেবী, তবে আমি কে?—আমি ত মিহিরমোহিনীর ভ্রাতা।—উঃ! অপ্সরাসুন্দরীর জন্য আমি পাগল হইয়াছিলাম!"

নিষ্কোষিত অসি ঘন ঘন ঘূর্ণিত করিয়া ভূপেশচন্দ্র রণবেশে যেন গৃহমধ্যে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় চক্রে চক্রে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মুখে একমাত্র বাক্য, "নিস্তার নাই! স্বর্গভূষণ! কাহার কাছে কথা কহিতেছিস্? এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ছিলাম, কিন্তু আর ত না। অনেক দিন পূর্ব্বে জানিয়াছি, এখনও জানিতেছি, চক্ষেও দেখিতেছি, মিহিরমোহিনী তোর ভগিনী। তোর এই ভগিনী জগৎকুমারী নাম ধরিয়া বিরাটকেতুর গৃহে নূতন রাণী হইয়াছিল!"

"কৈ—কৈ? আমার জগৎকুমারী কৈ?"—হনূমানের মত লম্ফ দিয়া পাগল বিরাটকেতু কহিলেন, "আমার জগৎকুমারী কৈ?"

"তুমি কি চুপ্ করিয়া থাকিতে পার না?—একজন রাজা তোমাকে

নিষেধ করিতেছেন, আমি নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি কি এতই পাগল?—জানিতেছি, তুমি কেমন পাগল। তোমার জগৎকুমারী এক গণিকা।—মহালক্ষ্মীর কন্যা।—সতীসাধ্বী মহালক্ষ্মী! তোমাদের গুরু সেই অশ্বানন্দস্বামী।—উঃ! কতদূর সহ্য করিতেছি! এখনও যদি তোমরা নিজের নিজের পাপ স্পষ্ট স্পষ্ট অঙ্গীকার না কর,—হরবিলাস! আর কেন অপেক্ষা করিতেছ? কাহার অপেক্ষা? স্ত্রীহত্যার ভয় করিও না। কলঙ্কিনী পাপীয়সী রাক্ষসী, গণিকা, ইহার মস্তক,—না হরবিলাস! আমি ভুলিয়া বলিয়াছি। মারিতে নাই।—রাণী জগৎকুমারি! দেখিতেছ পাপের ফল? সাতঘাটের জল একঘাটে। চমৎকার চমৎকার তিন নাম তুমি কোথায় পাইয়াছিলে সতী?"

জগৎকুমারী আবার যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পাগলের পাগলত্বও যেন একটু একটু কমিয়া গেল। ভয়ে ভয়ে তিনি কহিলেন, "ভূপেশ! আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। আমার অপ্‌সরাসুন্দরী কোথায়?"

"বিরাটকেতু! বড় দুষ্টবুদ্ধি তোমার। তোমার রসনা আমি ছেদন করিয়া দিব। জানিতেছ না, আমি কে?—লক্ষ টাকা!—আমার প্রতি তোমার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা!—স্বর্ণভূষণ তোমার নূতন রাণীর মায়ের পেটের ভাই!—মহারাজ!—"

মহারাজ নামে কেহই উত্তর দিলেন না। স্বর্ণভূষণকে সম্বোধন করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "স্বর্ণভূষণ! এখন কি তুমি আমার উপর সেই প্রকার প্রভুত্ব করিতে পার? মনে করিয়া দেখ দেখি, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ দেখি, কোথাকার তুমি কোথায়?"—দেয়ালে পদাঘাত করিয়া বীরকুমার পুনরায় কহিলেন, "ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি, আমি কে? তুমি ত গণিকার সন্তান। মিহিরমোহিনী তোমার ভগিনী। জগৎকুমারী তোমার ভালবাসিবার সামগ্রী। গোপনে গোপনে কত কথা হইয়াছিল, তাহা কি আমি জানি না? অপ্‌সরাসুন্দরীকে হরণ করিবার জন্য তুমি কত চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানি না? মনে করিলেই তোমার মুণ্ডকে আমি রসাতলে পাঠাইয়া দিতে পারি। কিন্তু স্বর্ণভূষণ! গর্ব্ব আমি ভালবাসি না। তোমাকে—"

হস্তধারণ করিয়া হরবিলাস কহিলেন, "রাজকুমার। মশা মারিবার জন্য কেন এত আড়ম্বর?—মরিয়া ত গিয়াছে। রাজা ত বলিয়াছেন, ভূত হইয়াছে। তবে আর ভূতকে মারিবার নিমিত্ত তুমি আমি—"

বিকট চীৎকার করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "আমার অপ্সরা! আমার জগৎকুমারী?—তোরা কে? তোরা কাঁদিতে আসিতেছিস্, তোরা কে? লক্ষ টাকা!—বিংশতি সহস্র!—আমার ঐ মেয়ের দাম এত!—আমার এক রাণীর দাম এত। হুঁ, হুঁ, হুঁ! জগৎকুমারী আমার কৈ? এতগুলি অপ্সরা আসিয়াছিল!—আকাশে বুঝি চাঁদ আছে, তবে কেন ঘরে এত অন্ধকার? অপ্সরা! উঃ! অনেক অপ্সরা!—প্রাণ যায়! একটু জল দাও!"

ভূপেশচন্দ্র কাটগড়ার ভিতর হাত বাড়াইয়া বিরাটের বিরাটমুখে বিন্দু বিন্দু জল প্রদান করিলেন। পাগলটা যেন আরও পাগল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

রাজা রঘুবর রাও মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গে মূর্চ্ছিত লোক যেমন জাগিয়া উঠে, সেইরূপে জাগরিত হইয়া কাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, জানেন না, তবু,—তবু, আকাশকে যেন সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিহিরমোহিনী কোথায়? (শ্রীবিষ্ণু!) কাহার কথা কহিতে কাহার কথা কহিতেছি? স্বর্গভূষণ কোথায়? মরিয়াছিল, ডাকাতে কাটিয়াছিল, সর্ব্বশরীর খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল, লোকেরা দাহ করিতে লইয়া গিয়াছিল, শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, আবার কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল? দেখিতেছি, বাঁচিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তোমরা,—কে তোমরা? কিরূপে স্বর্গভূষণ বাঁচিয়া আসিল?"

আর কেহ কথা কহিলেন না। বেত্রহস্তে চতুর্ভুজ উঠিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—যদি সম্ভব হয়,—অনেক লোকের সম্মুখে একজন যদি মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইতে পারে,—সে কথায় স্বভাবকে কেহ যদি তিরস্কার করেন, করুন, তথাপি সেইভাবে দাঁড়াইয়া তিনি কহিলেন, স্বর্গভূষণ মরিয়াছিল, আবার বাঁচিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে আমি পশ্চিমদেশে গিয়াছিলাম। আছি ত পশ্চিমে, আরও পশ্চিমে।—কে জানে কোন্ স্থান,

নাম মনে পড়ে না। পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, কত যে কি,—কত যে কি দেখিয়াছি, তাড়াতাড়ি সকল কথা মনে আসিতেছে না। এক পাহাড়।—কালো কালো মেঘ।—কিন্তু মেঘ নয়। মানুষের চক্ষে দূরে দূরে পাহাড়েরাই ঠিক্ যেন মেঘ।—পাহাড়ের গায়ে গায়ে গরু উঠিতেছে, বাছুর উঠিতেছে, ছাগল উঠিতেছে, যেন আকাশের গায়ে নক্ষত্র।—নীচে একটী বাজার। সেই বাজারে দেখিলাম, হরিণমাংস বিক্রয় হইতেছে। ছোট ছোট করিয়া কাটা। ভাগে ভাগে পসরা। এক ভাগ আমি গ্রহণ করিলাম। তাহাতে অনেক খণ্ড। পঞ্চাশ কি ষাট, আশী কি একশত, তাহা আমি জানিলাম না। একজন পাণ্ডা আমার সঙ্গে ছিল, সেই পাণ্ডা কহিল, "মাংস এখানে বড় সস্তা।"—আচ্ছা বলিয়া আমি তাহা গ্রহণ করিলাম।

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "এত ভূমিকা করিতেছ কেন চতুর্ভুজ? স্বর্ণভূষণ মরিয়াছিল, তুমি শুনিয়াছিলে, আমরাও শুনিয়াছিলাম, তবে এত কেন ভূমিকা?"

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "ভূমিকা?—মানে আছে।—বনের ধারে অনেক গাছ ছিল। বাদামগাছ, সেগুনগাছ, সালগাছ, কদমগাছ, যেমন থাকে, সারি সারি তেমনি অনেকগুলি গাছ ছিল। মাংস কিনিয়াছি কি না, একটী গাছের অনেকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া সেই মাংসখণ্ডগুলি বাঁধিয়া লইলাম। অনেক দূর যাইতে হইল। রাত্রি যখন দেড় প্রহর, ঠিক সেই সময় বাসায় পৌঁছিলাম। পত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেখিলাম, তত খণ্ড খণ্ড মাংস একখানি হইয়াছে। বড় আশ্চর্য্য বিবেচনা হইল। পাতাগুলি ভাল করিয়া দেখিলাম। রাত্রে আর বাহির হইতে পারিলাম না। আহার করিলাম না, নিদ্রা হইল না, উষাকালে শয্যা হইতে উঠিলাম। পাতায় পাতায় মিলাইয়া গাছটী চিনিয়া লইলাম। বিতাসু ডাকাত স্বর্ণভূষণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছিল, সেই গাছের পাতা আনিয়া আমি সেই সকল ক্ষত স্থান জোড়া দিয়াছি। প্রাণ ছিল, দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল, একত্র করিয়াছি। সঞ্জীবনীমন্ত্রে মুনিঋষিরা যেরূপে মানুষের প্রাণ দিতেন, আমাকে সেরূপে প্রাণ দিতে হয় নাই। সেরূপ শক্তিই বা আমার কোথায়? কাটা অঙ্গ জোড়া দিয়াছি, দ্রব্যগুণের প্রসাদে।

কিন্তু প্রাণ কি আমি দিতে পারি? পারি কেবল প্রাণ থাকিতে বাঁচাইয়া আনিতে।"

একটু হাসিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন; "তাহা যদি তুমি পার, তবে জগৎকুমারীকে চিতাইয়া দিতে পারিতেছ না কেন?"

"কেন? জগৎকুমারী কি মরিতেছে?"

স্বর্গভূষণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, জগৎকুমারী।— অপ্সরাসুন্দরী।—কাহার সঙ্গে কথা কহিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। ইহাকেও চাই, উহাকেও চাই। একজন হইল কি না ভগ্নী, একজন হইল অগ্নি।—উভয় সঙ্কট। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা রঘুবর বাহাদুরের চরণে গিয়া শয়ন করিলেন। রঘুবর ত তখন পাগল। কে যে পাগল, কে যে পাগল না, আমরাও তাহা বলিয়া দিতে পারি না। রাণী জগৎকুমারী স্বর্গভূষণকে বড় ভালবাসেন। লুকাইয়া লুকাইয়া ছিছি! নাম পর্য্যন্ত লুকাইয়া পতির অজ্ঞাতে স্বর্গভূষণকে ঘরে আনিতেন। ভাই যে স্বর্গভূষণ, ইহা তাঁহার মনে ছিল না, কিম্বা জানা ছিল না। ঘরে এত লোক কেন? একজন পাগলকে সুস্থ করিবার জন্য রাজপরিবারের অনেক লোক একস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। কেহই কাহারও কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারিতেছেন না। জগৎকুমারীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কুমার ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "কতক্ষণ আছ? পাপ স্বীকার কর। কাল তোমাকে ক্ষণকালের মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে, কিন্তু কুলকলঙ্কিনি! মনে করিয়া রাখ, ভূপেশচন্দ্র আমি। অনেক পরামর্শ দিয়াছিলে। তুমি ভুলিয়া যাও নাই, আমি ভুলিয়া গিয়াছি। অপ্সরাকে পত্র লিখিয়াছিলে, রাজার পীড়া লিখিয়াছিলে, মনে আছে সব। কিন্তু রাক্ষসি! রাণী হইয়াছিলি কত দিনেব জন্য? ক্ষত্রিয়বংশ কবে লোপ প্রাপ্ত হইবে? ক্ষত্রিয়বংশে এমন রাক্ষসীও জন্মে? যে বংশে সীতা জন্মিয়াছিলেন, সাবিত্রী জন্মিয়াছিলেন, পদ্মিনী জন্মিয়াছিলেন, দময়ন্তী জন্মিয়াছিলেন, সেই বংশে তোর উদ্ভব রাক্ষসী?"

রাক্ষসী যেন মাথা উঁচু করিয়া দন্তবিকাশপূর্ব্বক দুই হস্তে চুল ছিঁড়িতে লাগিল। যাহারা ধূর্ত্ত, তাহাদের চাতুরী বুঝিয়া উঠা সামান্য

লোকের সাধ্য নয়। ভূপেশচন্দ্র পিতার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াও দুষ্ট লোককে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। যতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন, ততক্ষণের কথা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যখন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন সেই বীরকুমারকে থামাইয়া রাখা দুঃসাধ্য। হস্তের বিমুক্ত তরবারি ঘন ঘন ঘুরিতেছে। কাহাকে কি বলিবেন, মান আসিতেছে, আবার ক্ষণে ক্ষণে যেন ভুল হইতেছে। রাজা রঘুবর রাও যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যেন আবার তাহার মনে আসিতেছে, স্বর্গভূষণ বাঁচিয়া রহিয়াছে। মহালক্ষ্মীর মহানন্দ। ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "মিহিরমোহিনি! জগৎকুমারি! কীর্ত্তিদেবি! কাহার তুমি? যদি ধর্ম্মপথে থাক, বল, স্বর্গভূষণ তোমার কে? শশিকুমার তোমার কে? বিরাটকেতু তোমার কে?"

আকাশ হইতে যেন একটা নক্ষত্রপাত হইল। একখানি দর্পণ আনিয়া কে যেন জগৎকুমারীর মুখের কাছে একখানি ছবি দেখাইল। ছবিতে আঁকা আছে, দুইখানি প্রতিমা। একখানি পাপ আর একখানি নরক। এমন ছবি কে দেখিতে চায়? যাহারা মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, মনে জানে, যাহারা পৃথিবীতে অনেক পাপ করিয়াছে, সেই ছবি দেখিয়া তাহারাই শিহরিয়া উঠে।

পাগলাগারদে এত গোলমাল কিসের? হাসি আছে, থাক্। ক্রন্দন আছে, থাক্। পরিতাপ, অনুতাপ, যাহা কিছু আছে, থাক্। একটা মানুষ যেন মরিতেছিল, মরিতে মরিতে, মরিতে পারিল না।

'ঐ বুঝি সেই যমরাজা?—উঃ! এত কালো! চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নি বর্ষণ হইতেছে! কত সহস্র বাহু সহস্র সহস্র দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ধরিতে পারিতেছে না। সাবিত্রীসতী যমকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। অপ্সরা সতী কি ভয় দেখাইতে পারে না? দূর হতভাগা!—কে তুই পিশাচি! কথার সঙ্গে কথা কহিতেছিস্! অপ্সরাসুন্দরীকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছিস্? কিন্তু অপ্সরা কি মনের বস্তু ভুলিয়া যাইবে?"—এই সব কথা বলিয়া পাগল রাজা আবার বলিল, "তোমরা আবার কারা?—লোক আসিয়াছে, দূর করিয়া দাও। সতীর সতীত্ব রক্ষা করিতে যদি জান, যত্ন পাও। অযত্নে অনেক সামগ্রী মিলিতে পারে, তাহার মূল্য নাই।

আশা-চপলার নিয়মাবলী

বলা বাহুল্য, এক সুপ্রসিদ্ধ হস্তদ্বারা এই চমৎকার আখ্যায়িকা বিরচিত হইতেছে। পাঠকমহাশয়েরা ইহাতে আধুনিক মানব চরিত্রের বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। খণ্ডে খণ্ডে এইরূপ আটপেজী আট ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে, অন্যূন বিংশতি খণ্ডে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে "আশা চপলা" কাহারো নিকট প্রেরিত হইবে না। অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া বিনা মাশুলে পাঁচ টাকায় মফস্বলে রীতিমত এই পুস্তক পাঠাইতে পারিব। নতুবা মাসে মাসে মাশুল সমেত নগদ মূল্য পাঠাইলে সাড়ে চারি আনায় এক এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। কলিকাতার জন্য অগ্রিম মূল্য ৪৷৷০ চারি টাকা আট আনা ধার্য্য হইল।

মণিঅর্ডারে মূল্য পাঠাইলেই সুবিধা হইবে। ডাক টিকিট পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় এক আনা কমিশন আবশ্যক। অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য কোন প্রকার টিকিট গ্রহণ করা যাইবে না। টিকিট রেজেষ্টরী না করিয়া না দিলে, যদি খোয়া যায়, তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রহণ না করিলে সমস্ত মূল্যের দায়ী হইতে হইবে।

যদি আমরা পুস্তক সমাপ্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে মূল্য ফিরত দিব।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "তুমি কি আমার?" অপূর্ব্ব নবন্যাস। এই যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। "আশা-চপলার" গ্রাহক মহাশয়েরা সেই সম্পূর্ণ পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

করিন্থিয়ান প্রেস।
৩৩ নং নূতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

শ্রীউমাচরণ দাস,
প্রকাশক।

আশা-চপলা।

নবীন নবন্যাস।

ষষ্ঠদশ খণ্ড।

এ সংসারে আশাপারে কে যাইতে পারে ?
যে পারে সে ভালবাসে আশ চপলারে ॥

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

Calcutta:
PRINTED BY D. C. DASS AND COMPANY,
PUBLISHED BY
WOOMA CHURN DASS.
"CORINTHIAN" PRESS, 33, NEW CHINA BAZAR.
1885.

মূল্য চারি আনা। Price 4 Annas.

[illegible] যাহা পাওয়া যায়, তাহা [illegible]

পাগলটার এই কথাগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানের কথা পাওয়া গেল।—ঘরে অনেক লোক রহিয়াছে। কেবল সামান্য সামান্য লোক নহে, রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারাণী, রাজকুমার, রাজকুমারী,—ইঁহারা সকলে কি ঐ সকল কথা অগ্রাহ্য করিবেন?

পাগল কাঁপিল,—পাগল কাঁদিল,—পাগল হাসিল,—পাগল লাফাইল,—পাগল নাচিল,—নাচিতে নাচিতে কহিল, "আমার জগৎকুমারী কৈ?"

একটা মরা-মানুষ যেন মাটীতে পড়িয়া ছিল, হুপ্ করিয়া উঠিয়া বিকৃত ভঙ্গীতে, বিকৃতস্বরে কহিল, "তোর বুঝি জগৎকুমারী? পাগল হইয়াছিস্, পাগল হইয়া থাক্, তোর বুঝি জগৎকুমারী?—জগৎকুমারী আমার। অনেক টাকা দিয়া আমি জগৎকুমারীকে কিনিয়া লইয়াছি।"

"তুই কিনিয়াছিস্?—আমার জগৎকুমারীকে তুই কিনিয়াছিস্?—কে তুই?" ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে একটা রুক্ষকেশ লোক ভত লোকের পশ্চাৎ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রথম বক্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্ষে যেন তাহার রক্ত ছিল না। সর্ব্বশরীরে যেন রক্তের সঞ্চার বন্ধ। ফ্যাকাসে,—পাণ্ডু রোগী যেমন ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করে, ঠিক সেইরূপ বর্ণ। আননে বিন্দুমাত্র তেজস্বিতাচিহ্ন ছিল না, কিন্তু বাক্যে বিলক্ষণ তেজস্বিতার পরিচয়।—চুলগুলা রুক্ষ, কিন্তু ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া,—সেই সকল ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়া,—বাঙ্গালাদেশের ঢুলীরা ও খুলীরা যেরূপ চুল নাড়িয়া বাজনা বাজায়, সেইরূপ মাথা ঘুরাইয়া যেন নাচিতে নাচিতে সেই লোক কহিল, "আমার জগৎকুমারী তোর কেন?—দাঁড়া তুই! এক কীলে মাথা ফাটাইয়া দিব। জগৎকুমারি! আমার হৃদয়ের ঈশ্বরি! কোথায় আসিয়াছ? আমাকে সাক্ষী করিয়া বল দেখি,—বল ত ভাই!—কাহার তুমি? বিনামূল্যে তুমি আমাকে কিনিয়াছ, বিনামূল্যে আমি তোমাকে কিনিয়াছি। আবার কে কেনে? তুমি শয়ন করিয়া আছ? মূর্চ্ছা গিয়াছ?—কেন প্রণাধিকে! আমি নিকটে রহিয়াছি, আমার হৃদয়ে চৈতন্য আছে। চৈতন্যদায়িনি! তুমি কেন অচেতন?—জগৎকুমারী,—এ নাম

একবার একবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। এ নামে আগে আগে আমি তোমাকে চিনিতাম না ; এখন জানিতেছি, তুমিই জগৎকুমারী।”

পাগল নাচিয়া উঠিল। বাহির হইবার পথ নাই, পশুশালার ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেমন পিঞ্জরমধ্যে লাঙ্গূল ফুলাইয়া,—গোঁফদাড়ী ফুলাইয়া,—কাণ উচুঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—ঘন ঘন যেরূপ গর্জ্জন করে, কাট্‌গড়ার পাগল সেইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে গর্জ্জন করিয়া কহিল, “ও নাম আমার কাণে কে আনে ?—জগৎকুমারী কাহার ?—জগৎকুমারী কাহার কেনা ?”

বায়ু যেন ছুটিয়া গেল।—এক এক সময়, এক এক কারণে মাতালের যেমন নেসা ছুটিয়া যায়, এক এক সময়ে, এক এক কারণে নূতন পাগলের পাগলামীও তদ্রূপ অল্প অল্প ভাল হইয়া যায়। বলা হইয়াছে, এক রকমে লোকে পাগল হয় না। মানুষের পাগল হইবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। যে লোক প্রণয়ে পাগল,—প্রণয়ের ঈর্ষায় পাগল, চিকিৎসকেরা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম প্রণয়পাত্রী দেখাইয়া তাহাকে আরাম করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা বিরাট এক প্রকারে,—এক কারণে পাগল নহেন। হৃদয়ে তাঁহার প্রণয় আছে কি না, আমরা কিরূপে জানিব ? প্রণয়ের জন্য তিনি পাগল হইয়াছেন কি না, আমরা তাহা কিরূপে জানিব ? সত্য যদি স্নেহ থাকে, কন্যার স্নেহে যদি তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তিনিই বলিতে পারিবেন ; জ্ঞান থাকিলে তিনিই বলিতে পারিতেন।—টাকার শোকে যদি পাগল হইয়া থাকেন, টাকা ত আসিতেছিল, আদায় করিবার জন্য, জামীন লইবার জন্য, পেয়াদা ত আসিয়াছিল, রাজা ত ভাল হইলেন না।—কারণের ঠিক্ নাই। হয় ত অনেক কারণ একত্র ;—অনেক কারণে হয় ত বিরাটকেতু পাগল। জগৎকুমারীর নাম শুনিয়া তিনি আরও অধিক অস্থির হইলেন। মায়া একটী বস্তু, সে বস্তুকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। দর্পণে অবয়বের ছায়া পড়ে, কিন্তু মায়ার ছায়া পড়ে না। ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে জগতের সমস্ত বস্তুর ছায়া দর্পণে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের নয়ন-দর্পণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিমোহিনী মায়ার ছায়া ধরা যায় না। এক প্রকার ছায়া-চিত্র আছে, আধুনিক ইংরাজ যাহাকে ফটোগ্রাফ্ বলিয়া জানে, তাহার সঙ্গে প্রণয়ের ছবির চিত্র আসে না।

ফটোগ্রাফে দেয়ালের ছবি চিত্র হয়, অট্টালিকার ছায়া পড়ে, সারি সারি সৈন্যসামন্ত আঁকা যায়, মানুষের আকৃতি ধরিয়া লওয়া যায়, কিন্তু প্রণয়ের নিকট ছায়া বিজ্ঞানহারে; ফটোগ্রাফ্ যন্ত্রে প্রণয়ের ছবি উঠিতে পারে না। এখানে মানুষের চক্ষের ফটোগ্রাফ্। রাজা বিরাটকেতু মায়াবিমোহিত পাগল। জগৎকুমারীকে হারাইয়াছিলেন, অনেক দিনের পর মনে পড়িল। নাম শুনিয়া,—অনেক দিনের পর জগৎকুমারীকে মনে পড়িল। চীৎকার করিয়া কহিলেন, "নাম ধরিয়া জগৎকুমারীকে ডাকিতেছিস্, তুই কে?—আবার তুই কে?—দুজনে জগৎকুমারীকে ডাকিতেছিস্? জগৎকুমারী আমার। জগৎকুমারী আমার নূতন রাণী। তুই কিনিয়াছিস্? ও কিনিয়াছে, কথার কি মূল্য নাই?"

ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ যেমন আঁখি কচ্লাইয়া,—হাই তুলিয়া উঠিয়া বসে, ধূর্ত্তের চাতুরী বড়;—জগৎকুমারী সেইরূপে উঠিয়া বসিয়া নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া আধ আধস্বরে কহিলেন, "তিনজনে তিন কথা বলে। আমি জগৎকুমারী নই, আমি মিহিরমোহিনী নই, আমি কীর্ত্তিরাণী নই। তোমরা কেহই আমাকে চেন না।"

সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে নেত্র সঞ্চালন করিয়া আনন্দবিলাসিনী জগৎকুমারী কহিলেন, "আমি কেহই না। তোমরা তিনজনে আমারে যাহা মনে করিতেছ, আমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র সামগ্রী। আমি রেজিয়া বেগম;—যবনের পত্নী। কে আমারে চিনিতে পার, চিনিয়া লও দেখি?—আজমীরের রাজকুমার।—পুষ্করতীর্থের নিকটে একদিন একখানি গাড়ী লাগিয়াছিল, তোমাদের তিন জনের মধ্যে কে,—তাহা কি কেহ মনে করিতে পার? সঙ্গে একজন ছিলেন, তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদল ডাকাত আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তখন আমি রেজিয়া বেগম ছিলাম না; হিন্দু ছিলাম। উবাখণ্ডগ্রামে আর একজন রাজা আমারে ভাল বাসিয়াছিলেন, সেই রাজার নাম—"

ঝাঁকড়া চুল, রক্তশূন্য চক্ষু, সেই ব্যক্তি সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া জগৎকুমারীর মুখে এক থাবা দিয়া ভয়প্রদর্শনবাক্যে কহিলেন, "চুপ্ করিয়া থাক। নাম করিও না। তোমার সঙ্গে সেই রাজার কি সম্পর্ক?"

দন্তে হস্ত দংশন করিয়া, সেই হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে জগৎকুমারী কহিলেন, "কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র, আমার কাছে তাহার পরিচয় নাই। তোমার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, তুমি শশিকুমার।--তুমি শশিকুমার, রাজকুমার বলিয়া আমার কাছে পরিচয় দিয়াছিলে। তোমার পিতা ইন্দ্রসিংহ।—হা ধর্ম্ম! এত অধর্ম্ম তুমি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলে? এত অধর্ম্ম কোথায় গুপ্ত হইয়া রহিয়াছিল? তুমি শশিকুমার,—অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না, তাহাই যদি তুমি সত্য হও, আর বলিব না। কোথায় আজমীর, কোথায় মতিহারী, কোথায় প্রয়াগ, কোথায় বাঁকুড়া। এই ত আলো দেখিতেছিলাম; এই ত বিরাটকেতুকে দেখিতেছিলাম, এই ত স্বর্গভূষণকে দেখিতেছিলাম, অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা পড়িয়া গেল। কাহার কাছে আমি মনের বেদনা জানাইব! তিনজনেই বলে, আমার। কিন্তু আমি যে কাহার, তাহা কেহই জানে না।"

পাগল হাসিয়া উঠিল। রাসিয়া হাসিয়া কহিল, "রাণি! আমি ত পাগল, তুমিও কি পাগলিনী? হা! বিদ্যুৎ আসিতেছে, বজ্র আসিতেছে, আমাকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য আগুন জ্বালিয়া আসিতেছে। তুমি একটু দাঁড়াও। দুই হাত দিয়া আমার দুই চক্ষু ঢাকা দাও। দেখিতেছি আগুন আসিতেছে। আর যেন দেখিতে হয় না।—জগৎকুমারি! জন্মের মত আমাকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ? বড় ভালবাসিতাম। কত গহনা দিয়াছি, কত দাম দিয়াছি, কত বস্ত্র দিয়াছি, কত জুতা দিয়াছি, এক এক বস্ত্রের দাম বিশ লক্ষ টাকা। এক এক জুতার দাম পাঁচ লক্ষ টাকা। তখন তোমার নাম ছিল, আশা-প্রতিমা।"

"কে বলে, আশা-প্রতিমা? আমি রেজিয়া। আমার গর্ভ হইয়াছিল। সন্তান প্রসব করিয়াছি। তোমরা এখন আমারে চিনিয়া লও, যাহার আমি, তাহার কাছে যাই। পৃথিবী হইতে চলিয়া যাই। তোমরা তিনজনে বসিয়া বসিয়া কাঁদো।"

এ নাটকের আবার এক নূতন অঙ্ক। চতুর্ভুজলাল যেন নূতন হইয়া আসিয়া দুই হাতে দুই দলকে সরাইয়া দিয়া মিহিরমোহিনীকে কহিলেন, "বাড় মিহির! এত প্রলাপ বকিতেছ কি জন্য? যাহা তুমি, তাহা আমি জানি,

তুমি জান না। যাহার কন্যা তুমি, তাহা আমি জানি, তুমি জান না। পাপের নরকে তোমার মন ডুবিয়া গিয়াছে, ইহাই আমার যন্ত্রণা। বড় যত্নে পালন করিয়াছিলাম। আশা ছিল, সাধুকন্যা বলিয়া তোরে আমি লোকের কাছে দেখাইব। কিন্তু কুলকলঙ্কিনি! আমার সে আশা তুই নিরাশাসাগরে ভাসাইয়া ছিস! পিতা কে, মাতা কে, এখনও জানিতে বাকী আছে। পিতা অপেক্ষা, মাতা অপেক্ষা আমি তোমারে অধিক যত্নে রাখিয়াছিলাম, সমস্ত যত্নই বৃথা হইয়াছে।"

পাগল কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য মহারাজ মহানন্দ রাও নিকটে যাইতেছিলেন, সবিনয়ে সরাইয়া দিয়া চতুর্ভুজলাল অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। পাপীকে প্রবোধ দিতে হয়, তাপীকে প্রবোধ দিতে হয়, শোকে দুঃখে যাহারা বিহ্বল, তাহাদিগকেও প্রবোধ দিতে হয়; চতুর্ভুজ তাহা জানিতেন। সান্ত্বনাবচনে কহিলেন, "রাজা! তুমি রাজাই আছ। মনে কিছু বিকার জন্মিয়াছে, তাহা থাকিবে না। রাণী জগৎকুমারী বিভ্রমবিলাসে বিমোহিত হইয়া যে সকল কথা কহিতেছেন, তাহা তুমি শুনিও না; গ্রাহ্য করিও না। ওদিকে কাণও দিও না। ভুলিয়া যাও। তুমিও যেমন উন্মাদগ্রস্ত, রাণীও তেমনি উন্মাদিনী। তোমার রাণী তোমারই আছে। ভাল হও, তোমার রাণী তুমিই পাইবে।"

"পাইব?—পাইব?—তুমি কে আছ?"—কথা কহিতে কহিতে পাগল আরও পাগল হইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল," তুমি কে আছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? আমার জগৎকুমারী তোমার কে হয়? টাকা কোথায় গেল? পেয়াদা কোথায় গেল? স্বর্ণভূষণকে ধর। ভূত বুঝি সেই স্বর্ণভূষণ? আমি হারাইয়া গিয়াছি। আমি হারাইয়াছি,—রাণীকে হারাইয়াছি। তুমি বুঝি আজরাইলের বাপ? ধর ধর, আমাকে ধর! দেয়ালে রাক্ষস! গবাক্ষে রাক্ষস! পর্দার কাছে!-উপরে রাক্ষস! নীচে রাক্ষস! ধর, পড়িয়া যাই!—পড়িয়া যাই! ধর জগৎকুমারি! আমাকে ধর!"

সত্য সত্যই রাজা বিরাটকেতু পড়িয়া গেলেন। মাটীর মানুষ মাটীতে মিশাইয়া যায়, কিন্তু যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ অহঙ্কারের সীমা থাকে না। অহঙ্কার চূর্ণ করিবার একটী যন্ত্র আছে। অহঙ্কার চূর্ণ করিবার একজন

দেবতা আছেন। যিনি ভাঙ্গিতে পারেন, যিনি গড়িতে পারেন, তিনিই তিনি। আশ্চর্য্য তামাসা দেখ, এত লোক এক ঘরে, কিন্তু সকলেই যেন মাটীর পুতুল। কথা কহিবার শক্তি আছে, তথাপি সকলেই নিস্তব্ধ। কাজে অকাজে একজনের মুখে এক একটী কথা। একটী সুন্দরীকে তিন-জনে দাবী করিতেছে। সেই সুন্দরীর তিন নাম। ইহার উপরেও নিজে তিনি আর একটী নাম যোগ দিয়া দিতেছেন। সে নাম রেজিয়া বেগম। কাহারও কাহারও আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এক একজন কাঁপিতেছে। রাণী মহালক্ষ্মী একটু পূর্ব্বে অচেতন হইয়াছিলেন, পুনরায় যেন ভাবভঙ্গীতে চৈতন্তহারা হইতেছেন। এত লোকের সম্মুখে জীবনকালের মহা মহাপাপ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইবে,—ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া পড়িতেছে, ইহা চিন্তা করিয়াই মহালজ্জা। বলিতে হাসিও আইসে, দুঃখও হয়। জগৎকুমারীর হৃদয়েও তত লজ্জা। সংসারের লীলাখেলা বুঝা ভার। পাপসাগরে মানুষ যখন ডুবিয়া যায়, তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। চক্ষুর অগোচরে একজন অখিলপতি বিরাজ করেন, মনেও পড়ে না। ভাল কি মন্দ করিতেছি, বিবেচনা করিবারও ক্ষমতা থাকে না। রাণী মহালক্ষ্মী, রাণা জগৎকুমারী, এই দুটী রাণার দুইখানি বদন যেন রক্তবর্ণ লজ্জামাখা। হা জগদীশ! এত খেলাও তুমি জান! গণিকার বদনে এত লজ্জা রাখিয়া দিয়াছ? যাহাদিগের হৃদয়কে শত শত খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিলেও স্নেহবিন্দুর সঙ্গে, মমতাবিন্দুর সঙ্গে, রক্তবিন্দুর নিরীক্ষিত হয় না, তাহাদিগের হৃদয়ে কিরূপে যে লজ্জার আবির্ভাব হয়, সাধুসংসার তাহা বুঝিতে পারেন না। রাণা মহালক্ষ্মী, রাণী জগৎকুমারী, উভয়েই বেশ্যা। যাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদের পাপ-নাটকের অভিনয়, তাঁহারাও একগৃহে উপস্থিত। এ শঙ্কা,—এ লজ্জা আরও বড়।

পাগল রাজার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। কিন্তু তত অস্থির চরণ, তত অস্থির হস্ত, তত অস্থির রসনা, এই সময় যেন নির্জ্জীবের মত স্থির। কাটগড়ার ভিতরে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্প বাতাসে যেমন কদলী বৃক্ষ কাঁপে, বিরাটকেতু সেইরূপ কাঁপিতেছেন। ওদিকে শশিকুমার কাঁপিতেছেন, এ দিকে স্বর্গভূষণ কাঁপিতেছেন। তিনটী নর, দুটী নারী।

এই রঙ্গভূমিতে তৎকালে কেমন যে, এক বিসদৃশ ক্রীড়া, সাধারণ রঙ্গভূমির দর্শকবৃন্দ তেমন কখনও দর্শন করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। পাপের ফল একদিনে ফলে না। অল্প অল্প ধূম আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হয়। অল্পে অল্পে জমাট হয়, আবার অল্পে অল্পে তরল হয়। সেই তরল অবস্থায় মাটীতে পড়িয়া আবার বৃষ্টি হয়। জলের বাষ্প আর আগুনের ধূম আকাশে আর পৃথিবীতে এইরূপ কাজ করে। স্বর্গভূষণের পাপের ফল একদিন হাতে হাতেই ফলিতেছিল, সংসারকুণ্ড ছাড়া,—আর কোন স্বতন্ত্র নরককুণ্ড আছে কি না, বলা যায় না, মরিলে স্বর্গভূষণ সেই নরককুণ্ডে প্রবেশ করিতেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু মরিতে মরিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অজ্ঞাত বৃক্ষপত্রের রস মালিস করিয়া চতুর্ভুজ তাঁহার ক্ষতস্থানগুলি জুড়িয়া দিয়াছেন। প্রাণবায়ু উড়িয়া গেলে মানুষে তাহা ধরিয়া দিতে কিম্বা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয় না। স্বর্গভূষণের ক্ষতদেহে প্রাণ ছিল, চতুর্ভুজ বাহ্য চিকিৎসায় তাঁহাকে বাচাইয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় তিনিই জানেন। আমাদের বৈকণ্ঠনাথের একটী নাম চতুর্ভুজ। তিনি যে পাপী লোককে অধিক দিন সংসারে বাঁচাইয়া রাখেন কেন, তাহার কারণ আমরা কতক কতক বুঝিতে পারি। সাধুলোককে শীঘ্র শীঘ্র আকর্ষণ করেন কেন, বর্ত্তমানযুগে তাহাও আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু প্রয়াগের চতুর্ভুজ মুমূর্ষু স্বর্গভূষণকে কি অভিপ্রায়ে বাচাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠকমহাশয় বিবেচনা করিয়া লইবেন। পরিদৃশ্যমান কার্য্যক্ষেত্রেই তাহার যথাযথ পরিচয় প্রকাশ হইবে।

চতুর্ভুজলাল পুনরায় সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরবদনে, গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রাজা বিরাটকেতু! তোমার সন্ধান পাইয়া তোমাকে দেখিতেই আমি আসিয়াছি। এতগুলি লোক এখানে একত্র হইবেন, এ আশা আমার ছিল না। কিন্তু এক প্রকার হইল ভাল। যাঁহাকে যাঁহাকে আমি যে অবস্থায় রক্ষা করিয়াছি, যে অবস্থায় দর্শন করিয়াছি, যে অবস্থায় সৎপরামর্শ দিয়াছি, ঘটনাক্রমে, ঘটনার অনুরোধে, এক এক সময় যাঁহাকে যাঁহাকে আমি কিছু কিছু মন্ত্রণা দিয়া কুঘটন ঘটাইয়াছি, তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক রূপে দেখিতে পাইলে মনের ক্ষোভ

দূর হইত না; আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত না। এখন হইল ভাল। যাঁহাদিগকে প্রয়োজন, তাঁহারা সকলেই একসঙ্গে এখানে। আমার প্রয়োজনমত সাধুসমষ্টি, অসাধুসমষ্টি। কতগুলি কথা আমার বলিবার আছে, তাহা তোমরাই বুঝিতে পারিবে। রাজা বিরাটকেতু! সত্য সত্য তুমি জ্ঞান-শূন্য পাগল হও নাই। আমি তোমার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এখনও তোমার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে। যখন নিতান্ত অস্থির হও, তখন মানসের চাঞ্চল্য জন্মে, সত্য, কিন্তু নয়নের ভঙ্গীতে, বদনের ভাবে, আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মান-সম্ভ্রমের কথা তুমি ভুলিয়া যাও নাই। লজ্জা আর ভয়কে হৃদয় হইতে তুমি বিদায় করিয়া দাও নাই। একটা বিশেষ উপকার হইয়াছে। তোমার যেরূপ উগ্রস্বভাব ছিল, কারণ উপস্থিত না থাকিলেও হঠাৎ তোমার যেরূপ অসম্ভব ক্রোধ জন্মিত, তাহার লাঘব হইয়াছে। এক প্রকার বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছ। পাগল হইলেই হাসিতে হয়, ইহা মনে করিয়া তুমি সর্ব্বদা হাস্য কর। তাহাতেই রাগের ভাগ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে,—উপকার হইয়াছে। কথা বলিলে এখন তুমি বুঝিতে পারিবে। রাজা! আমার একটীও কথায় তুমি অবিশ্বাস করিও না। যাহা বলি, স্থিরমনে, স্থিরকর্ণে শ্রবণ কর। তোমাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতাম। এখনও সে শ্রদ্ধা লঘু হয় নাই। স্বর্গীয়া মহিষী যথার্থই আমার পূজার পাত্রী ছিলেন। স্বর্গীয়া দেবীর মত আমি তাহাকে ভক্তি করিতাম। অকালে তিনি সংসারলীলা পরিত্যাগ করিয়া গোলোকধামে প্রস্থান করিয়াছেন। যদিও দুঃখের বিষয়, কিন্তু একপ্রকার মঙ্গল। এই সকল অদর্শনীয়, অশ্রবণীয় পাপ তাঁহাকে দেখিতেও হইল না, শুনিতেও হইল না। রাজা! তোমার নূতন রাণী এই জগৎকুমারী বেশ্যা।—জগৎকুমারীর দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া,—সেই অঙ্গুলী আবার মহালক্ষ্মীর দিকে ঘুরাইয়া কিঞ্চিৎ বিরাটস্বরে বহুতত্ত্বজ্ঞ চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "এই কুলটা মহালক্ষ্মী ইহার জননী। অশ্বানন্দ নামে এক-জন ভেকধারী গুরুজী,—ঘোর পাষণ্ড বাওয়াজী, তোমার জগৎকুমারীর জন্মদাতা পিতা। এই কুলটা মহালক্ষ্মী অবিবাহিতা অবস্থায় কুমারীব্রত ভঙ্গ করিয়া এই কুলটা ভুজঙ্গিনী মিছিয়াকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল।

সমস্ত গুহ্যকথাই আমি জানি। কিরূপে জানি, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। রূপ দেখিয়া প্রথমে আমি ইহার নাম রাখি, মিহির-মোহিনী। শৈশবের বুদ্ধি আর শৈশবের কার্য্য দেখিয়া নাম হয়, কীর্ত্তি; তাহার পর তৃতীয় নাম জগৎকুমারী। আবার এই কালসাপিনী আপনার মুখেই বলিতেছে, ইহার আর এক নাম রেজিয়া বেগম। কেমন মিহিরা! আমাকে চিনিতে পারিস্? অনেক দুগ্ধ দিয়া এই কালসর্পের বাচ্ছাকে আমি পোষণ করিয়াছিলাম। রাজা বিরাটকেতু! পূর্ব্বে তোমার জগৎকুমারীর বিবাহ হয় নাই। তুমি যখন বিবাহ করিয়াছ, তখন সত্যই অবিবাহিতা, কিন্তু এই পাপীয়সী শৈশবকাল অতিক্রম করিয়াই শশিকুমারনামে কথিত, আজমীরের রাজপুত্রনামে মিথ্যা পরিচিয়ে পরিচিত এক দুরন্ত যুবাপুরুষের সহিত অকথ্য ঘৃণিত পাপবিলাসে প্রবৃত্তি হয়। তাহার পর তোমার পত্নী হইয়া স্বর্গভূষণের সঙ্গে হাস্যকৌতুক চালায়। দিল্লীনগরে রেজিয়া সাজিয়া যবনের অন্তঃপুরে বাস করে। তাহার পর—কেমন মিহিরা! আমার কথা বুঝিতে পারিতেছিস্? নাড়ীনক্ষত্র সমস্তই আমি জানি। কথা শুনিয়া তোর প্রাণে কি একটু একটু ভয় হইতেছে? রাজা বিরাটকেতু দুই চক্ষু ঢাকিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিলেন। সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, তিনি কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন না। বড় বড় চুলগুলি কপালের উপর দিয়া নামিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, ছোট ছোট সাপের মত, কিম্বা বড় বড় বৃক্ষের শিকড়ের মত, কিম্বা প্রাচীন বটবৃক্ষের ঝুরির মত, অনেকগুলি সরু সরু পদার্থ উচ্চস্থান হইতে মাটীতে লতাইতেছে। চতুর্ভুজ কহিলেন, "রাজা! মুখ তুলিয়া চাও। অপমানে তোমার যে অপমান বোধ হইতেছে, কলঙ্কে তোমার যে কলঙ্ক জ্ঞান হইতেছে, পাগল-প্রাণে তোমার যে লজ্জাভয় আসিয়াছে, ইহাতে আমি সুখী হইলাম। এমন মনে করিও না যে, তোমার কষ্টে আমি সুখী। তাহা নহে রাজা! সেটী আমার পক্ষে প্রভুর অভিসম্পাত। তুমি ভাল হও, আবার মানুষের মত হইয়া তুমি দশের কাছে মান্য গণ্য হও, ইহাই আমার বাসনা, ইহাই আমার কামনা। কে তোমাকে পাগল করিয়াছে? কিসে,—কিসের জন্য তুমি পাগল হইয়াছ, তাহার ইতিহাস কি আমাকে বলিতে পার? লোকের

মুখে শুনিয়াছি, তোমার মুখেও শুনিলাম, এক লক্ষ।—পুনঃপুন বলিয়াছ এক লক্ষ। থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছ, বিংশতি সহস্র,— কিন্তু মহারাজ!—"

চতুর্ভুজলাল একজন বহুদর্শী লোক। তিনি জানেন, পাগলের মান বাড়াইয়া কিছু তোষামোদ করিতে পারিলে অনেক মনের কথা টানিয়া লওয়া যায়। সেইটী স্মরণ করিয়াই তিনি সম্বোধন করিলেন, মহারাজ!

নয়নের হস্তাবরণ অযত্নে মোচন করিয়া বিবাটকেতু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সম্বোধনকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিলেন। কি যেন ভাবিতেছিলেন, ভুলিয়া গিয়া শীঘ্র শীঘ্র জড়াইয়া জড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নামটী কি ভাল, অনেকক্ষণ তাহাই ভাবিতেছিলাম। তুমি অনেক প্রকার ভাল কথা কহিতেছ। আমার প্রাণ যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। নিমেষে নিমেষে আমি যেন হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া উঠিতেছি। জগৎকুমারী কি যবনী? জগৎকুমারীর নাম কি রেজিয়া বেগম? যবনী সংস্পর্শে আমি ত তবে মুসলমান হইয়াছি! আমার ত তবে জাতি গিয়াছে! কাটগড়া! তুমি ভাঙ্গিয়া যাইও না! যেমন খাড়া আছ, তেমনি থাক।—ঝুঁকিয়া পড়িও না। যবনী যেন আর আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। কেহই যেন আর আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। মুসলমানের রাজত্বে আমি অস্পর্শীয় মুসলমান। তুমি, তোমার নামটী কি ভাল, মনে করিতেছি, আর ভুলিয়া যাইতেছি। কি কথা বলিতেছিলে, চুপ্ করিলে কেন? বলিয়া যাও। সে নামটাও আমার কর্ণে এখনো ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাইতেছে। শ—শী—কু—মা-র! শৈশবকালের পর সেই লোক এই জগৎকুমারীকে—"

"হাঁ মহারাজ! আমি মিথ্যাকথা শিখি নাই। প্রতারণা অভ্যাস করি নাই। তোমার অর্থে বহু দিন আমার দেহপোষণ হইয়াছে। অপমান মনে করিও না, অভিমান সরাইয়া রাখ, একটী পুরাতন কথা মনে করাইয়া দিই। তুমি পেয়াদা ছিলে। বাদসাহ-সংসারে সামান্য বেতনে তুমি পেয়াদাগিরী করিতে। সৎপরামর্শ দিয়া, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া, ক্রমে ক্রমে তোমাকে আমি ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলি। হিতব্রতে ব্রতী করিয়া রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিই। দিল্লীশ্বরকে সাদরে

অনেক অনুরোধ জানাইয়া রাজা উপাধি প্রদান করাই। শ্লাঘা করিতেছি না, তোমার কাছে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। তুমিও আমার কাছে কিঞ্চিৎ উপকার পাইয়াছ। মানবসংসারে এইপ্রকারেই পরস্পর উপকার বিনিময় হয়। কিন্তু মহারাজ! আজ যেন তুমি পাগল, এত দিন ত পাগল ছিলে না; তথাপি যেন সময়ে সময়ে পাগলের মত কার্য্য করিয়াছ। ধর্ম্ম-শীলা রাজ্ঞী যখন স্বর্গে যান, তখন অপ্সরাসুন্দরী খুব ছোট। কোথায় অপ্সরাকে পাইয়াছিলে, কিরূপ ঘটনায় অপ্সরাসুন্দরী মিলিয়াছিল, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি, রাণীও জানিতেন। কিন্তু অপর সাধারণে প্রকাশ পায় নাই। সকলেই মনে করিত, সেই রাণীর গর্ভে এই অপ্সরার জন্ম। এত দিন গিয়াছে, তবু এখনও অনেকে মনে করে, তাহাই সত্য। ছেলেবেলা অপ্সরাসুন্দরীর বর্ণপরিচয় ছিল না। অঙ্গুরী পাইয়াছিলেন, অঙ্গুরী আনিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে যে পত্র ছিল, অজ্ঞান বালিকা সে পত্র পাঠ করিতে জানিতেন না। অঙ্গুরী ত অঙ্গুরী,—পত্র ত পত্র,—কি ত কি! কিছুই জানা ছিল না। তাহার পর যখন পাঠ কবিতে শিখিলেন, তখন সংক্ষেপে এই মাত্র জানা হইল, উদয়সিংহ। কেমন অপ্সরা! আমি যে কথা বলিতেছি, ইহাই ত ঠিক্ কথা? পত্র পাঠ করিয়া তুমি কি জানিতে পারিয়াছিলে, মহারাজ উদয়সিংহ কোন্ দেশের রাজা? পত্র পাঠ করিয়া তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছিলে, কোন্ প্রতাপশালী উদয়সিংহের দুহিতা তুমি? কিছুই বুঝিতে পার নাই। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ উদয়সিংহ যত দিন তোমার সঙ্গে দেখা না করিয়াছিলেন, তত দিন তুমি জানিতে, উদয়সিংহ স্বর্গে। ছদ্মবেশে যখন তিনি বিজয়কেতু নামে প্রয়াগধামে আগমন করেন, তখনও কি তুমি জানিতে, সেই অজ্ঞাত অপরিচিত মহারাজ উদয়সিংহ তোমার জন্মদাতা পিতা?”

অপ্সরাসুন্দরী মাথা নাড়িলেন। সেই মাথা নাড়াতে এককালে দুই ভাব প্রকাশ পাইল। যিনি বুঝিতে পারিলেন, হাঁ, তিনি তাহাই বুঝিয়া লইলেন। যিনি বুঝিলেন বিপরীত, তিনি জানিলেন, অপ্সরাসুন্দরী যেন “না” বলিলেন। মুখে একটীও কথা ফুটিল না।

শশিকুমার ছট্‌ফট করিতেছেন। পলায়নের চেষ্টা মনে আছে, কিন্তু

অত লোকের সম্মুখ হইতে কিরূপে পলায়ন করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। অবসর অতি অল্প। মানুষ যখন মরিয়া হইয়া ছুটিয়া বাহির হয়, তখনও তাহার প্রাণে এক প্রকার গোপনীয় ভয় থাকে। শশিকুমার সেই ভয়ে কম্পিত হইতেছেন। নিজের পরিচয় নিজে জানেন না, পলায়ন না করিলেও হয় ত নিরাপদে থাকিতে পারিতেন, অন্ধকারে একটু ভরসা। শশিকুমারের সঙ্গে স্বর্গভূষণের মনের ভাবের অনেক তফাৎ আছে। স্বর্গভূষণ পাপী, তাঁহার চৈতন্য তাঁহাকে মুহুর্মুহু সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শশিকুমারের চৈতন্য অন্য কথা শুনাইতেছে না। কে কোন্ দিক দিয়া কোথায় যাইবে, পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। কাহার পন্থা কোন্ দিকে, কেহই জানিতেছে না। পুরুষ পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, নারী পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, পাপীর হৃদয় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হইতেছে। সে আগুনে জল দিবার লোক নাই। তিন জন রাজকুমার তিনখানি তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়াছেন। সাধুলোক সচ্ছন্দে গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু অসাধু উঠিলেই মুণ্ড ভূতলে গড়াগড়ি যাইবে। এই ভয় পাপী লোকের মনে সর্ব্বক্ষণ জাগে। যাহাদের প্রাণে পৃথিবীর কোন উপকার নাই, তাহারা বাঁচিতে ভালবাসে। যাঁহাদের প্রাণে জগৎপ্রাণির উপকার, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্রই জগৎ হইতে পলায়ন করিতে চান। বিশ্বনাটকের এ খেলা বড় মন্দ খেলা নয়।

চতুর্ভুজ কহিলেন, "অনেক কথা ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মহারাজ বিরাটকেতু! তুমি অপ্সরাসুন্দরীর পিতা নও। স্বর্গবাসিনী রাণীর গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রচার হইয়া পড়ে, সূতিকা-গৃহ হইতে সেই পুত্রকে ভূতে লইয়া গিয়াছে।"

পাগল রাজা অনেকক্ষণ মৌন হইয়া ছিলেন। কি হইল, কি হইতেছে, কি হইবে, কি শুনিতেছি, কি শুনিলাম, কি শুনিতে হইবে, অন্ত মনে এই সকল ভাবনা করিতেছিলেন। চতুর্ভুজের ঐ কথা যেন সে ভাবনা ভুলাইয়া দিল। উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিরাটকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত তবে কোথায় গেল? যে মরে, সেই ত ভূত হয়। স্বর্গভূষণ মরিয়াছিল, স্বর্গভূষণ বুঝি ভূত হইয়া আসিয়াছে?"

"না,—স্বর্গভূষণ ভূত হয় নাই। পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া রঘুবর বলিয়াছিলেন ভূত, কিন্তু তাহা নয়। স্বর্গভূষণ তোমার বন্ধু। ঘাটে, মাঠে, পথে, বনে, যে স্বর্গভূষণ কুকুর লইয়া খেলা করেন, সেই স্বর্গভূষণ তোমার পরমবন্ধু।—তোমারও বন্ধু, জগৎকুমারীরও বন্ধু।—ঐখানেই তোমার লক্ষ টাকা। সকাল নাই, বিকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, রাত্রি নাই, নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে তুমি ঘরে আন,—লক্ষ টাকার আশা তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না।"—পাগলকে এই কথা বলিয়া রাজা রঘুবরকে সম্বোধন পূর্ব্বক চতুর্ভুজ কহিলেন, "রাজা! আজ আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার স্বর্গভূষণকে বাঁচাইয়া আনিয়াছি। কৃতজ্ঞতা চাহি না, স্বর্গভূষণের নামে আমি পদাঘাত করিব। এই পাপাত্মা, রাজা বিরাটকেতুর দুই কুলে কালী দিয়াছে। এই পাপাত্মা, বিরাটকেতুকে পাগল করিয়াছে। এই পাপাত্মা, মহারাজ উদয়সিংহের কন্যাকে দেশত্যাগিনী করিয়াছে। পৃথিবী ইহাকে ক্ষমা করিবেন না। ধর্ম্ম ইহাকে ক্ষমা করিবেন না; প্রকৃতি ইহাকে ক্ষমা করিবেন না। আমি চতুর্ভুজ, আমি সামান্য মানুষ; আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু আমি ক্ষমা করিলে কি হইবে রাজা? চারি দিকে আগুন জ্বলিতেছে। সূর্য্যদেব আগুন হইয়া পৃথিবীতে ঝাঁপ দিতেছেন। নক্ষত্রেরা আগুন হইয়া, জীমূতবাহনের বজ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া,—ঐ দেখ, শত শত খণ্ডের অগ্নি, ধরাতলে নামিতেছে। চন্দ্রের সুশীতল কর আগুন হইয়াছে। সেই জ্বলন্ত আগুন ধরাধামে, এই বাতুলালয়ে প্রবেশ করিতেছে। সমুদ্রের বাড়বানল এই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। রাজা রঘুবর! তোমার পুত্রের পাপে জলের আগুন জলে ভেজে না। কাননের দাবানল দিগ্‌দাহ করিতে করিতে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই দিকে আসিতেছে।—হাঁ করিয়া যেন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আগুনের মূর্ত্তি কেমন দেখিতেছ রাজা! অত পবিত্র বস্তু, পবিত্র আগুন অপবিত্র শরীরকে ভস্ম করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই জন্যই একটু অগ্রে বলিয়াছিলাম, সংসার হইতে স্বতন্ত্র নরক আছে কি না, বলা যায় না। তোমরা চাহিয়া দেখ, অগ্নিক্ষেত্র। আমি বিরাটকেতুর সঙ্গে কথা কই।—মহারাজ! সূতিকাগৃহ হইতে তোমার শিশু পুত্রকে ভূতে

লইয়া গিয়াছে। কত দিনের কথা, কত দিন পূর্ব্বে লইয়া গিয়াছিল, তোমার মনে হইতে পারে, কিম্বা হয় ত পারেও না, সেই পুত্র এই খানেই আছে। রাণী জগৎকুমারি! কাহার কথা আমি বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ?” রাণী জগৎকুমারী শয়ন করিলেন। জ্ঞান গেল না, লজ্জা গেল না, লোক দেখাইবার অভিমান পলায়ন করিল না। কেমন একটা ভয় আসিল। ভয়ের সঙ্গে, ভয়ের কোলে, ধরণী-কোলে রাণী শয়ন করিলেন।

“কি কর রাণী, কি কর? শয়ন করিলে হইবে না। মায়া ছাড়ো! মায়া দেখাইলে হইবে না। যাহা দেখাইতে আসিয়াছ, শেষ পর্য্যন্ত দেখাও। কাহাকে ভূতে লইয়া গিয়াছিল, মনে করিতে পার? বাঁকুড়া জেলার দেবদারু বৃক্ষ; অট্টালিকার গবাক্ষ। একবার বন্ধ করিতেছে, একবার উদ্ঘাটন করিতেছে, মনে পড়ে? যুগল মিলন হইয়াছিল, মনে পড়ে? কথা ঢাকা দিলে আমি ভুলিব না।”

রঘুবর রাও কহিলেন, ‘চতুর্ভুজ! আমি যেন দেখিতেছি, বিরাটকেতু অপেক্ষা তুমি বেশী পাগল। কত প্রকারের কথা যে তুমি ঝড়ের মত বর্ষণ করিতেছ, আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, “তাহাই ত বটে রাজা! আমিই ত ঝড় বকিতেছি! তুমি তোমার পুত্রকে ধরিয়া বসাও। যাহার উপর তোমার স্বর্গভূষণের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ, মর্ম্মান্তিক ঈর্ষা, সেই বীরকুমার ভূপেশচন্দ্র এখানে বিদ্যমান। ভূপেশচন্দ্র ক্ষমা করিতে জানেন, ধৈর্য্য রাখিতে জানেন, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা রাখেন, সেই নিমিত্তই এতক্ষণ ক্ষমা, সেই নিমিত্তই এতক্ষণ রক্ষা। তাঁহার কাছে আমরা কেহই না। রঘুবর! মানগর্ব্ব বুকে করিয়া রাখ। অনেক কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। পদে পদে আমাকে বাধা দিয়া ভাল করিতেছ না। শীঘ্র আর তোমার স্বর্গভূষণের অমঙ্গল নাই। যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছি, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে দাও। রাজা রঘুবর! তোমার পুত্র স্বর্গভূষণ অকালে কালকবলে প্রেরিত হইবে না। হইবার হইলে পাপাচার বিতাসুর হস্তেই নিশ্চয় জীবনান্ত হইত। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের প্রয়োজনেই স্বর্গভূষণের জীবন

স্বর্গভূষণের শরীরে ধিকি ধিকি ক্রীড়া করিতেছে। পাগলের কাছে আসিলে কত প্রকার পাগলের কথা শিক্ষা করিতে হয়। আমি শিখিয়াছি, তুমি জান না রাজা! তোমার স্বর্গভূষণ জানিতে পারেন না। কিন্তু কেবল দেখ, আর চুপ্ করিয়া থাক।"

বাতুলালয় স্তম্ভিত। মেঘ আছে, বৃষ্টি নাই। আকাশ আছে, নক্ষত্র নাই, বাতাস নাই। রাত্রি অনেক. কিন্তু দুই প্রহর হইতে দুই এক দণ্ড বাকী। সেই ছবিটী মনে করিয়া দেখিলে নিকটে যেমন এক প্রকার ভয় কিম্বা বিস্ময় কিম্বা আনন্দ আইসে, তাহাই যেন এখন। সকলেই একজন বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া।—মহারাজ বিরাটকেতুকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "রাজা! আর একটু স্থির হইয়া আমর কথা শুন। ছেলেটী ত ভূতে লইয়া গেল। মেয়েটী ত কোন্ দেশ হইতে আসিয়া তোমার নিজের মেয়ে হইল। মেয়েটীকে ত তুমি রঘুবরের পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার 'সম্বন্ধ করিলে। অজ্ঞাতকুলশীল, অজ্ঞাতপরিচয়, অজ্ঞাতনামধাম' ভূপেশ-চন্দ্র তোমার আলয়ে অনেক দিন ছিলেন।"

"দূর কর! দূর কর! দূর করিয়া দাও! চতুর্ভুজ! ও নাম করিও না। আমাকে একটু জুড়াইতে দাও! আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও! দাসীপুত্রের কথা আমার কর্ণে তুলিও না।"

মুখ ফিরাইয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "বিরাটকেতু! কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? কাহার নাম করিয়া গালাগালি দিতেছ? কেবল একমাত্র,—তুমি কন্যার পিতা নও, একমাত্র পুত্রের পিতা। সেই পুত্র তোমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, জীবসংসারে আছে কি নাই, তাহা তুমি কিছুই জান না। ভূতে উড়াইয়াছে। ভূতে তোমাদের বিশ্বাস আছে, আমারও আছে, কিন্তু তোমাদের যত, আমার তত না। তুমি যতদূর মাতিয়া উঠিতেছ, আমি তত না। লোকে তোমাকে পাগল মনে করিতেছে, তুমিও পাগলের মত ক্ষ্যাপা দেখাইতেছ। কে তোমার পুত্র, কে তোমার কন্যা, তাহা হয় ত তোমার মনে হইতেছে না। কিন্তু রাজা!—অনেক দিনের পর—

এসেছি তোমারে রাজা! শুনাইয়া দিতে—

সত্য কথা। যত কথা এত গোপনীয়

ছিল এই মায়াধামে, জানিত না কেহ;—
ছাই ঢাকা অগ্নি যথা গৃহস্থের গৃহে।
তোমারি তনয়া বুঝি অপ্সরাসুন্দরী?
জান না কি রাজা তুমি? তুচ্ছ অর্থলোভে,-
যাহারে অপ্সরাধনে করিবারে দান—
প্রমত্ত হইয়াছিলে, সেই কুলাঙ্গার—
মহা মহা পাপে লিপ্ত; মৃত্যু আলিঙ্গনে,—
কুপথে সর্ব্বদা দুষ্ট চরিয়া বেড়ায়।
জান কি বিরাটকেতু! চতুরের মায়া?
জান কি জান কি রাজা! লম্পটের ছলা?
ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা তুমি পার কি বুঝিতে?"

সত্যই বিরাটকেতু ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারেন নাই। অর্থের শোকে পাগল হইয়াছেন। লোকে জানিতেছে, কন্যার শোকে পাগল। কিন্তু চতুর্ভুজ সেই ক্ষেত্রে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, "তোমার পুত্রকে ভূতে উড়ায় নাই। তাহার ধাত্রী শ্যামাঙ্গিনী সূতিকাগার হইতে এক দিন তাহাকে যমুনাজলে স্নান করাইতে লইয়া গিয়াছিল। শ্যামাঙ্গিনীর চেহারা অতি চমৎকার। একজন লোক আপনাকে আজমীরের রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্যামাঙ্গিনীকে ভুলাইয়াছিল। সত্য সত্য সে লোক আজমীরের রাজা নহে, একজন সামান্য প্রহরী মাত্র। শ্যামাঙ্গিনী তাহার সঙ্গে গেল, ছেলেটীও কোলে থাকিল, সেই অবধি তোমার সেই শিশুকুমার আজমীরের রাজকুমার। লোকটার নাম ইন্দ্র সিংহ। আজমীরে তাহার প্রতিপত্তি বেশ ছিল, যথার্থ রাজা নিঃসন্তান; রাণার সহিত তিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া পুষ্করের সাবিত্রীপর্ব্বতে সন্ন্যাসীবেশে বাস করিতেছিলেন। ইন্দ্র সিংহ আপনিই যেন রাজা, এমনি ভাব দেখাইয়া রাজ্যস্থ অন্যান্য লোকের উপর মহা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। রাজ্যে রাজা নাই,

রাজ রাণী নাই, রাজপুত্র নাই, স্থূলকথায় অরাজক। ইহা দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি সমস্ত পারিষদবর্গ, সমস্ত রাজকর্ম্মচারীবর্গ ইন্দ্রসিংহের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। বিরক্ত, হইবার যথার্থ কারণও ছিল। প্রধান মন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করিয়া একজন সামান্য পদাতিক দেশস্থ প্রজা লোকের উপর প্রভুত্ব দেখায়, স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রজাপীড়ন করে, সাধুলোকে ইহা সহ্য করিতে পারেন না। সাধারণ লোকেও পারে না। ইন্দ্রসিংহ দুষ্ট লোক। দুষ্ট বলিয়াই সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। কথাই আছে, "দুর্জ্জনকে দূর পরিহার।" রাজাশূন্য রাজ্য যেমন বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে, সেই সময় আজমীরের সেই দশা ঘটিয়াছিল। ইন্দ্রসিংহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্দ্রসিংহের কথা লইয়া আর অধিক আড়ম্বর না করিয়া একবার একবার সকলের দিকে নয়ন নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্ভুজলাল একটু হাস্যের সহিত পাগলকে কহিলেন, "মহারাজ! তোমার পুত্র সেই রাজ্যের রাজপুত্র নামে পরিচিত হইয়া রাজপুত্রের ন্যায় পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নাম হইল, শশিকুমার। সেই শশিকুমার এই স্থানে উপস্থিত। সেই স্বর্গীয়া দেবাঙ্গনারূপিণী সতীলক্ষ্মী কমলাসুন্দরীর গর্ভে এই পামরের জন্ম। জগৎকুমারীর গর্ভে জন্ম হইলেই ঠিক হইত। কিন্তু রাজা বিরাটকেতু! কথা বলিতে ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। নিদারুণ ঘৃণায় আমার চক্ষুকর্ণনাসিকা যেন অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। লজ্জা যেন রাক্ষসী-রূপে আসিয়া আমার ওষ্ঠে হস্তাবরণ প্রদান করিতেছে, রসনাকে যেন পেটের ভিতর টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি করিব রাজা! ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। তাহারা এত সৃষ্টি করিলেও আমি তাহাদের বাধা মানিতেছি না,—মানিতে পারিব না। দেবী কমলাসুন্দরীর গর্ভের সন্তান বেশ্যা জগৎকুমারীর গর্ভে জন্মিলেই রাশিতে রাশিতে মিলিত। কার্য্যে কার্য্যে মিলন হইয়া যাইত। ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিশিয়া যাইত। রাজা বিরাটকেতু! আরও এখনও তোমাকে অনেক কথা শুনিতে হইবে। তোমার নূতন রাণী জগৎকুমারী এই নীচাত্মা শশিকুমারের রহস্য-নায়িকা। কেবল একা শশিকুমারের নহে, রাণী হইবার পর ঐ পাপিষ্ঠ স্বর্গভূষণের সঙ্গে যাহা,

তাহা তুমি জান ভাল।—সাধে কি আমি কৃতান্তরাজ্যের পন্থা হইতে স্বর্গভূষণকে ফিরাইয়া আনিয়াছি? এই সকল কাণ্ড দেখিবার জন্য; এই সকল গুপ্ত কাহিনী শুনাইবার জন্য; তোমার মত রাজার চৈতন্য উৎপাদনের জন্য। চক্ষু বুজিতেছ কেন? ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমার বংশধর শশিকুমার ঐ একটু দূরে হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, তোমার রাণী জগৎ-কুমারী,—দুশ্চারিণী গণিকা জগৎকুমারী মাটীতে মুখ রাখিয়া যেন ঘৃণা, লজ্জা, ও কলঙ্ক লুকাইতেছে। আবার ওদিকে চাহিয়া দেখ, তোমার পরম বন্ধু স্বর্গভূষণ যেন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর ন্যায় হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া গড়া-গড়ি খাইতেছে। রাজা রঘুবর বসিয়া বসিয়া যেন ঘুমাইতেছেন। অন্য কোন স্থল হইলে এই কুৎসিত কাণ্ডের এমন সুন্দর সজ্জা হইত না। যবনরাজত্বের শেষ না হইলে এত স্পষ্ট করিয়া এই সকল বীভৎস ব্যাপার সাহস করিয়া আমি প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ইংরাজের অধিকার হইলে, দণ্ডবিধির,--ভারতবর্ষের নূতন দণ্ডবিধির অশ্লীলতাবারিণী ধারা হয় ত আমার মুখে থাবা দিত। কিন্তু আমি—আমি কিছুতেই ডরি না। উহারা জানিত, গুপ্ত;—এখনও হয় ত জানে, গুপ্ত। কিন্তু আমার কাছে সমস্তই সুপ্রকাশ। যে স্থানের যাহা উপযুক্ত, সেই স্থানেই সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া বড় ভাল। পাগলা গারদে লোকে যেমন পাগলের খেলা দেখে, দেবালয়ে, কিম্বা শান্তিময় গৃহস্থগৃহে তেমন খেলা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দেখ, রাজা! আমি ইন্দ্রজাল জানি না, ভোজবাজী জানি না, রাজা বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল অথবা কুজকুজীর মায়া জানি না, আত্মারাম সরকার অথবা মামীর মা এখানে প্রবেশ করি-তেছে না; তথাপি এখানে যেন কত মায়া একত্র হইয়াছে। এক পাগল দেখিতে আসিয়া আমি কত পাগল দেখিতেছি। রাজা বিরাটকেতু! তুমি হয় ত মনে করিতেছ, আমি রহস্য করিতেছি। কিন্তু জানিয়া রাখিও, ইহার কিছুই রহস্য নয়। তুমি যদি সত্য সত্য পাগল হইয়া থাক,—পাগল হইবার তোমার অনেক কারণ ছিল,—মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা তোমার পাগল হইবার কারণ নহেন, এখনকার একমাত্র কারণ একলক্ষ টাকা

কিন্তু নির্লজ্জ রাজা! আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, তোমার পাগল হইবার অন্য কারণ ছিল। এখনও তুমি জান না, সমস্ত কারণের প্রধান কারণটী কি।”

স্বর্গভূষণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শশিকুমার প্রতিধ্বনি করিলেন। এলোকেশী জগৎকুমারী আকাশপানে মুখ করিয়া,—আকাশপানে হাত তুলিয়া মুক্তকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিলেন, “এইটেই পাগল! যে লোকটা কথা কহিতেছে, এইটেই পাগল!—গারদের লোকেরা গেল কোথায়? ইহার হাতে, পায়ে, মুখে চাবী দিয়া কাট্‌গড়ায় রাখে না কেন? পাগলে কত কত আকাশফোঁড়া কথা বলে, ভুঁইফোঁড়া কথা বলে, গারদের লোকেরা তাহা বুঝি জানে না? গেল কোথায়?”

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, “মিহিরা! তুই কি আমার কথা বুঝিতেছিস্? স্বর্গভূষণকে চিনিতেছিস্? শশিকুমারকে দেখিতেছিস! আমি পাগলই বটে! আমি পাগল না হইলে তোদের সকলকে এক জায়গায় জড় করিত কে? এলেন যেন সতীসাবিত্রী বেহুলা। হা রাক্ষসি। হা পাপীয়সি! এখনও তোর মুখে কথা আছে? জিব কেন খসিয়া যায় না? এখনও তোর চক্ষে তারা আছে? চক্ষু কেন অন্ধ হইয়া যায় না? মিহিরা! আমি ইচ্ছা করি, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অতল সাগরে ডুবিয়া যাক্, কেবল দুটী কাণ থাক্। চুপ্ করিয়া কেবল তুই আমার কথা শোন্। মিহিরা! তুই কার মেয়ে? কার নায়িকা? কার রাণী? কার বেগম? কার জননী? মনে করিয়া বলিতে পারিস্?”

জগৎকুমারী আবার বসিয়া পড়িলেন। আবার পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

বিরাটকেতুর চক্ষে আর পলক নাই। কি শুনিতেছেন, কর্ণ তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতেছে না। কি দেখিতেছেন, পলকশূন্য নেত্র তাহা ভাল করিয়া দেখাইতেছে না। কি ভাবিতেছেন, চিন্তাদেবী তাহা ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন না, পাগলের যেমন প্রকৃতি হওয়া সম্ভব, সেই সময় বিরাটকেতুর ঠিক যেন সেইরূপ অস্থিরপ্রকৃতি। দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। চতুর্ভুজের দিকে অবিরাম নিমেষশূন্য দৃষ্টি।

"তোমার মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি। তোমার চক্ষু আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহাও বুঝিতেছি। উত্তর করিতেও পারিব; কিন্তু আমার অহঙ্কার আসিতেছে।"—হাস্য করিয়া এই কয়েকটী কথা বলিয়া চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "বাছা। শোন আমার কথা।—মানুষের অহঙ্কার দেখিলে লোকে নিন্দা করে, লোকের কথাই বা কেন, আমি যে বক্তা, আমি.— আমি নিজেও নিন্দা করি। কিন্তু আমার অহঙ্কার আসিয়াছে। অহঙ্কার করিয়া বলি, দেশের মধ্যে আমি একজন মহাবিজ্ঞ বহুদর্শী সুচিকিৎসক। নানা প্রকার অচিকিৎসনীয় রোগ আমি আরাম করিতে পারি। তোমাকেও আরাম করিব। তোমার জগৎকুমারীর যে রোগ হইয়াছে, তাহাও আরাম করিব। কি বলিস্ মিহিরা? আমার চিকিৎসায় তোর রোগ কি আরাম হইবে না? যাইতেছিস্ কেন? আমার হাতে তুই যে অনেক দিন মানুষ হইয়াছিলি বাছা। দুধ দিয়া, ক্ষীর দিয়া, সরননী দিয়া অনেক দিন আমি যে তোকে মেয়ের মত পালন করিয়াছিলাম। সব কি ভুলিয়া যাইতেছিস্? তত যত্ন, তত স্নেহ, তত আদর, সব. কি মা ভুলিয়া গিয়াছিস্? আর তোকে মা বলিব না।—মনে বড় ঘৃণা জন্মিয়াছে।—মিহিরা! সত্যই আমি পাগল বটে।'

কট্ মট্ চক্ষে চাহিয়া, দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া কুমার হরবিলাস কহিলেন, 'পিতা এখানে বিদ্যমান, জননী বিদ্যমান, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান।—গুরুতুল্য কবিরাজমহাশয়! তুমিও এখানে বিদ্যমান, যদি অনুমতি পাই, এই মুহূর্ত্তে একমাত্র চক্ষের নিমেষে এই কালসাপিনী কুলটার মস্তক—"

"না রাজকুমার! অতদূর করিতে হইবে না। শান্ত হও!—স্ত্রীহত্যা করিতে নাই। যাহার যাহার পাপ, তাহারা নিজে নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আমাকে দুটী কথা কহিতে দাও। তোমরা যদি অস্থির হইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে এই ভীষণ পাপক্ষেত্রে অনেকের মুণ্ড অনেকের স্কন্ধে থাকে না; তাহা আমি বুঝি, তাহা আমি জানি। কিন্তু হরবিলাস! মহারাজ মহানন্দ বাহাদুর, রাণী বিরজাসুন্দরী, বীরেশ্বর ভূপেশচন্দ্র, বীরাঙ্গনা জগদম্বাসুন্দরী, আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।—আমাদের সকলের অনুরোধে তুমি স্থির

হও। কেমন করিয়া পাগলকে আমি আরাম করি, দেখ। মিহিরা! তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে। তোদের দেখিয়া আমিও যেন পাগল হইয়া যাইতেছি। বলিয়াছিস্ ,আমি পাগল, কিন্তু না মা! আমি তা না। এই আবার আর এক ভ্রান্তি! এইমাত্র বলিলাম, আর আমি তোমারে মা বলিব না, কেমন বন্ধন, কেমন ভ্রম, ঐ কথাই যেন অগ্রে বাহির হয়।”

রাজা বিরাটকেতু ঘুরিয়া পড়িলেন। “ভাঙ্! ভাঙ্! কাটগড়া ভাঙ্! পাগল পড়িয়া গেল। অনেক ক্ষণ পড়িয়া থাকিলে পাগল বাঁচিবে না, বাঁচেও না। ভাঙ্গিয়া ফেল্!”—এই কথা বলিতে বলিতে চতুর্ভুজ যেন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিলেন।

ঘরের দেয়াল প্রায় দশহাত উচ্চ। কাটগড়ার গবাদেগুলি দুই মানুষ সমান। কুমার হরবিলাস চক্রব্যূহবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় তরবারিহস্তে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কাট্‌গড়ার উপর দিয়া সদর্পে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই সাত হাত গরাদে উল্লঙ্ঘন করিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূপেশচন্দ্র। তাঁহাদের পশ্চাতে ক্ষুদ্রদয়াল। তলোয়ারেরা ভিতরে গেল। যাঁহাদের হস্তে তলোয়ার, তাঁহারাও ভিতরে গেলেন। দুষ্ট লোকেদেব ক্ষণকালের জন্য ভয় ঘুচিয়া গেল। দুঃসাহস যেন বাড়িয়া উঠিল। উহারা ফাঁদে পড়িয়াছে, আর বাহির হইতে পারিবে না, এই মনে করিযা শশিকুমার আর স্বর্গভূষণ অসম্বদ্ধ কথায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অবসরের সঙ্গে সাহস প্রাপ্ত হইয়া জগৎকুমারীও “মেলে গো! মলেম গো!” বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে চেঁচাইয়া উঠিলেন।

কাহারও কথায় কথা না কহিয়া, মূর্চ্ছিত রাজাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ভূপেশচন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন, “মহারাজ! মহারাজ! কোন বিপদ উপস্থিত নাই। যিনি কথা কহিতেছেন, তিনি আমাদের মিত্র। তাঁহার সঙ্গে আমাদের এক প্রকার রক্তসম্বন্ধ আছে। তিনি আমাদের মন্দ করিবেন না। আপনি শান্ত হউন। অপ্সরাসুন্দরী রহিয়াছেন, আমরা আসিয়াছি, আমরা রহিয়াছি, যম এখানে ঘেঁসিতে পারেন না। ভয় কি মহারাজ!”

ভূপেশচন্দ্রের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রাজা বিরাটকেতু অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিলেন। চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায়”

আমি? কাহার কোলে শয়ন করিয়া আছি? কে তুমি? আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি এক দেশে যাইতেছিলাম, বেশ দেশ, পথে কাঁটা নাই, কাঁকর নাই, পাতর নাই, গাছপালা নাই, যাহারা হিংসা করে, তাহারা নাই, কাদাও নাই। বেশ পথ, বেশ দেশ। অন্ধকারও নাই। সারি সারি আলো। যেন ফুলের মালা গাঁথা। ছাড়িয়া দাও, আমি সেই দেশে যাই। কেন ফিরাইলে তুমি? কেন তুমি? আমার কর্ণে কি নাম শুনাইলে? অপ্সরা? তুমি কি তাহার সন্ধান জান?"

ভূপেশচন্দ্রের হস্তের তরবারি তখন ভূমিতলে। নিরস্ত্র রাজকুমার বৃদ্ধ শক্রকে পরমযত্নে কোলে করিয়া আশ্বাসবচনে অনেক প্রকার সান্ত্বনা করিলেন।

সান্ত্বনার ফলও হইল। রাজা বিরাটকেতু রুক্ষ রুক্ষ চুল নাড়া দিয়া ঘূর্ণিত রক্তনয়নে দশদিক নিরীক্ষণ করিয়া ভূপেশচন্দ্রের ক্রোড়ে একবার উঠিয়া বসিলেন। একবার মুখের দিকে চাহিয়া ঘৃণাকে যেন নয়নে আনিয়া পূর্ব্বের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মূর্চ্ছা তখন যে কোথায় পলাইয়া গেল, তিনজন বীরকুমার কিছুই বুঝিলেন না। রাজা বিরাটকেতু অপর দুটীকে চিনিলেন কি না,—চিনিতে পারিলে চিনিতেন কি না, তাহার বুঝিবার সময় হইল না। ভূপেশচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া তিনি লাথী মারিতে আসিলেন। ঘৃণা প্রকাশ করিয়া পাগলের স্বরে কত কথাই কহিলেন। কাট্‌গড়ার এক কোণে মুখ লুকাইয়া গর্জ্জনস্বরে কহিলেন, "দাসীপুত্র এখানে কিজন্য? ইহারাই আমাকে খেপাইয়া দিতেছে। মিছিমিছি করিয়া অপ্‌সরার নাম করিতেছে। আমার কি এখানে কেহই নাই? যাহারা আমাকে রক্ষা করিতেছে, তাহারা কি এই শক্রকে কাটিয়া ফেলিতে পারে না?"

"পারে বৈ কি! আছে বৈ কি!—ডাকো না!—তোমার জগৎকুমারী ডাকিতেছিল! চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল; তুমিও ডাকো না! জগৎ-কুমারি! কুলকলঙ্কিনি! ডাক্ দেখি তাহাদের! আমি সম্মুখে থাকিতে, আমি ছাড়া, রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র ছাড়া, আর এই ক্ষুদ্র ভ্রাতা বিশ্বেশদয়াল ছাড়া কে তোদের রক্ষা করিতে পারে, দেখি একবার।—ডাক্ দেখি পাপীয়সী রাক্ষসি!"—যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া কুমার হরবিলাস এই সকল [illegible]

বলিতে বলিতে ঠিক যেন ঘোরতর রণরঙ্গসমাকীর্ণ ভীষণ রণভূমিতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সদন্ত পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

চারিজনে কাট্‌গড়ার মধ্যে ;—অন্য লোকেরা বাহিরে।—মহারাজ মহানন্দ রাও আগাগোড়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চতুর্ভুজকে কহিলেন, "কবিরাজ! হরবিলাসকে শান্ত হইতে বল। দুরন্ত বালক, কিছুই বুঝিতেছে না। আমার ভয় হইতেছে। পাগলের ঘরে গিয়া পাগলের মত কি কথা কহিতেছে, একটীও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। শান্ত হইতে বল।"

চতুর্ভুজ হাস্যমাত্র করিলেন। রাণী বিরজা চতুর্ভুজের মুখপানে চাহিলেন। অপ্সরাসুন্দরী উভয়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সভয় ভঙ্গীতে আপনা আপনি কহিলেন, জগদীশ্বর! বিপদে তুমি একমাত্র সখা! ইহারা কি করিতেছে, তুমিই দেখিতেছ, তুমিই শুনিতেছ। কিন্তু দেব! দয়াময় তুমি, করুণাসিন্ধু তুমি, বিপদের কাণ্ডারী তুমি, এই পাপনিবাসে কাহারও যেন কোন বিপদ না হয়। অভাগিনী অপ্সরা করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছে, অক্ষয় দয়ায় সকলকে নিরাপদে রক্ষা কর। দীননাথ! আমি তোমার শ্রীচরণের চিরদাসী। হৃদয়পদ্মে তুমি উদয় আছ, সেই সাহসে এখনও আমি দুটী একটী কথা কই। কিন্তু মহেশ্বর! আমার রসনা নিস্তব্ধ থাকিলেই ভাল হয়। সর্ব্বেশ্বর ;—

কাতরা কিঙ্করী ডাকে এ ঘোর বিপদে ;—
দয়া করি দয়া কর, অধীনী দাসীরে।
বড় ভয়ঙ্কর স্থান নিহারি সম্মুখে,
ঠিক্ যেন মনে হয় ভীষণ শ্মশান!
শত্রুামত্রে জ্ঞান নাই, আমি দিশাহারা!
কোথা আসিয়াছি নাথ! কিছু জ্ঞান নাই।
বুকে আছে প্রিয় বস্তু। তোমারি প্রসাদে—
থাকে যেন নিরাপদে, এই ভিক্ষা চাই।

জগত ঈশ্বর তুমি অনন্ত অব্যয়,
তোমারি কৃপায় জীব চরাচরে চরে,
সাধুপথে চরে নরে তোমারি কৃপায়।
নিরাপদে চরে সবে বিশ্বচরাচরে।
জানে সত্য, জানে সত্য, জানে তব দাসী,
সত্যের মঙ্গল আছে তব বিশ্বধামে।
পড়েছি সঙ্কটে ঘোরে সঙ্কটভঞ্জন!
বিপত্ত ভঞ্জন কর, বিপত্তভঞ্জন!
জোড় করে শ্রীচরণে করি প্রণিপাত।
এ বিপদে রক্ষা কর অনাথের নাথ।"

এ প্রার্থনা বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া স্বর্গে গেল। স্বর্গের করুণাময়ী করুণা অলক্ষিতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। কিন্তু আর কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। কুমার হরবিলাস অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভীমগর্জ্জনে জগৎকুমারীকে কহিলেন, 'পাপীয়সি! চিনিতাম না, এখন তোরে চিনিয়াছি। ডাক্ তোর রক্ষাকর্ত্তাকে। যাহাদের ডাকিতেছিলি, নূতন করিয়া আর একবার ডাক্ তাহাদের। চক্ষে চক্ষে মিলন করিব। তোদের চক্ষু কপালে থাকে, আমার চক্ষু হস্তে। ক্ষত্রিয়কুমারের চক্ষু কোথায় থাকে, তুই তাহা জানিস্ না। তলোয়ার আমার চক্ষু। দুই দিকে চক্ষু। কুমার ভূপেশচন্দ্র যত ক্ষমা জানেন, তত ক্ষমা আমি জানি না। আমার চক্ষের নিকটে দুষ্ট লোকের নিস্তার নাই, সাধুলোকের নিস্তার আছে।—ডাক্ তাহাদের। শশিকুমারকে ডাক, স্বর্গভূষণকে ডাক্, বাহিরে যাহারা যাহারা আছে, তাহাদের ডাক্, হরবিলাসের তলোয়ারের সঙ্গে তাহারা সাক্ষাৎ করিবে; আমরা কাট্‌গড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কাট্‌গড়া ভাঙ্গিয়া আমাদের বাহির করিবে। উঃ! একটা বেশ্যা এতদূর প্রতাপ ধারণ করে! চীৎকার করিয়া যবনের সাহায্য চায়। কেন মা রাজলক্ষি! সত্য কি তুমি ক্ষত্রিয় মস্তক পরিত্যাগ করিয়া গেলে? ডাক্ জগৎকুমারি! আবার তুই ডাক!

স্বর্গভূষণ! চুপ করিয়া রহিলে কেন? তুমিও ত একজন রাজকুমার। আমরা পাগলের কাটগড়ায় বন্দী হইয়াছি স্ব-ইচ্ছায়।—কেহ ত আমাদের বন্দী করে নাই। কিন্তু বাহির হইবার ত উপায় নাই। ভয় করিতেছ কেন মহাবীর? ডাকো তোমার আনোয়ার বখ্‌তকে। ডাকো তোমার লিঙ্গেশ্বর অথবা লেকায়ৎ খাঁকে। ডাকো তোমার হনুমান সিংকে। তাহারা আমাকে জানে। চক্ষে চক্ষে দেখা হইয়াছে কত বার, কিন্তু আজ তাহারা আমাকে নূতন রূপে দেখিবে।—নূতন বেশে আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি পিতার অনুমতি পাই, জননীর অনুমতি পাই, যদি ভূপেশচন্দ্রের অনুমতি পাই,—পূজনীয়া দেবী অপ্‌সরাসুন্দরীর যদি অনুমতি পাই, হয় ত জন্মশোধ সাক্ষাৎ।—না,—স্বর্গভূষণ! তুমি ডাকিও না,—না,—জগৎকুমারি! তুমিও ডাকিও না, তোমাদের অহঙ্কার তোমাদের কাছেই থাকুক। কাট্‌গড়া হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে। তাহারা কর্ত্তা, তাহারা না আসিলে বাহির করিয়া দিবে কে? আমিই ডাকিব। অনুমতি না পাইয়াও আমার এই শত্রুবিনাশী অসি রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া তাহাদিগকে ডাকিবে। জগৎকুমারি! চুল বাঁধো।—মহা অনর্থ উপস্থিত। বেশ্যা বলিয়া কেহ যদি তোমার কেশাকর্ষণ করে, বিরাটকেতুর প্রাণে ব্যথা লাগিবে। চুল বাঁধো।—শশিকুমার রক্ষা করিতে পারিবেন না। স্বর্গভূষণ রক্ষা করিতে পারিবেন না, আর একজন আছে, সে তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া রাস্তার ধূলার সঙ্গে, রাস্তার পোকার সঙ্গে, রাস্তার ভস্মের সঙ্গে তোমাকে দলিত করিতে পারিবে।—পারে, কিন্তু দিব না তাহা, চুপ করিয়া থাক। গারদের যাহারা রক্ষাকর্ত্তা, তাহারা আপনারাই আসিবে। আসিয়া দেখিবে কি, পাগল তাহাদের আমাদেরই হাতে। আর দেখিবে কি,—শত্রুমিত্র তাহাদের আমাদেরই হাতে। আর তাহারা দেখিবে কি?—তুমি রাণী জগৎকুমারি। অন্য লোকে যেমন বুঝিতে পারে, মদগর্ব্বে তুমি তাহা তেমন বুঝিতে পারিবে না। তাহাদের মস্তক আমাদেরই হস্তে।”

“চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ! কাহার সঙ্গে অত কথা কহিতেছ হরবিলাস? শৈশবে তুমি ত ধৈর্য্য শিক্ষা করিয়াছিলে। এখন এত অধৈর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলে? ইঙ্গিতে এই কথা বলিয়া দুই তিন প্রকারে চক্ষের ভঙ্গী দেখাইয়া চতুর্ভুজ চুপ

করিলেন।—চতুর্ভুজ চুপ্ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভঙ্গী বুঝাইয়া দিল, বিপদ সম্মুখে। বিপদ কি নিরাপদ, সকলে বুঝিলেন না, কিন্তু অপ্সরা-সুন্দরী কাতরা হইলেন। সকাতরকণ্ঠে কহিলেন, "কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিবার নিমিত্তই জননীজঠর হইতে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। মানুষে যে যন্ত্রণা কখনই সহ্য করিতে পারে না, সেই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিবার নিমিত্তই অভাগিনীর জন্ম হইয়াছিল!"

"অপ্সরা! তুমি চুপ্ কর। তোমার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। দণ্ডী-পর্ব্বে যেমন অষ্টবজ্র একত্র হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে এখানেও আজ সেই রূপ।—চমৎকার সংঘটন।—বিধিলিপি চমৎকার।—তুমি দেখ, এই ক্ষেত্রে কাহার কি দশা হয়।" কুমার হরবিলাস অতি শীঘ্র শীঘ্র অপ্সরাকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া জগৎকুমারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক উগ্রস্বরে কহিলেন, "জগৎকুমারি! তোমার গর্ভে কি সন্তান জন্মিয়াছে? তোমার সঙ্গে কি বিরাট-কেতুর বিবাহ হইয়াছিল? সেই বিবাহের কি এই ফল? আহা! ছেলেটী দেখিতে বেশ সুন্দর! মিহিরমোহিনি! তোমার অনেক নাম, কোন্ নামে কাহার সঙ্গে তোমার অধিক প্রণয় হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না।—আমি কেন, কেহই জানিতে পারে না। কিন্তু রাণি! এ ছেলেটী কাহার? শশিকুমারের, কি স্বর্গভূষণের, কি বিরাটকেতুর?"

জগৎকুমারীর মুখ এতক্ষণ একটু উচু হইয়া ছিল, ঐ সকল প্রশ্ন শুনিয়া আবার হেঁট হইয়া পড়িল।

চতুর্ভুজ টিপি টিপি হাসিতেছিলেন, মনের মত কথা হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া হরবিলাসকে বাধা দিতেছিলেন না। জগৎকুমারীকে নতমুখী, মৌন-বতী দর্শন করিয়া সান্ত্বনাস্বরে ছোট ছোট করিয়া কহিলেন, "মিহিরা! অত লজ্জা করিতেছ কাহাকে দেখিয়া? অন্য কেহ তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না। রাজপুত্রের কথায় নির্ভয়ে উত্তর কর, মনে কোন সন্দেহ না করিয়া নিঃসন্দেহ সত্য সত্য কথা বল।"

"তাই বুঝি আমি?"—মুখখানি ভারি করিয়া জগৎকুমারী কহিলেন, "তোমরা মনে করিয়াছ, তাই বুঝি আমি?—আমার পুত্র আমার আছে, তোমাদের কি তাহাতে?"

ছেলে ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া উঠিল। কাঁদো কাঁদো মুখে আধ আধ স্বরে সেই ছেলে কহিল, "কে আসিয়াছে মা? কে কথা কহিতেছে মা? সেই বুঝি? যে তোরে নাথি মেরেছিল, আমারে নাথি মেরেছিল, কত গালাগাল দিয়েছিল, সেই বুঝি?"

"না বাছা! সে না, আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

কাট্‌গড়ার মধ্য হইতে ক্ষুদ্র দয়াল উচ্চকণ্ঠে লহিলেন, "বিপদে পড়িয়াছ? আমাব তলোয়ার অকারণে স্ত্রীজাতির গাত্র স্পর্শ করে না। সে অভ্যাস যদি থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, কে কোথায় কি প্রকারে বিপদে পড়িয়াছে। একজন নছিক পুলুছ।"

"নছিক পুলুছ কে মা? ইহালা কাহাল্‌ কথা কহিতেছে? জুজু বুঝি? আমার ভয় করিতেছে! নছিক্‌ পুলুছ বুঝি জুজু?"

সন্তানের মুখে হাত চাপা দিয়া, ধীরে ধীরে কাণ চাপ্‌ড়াইয়া জগৎকুমারী কহিলেন, "তুমি ঘুমোও যাদু! জুজু নাই। যদি জুজু আসে, আমি তাড়াইয়া দিব। ভয় নাই, চুপ্‌ করিয়া ঘুমোও।"

"ঘুমাইতে হইবে না, ছেলেকে ঘুমাইতে দিও না। বড় বিপদ!—যখন ঘুমের প্রয়োজন হইবে, তখন আমরা ঘুম পাড়াইব। এখন তুমি জগৎকুমারি, আমাদের কথায় উত্তর কর।"

"না, কাহারও উত্তর আর আনিতে হইবে না, কাট্‌গড়া ভাঙ্গিয়া আমি বাহির হইতে পারি। পাপীমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। কিন্তু আরও খানিকক্ষণ—"

শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন," আরও খানিকক্ষণ?—আরও খানিকক্ষণ তুমি কি দেখিবে রাজকুমার?"

"কি দেখিব, তাহা তুমি জান না কবিরাজ? জগৎকুমারী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল, গারদের লোক, গারদের অধ্যক্ষ, গারদের পেয়াদা, গারদের দারোগা, গারদের প্রহরী। ডাকিতে দাও, আসুক তাহারা। এত দিন কোথায় আসিতেছিল, কোথায় আসিয়াছিল, কোথায় আসিবে বলিয়া গোঁফদাড়ী ফুলাইতেছিল, আধহাত বুক দশহাত করিয়া উচুঁ করিয়াছিল, কিন্তু আজ রাত্রে,—শোন তুমি কবিরাজ!—তোমাকে আমি গুরু বলিয়া

মানি, আজ রাত্রে আমার চক্ষের সম্মুখে যে কোন বিকটমূর্ত্তি আসিবে, দেখিও, দেখিও, দেখিও তুমি,—খণ্ডখণ্ড করিয়া তাহাকে কাটিব। বারণ করিও না, বাধা দিও না, রক্তমুখী অসিকে নিবারণ করিও না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইবে।"

আকাশে বিদ্যুতের হাসি দেখিলে কতক মানুষের যেমন আনন্দ হয়, কতক মানুষের যেমন ভয় আইসে, তেমনি সানন্দ-শঙ্কায় মহানন্দ রাও কহিলেন, "চল আমরা ঘরে যাই। কি হইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। বিরাটকেতুকে লইয়া চল। এখানে যদি ভাল হইতে পারেন, ঘরেও ভাল হইতে পারিবেন। গারদে থাকিয়া অপমান সহ্য করা—"

"অপমান ?" নিষ্কোষিত অসি তুলিয়া হরবিলাস কহিলেন, "অপমান ? না মহারাজ! তোমার অপমান করিতে পারে, এমন মুসলমান এখানে এখনও নাই, দিল্লীতেও নাই। গণিকা জগৎকুমারী রক্ষাকারী বলিয়া যাহাদিগকে ডাকিয়াছিল, তাহারা আসুক, দেখি,—দেখিব।—তাহাদের নাম মনে আছে, চেহারাও মনে আছে। তবু আবার নূতন করিয়া দেখিব তাহাদের। আনোয়ার, লেকায়ৎ, হনুমান।"

বিরাটকেতু কথা কহিতেছেন না। বাহিরে যাঁহারা যাঁহারা আছেন, উপযুক্ত অবসর না হইলে তাঁহারাও কথা কহিতেছেন না। পাগ্‌লা গারদ ; ভাললোকেও যদি এমন গারদে প্রবেশ করেন, ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহারাও জ্ঞানশূন্য হইয়া যান। কিন্তু এখানে এক প্রকার নূতন সৃষ্টি। ভূপেশচন্দ্র নিস্তব্ধ। ক্ষুদ্র দয়াল চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইতেছেন ; মুখে কিন্তু বাক্য নাই। মহারাজ মহানন্দ রাও গম্ভীর। অপ্সরাসুন্দরী নতমুখী। বিরজাসুন্দরী মৌনী। চতুর্ভুজলাল সতেজ নয়নে অন্যমনস্ক। তবে আর কাহাদের কথা বলিতে হইবে ? রঘুবর, মহালক্ষ্মী, স্বর্গভূষণ, শশিকুমার, মিহিরমোহিনী, মিহির-মোহিনীর পুত্র, ইহারা সকলেই চুপ্। কেবল হরবিলাসের মুখে কথা।—সে কথা কি বলে ? বলে, শুধু, ডাকো তাহাদের। আনোয়ার, হনুমান, লেকায়ৎ ; ডাকো তাহাদের।"

আদেশ পালন করিবার লোক নাই। আদেশ প্রদান করিবার লোক আছেন। তাহাতে কি হইবে ? ভূপেশচন্দ্র একটু পূর্ব্বে রাজা বিরাটকেতুকে

তুষ্ট করিবার জন্য হস্তের তরবারি ভূমে ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে যদি এখন-শত্রু নিপাতনে আহ্বান করা যায়, লজ্জা পাইবেন; কাজ নাই; তাঁহাকে ডাকিয়া কাজ নাই। একা হরবিলাসই শত্রুবিজয় করিতে পারেন। কিন্তু কেন? বিজয়ের এখানে প্রয়োজন কিছুই নাই। গারদ। রাজ্যের অজ্ঞান লোকের নিবাস।

"সে নিবাসে আমি কেন? এত দুঃখ আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে কেন? তলোয়ার খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। স্ত্রীলোকের সম্মুখে তলোয়ার থাকা ভাল না। আমি আসিয়াছি, যাহারা বিপদে, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু সমানে সমানে দেখা হইলেই ভাল হইত। তুই কে রাক্ষসি?"

"আমি?—আমি কে? জিজ্ঞাসা করিতেছে কে?"

"জিজ্ঞাসা করিতেছে হরবিলাস। যে হরবিলাস সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানে, জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেই হরবিলাস।"

"তাই ত তাই! আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। আকাশের চারি দিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সব দিকে যেন সিন্দূর। এসো ভাই হরবিলাস! জল আনিয়া ঢালিয়া দাও। উঃ! এত আগুন কোথা হইতে জ্বলিয়া উঠিল? ভূপেশ! ভূপেশ! ভূপেশ! মূর্চ্ছা যে আসিতেছে! নিবারণ কর। আমার সম্মুখে অজ্ঞান যেন আসে না। মূর্চ্ছা যেন আসে না, আমি যেন আমাকে ভুলিয়া যাই না, পাপ যেন আমাকে গ্রাস করে না।"

"দূর সর্ব্বনাশি! তোকে আমি জানি, তোকে আমি চিনি। সত্য করিয়া বল্ দেখি, স্বর্গভূষণ তোর কে হয়?"

"স্বর্গভূষণ?—কোথাকার স্বর্গভূষণ? ছলনা করিয়া অনেক লোভ দেখাইয়া আমাকে ঘরের বাহির করিয়াছিল।"

"মনে আছে ত রাক্ষসী? অনেক লোভ দেখাইয়া,—কিন্তু শশিকুমার তোর কে হয়?"

"কেউ না।"

জগৎকুমারীর সহিত হরবিলাসের এইরূপ শাদা শাদা কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তর হইল।

কাটগড়ার উপর লম্ফ দিয়া ক্ষুদ্র দয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেউ না? পাপীয়সি! রাণা তুমি জগৎকুমারী। কিন্তু কাহার রাণা? দুশ্চারিণী পাপিনী কালসাপিনি! অনেক দুগ্ধ দিয়া বিরাটকেতু তো:ক পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিফল—"

হুহুঙ্কারগর্জ্জনে তিনজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। "বাহির হইয়া যা! রাজার আদেশ, রাজার গারদ, এখানে অন্য লোক প্রবেশ করিতে পারে না।"

"কিন্তু তোরা? আয় তোরা একটা বেশ্যাকে সহায় করিয়া তোরা যদি একজন রাজপুত্রকে অপদস্থ করিতে পারিস্, তাহা হইলে আমরা নাম ধরিব না, ক্ষত্রকুলে কলঙ্ক দিতে বাঁচিয়া রহিব না. আয় তোরা। আমি ডাকি নাই। ভূপেশচন্দ্র ডাকেন নাই, অপ্সরা ডাকেন নাই, তবে কেন তোরা এখানে? মরিবার জন্য? বাতুলালয় রক্ষা করিবার জন্য? আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য? কিন্তু দেখ্ তোরা, যাহারা রক্ষাকর্ত্তা, তাহারা ক্ষত্র-তরবারির মুখে কেমন করিয়া দাঁড়ায়।"

বন্দুক ধারণ করিয়া তিনজন লোক সেই স্থানে আস্ফালন করিল। ভূপেশের ইঙ্গিতে কুমার হরবিলাস সুস্থিরভাবে সেই তিনটা বন্দুক কাড়িয়া লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। লোকেরা লাথা ছুড়িতে লাগিল। জগৎকুমারী কহিলেন, "উহাদিগকে কেহ যেন আঘাত না করে। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে। এক প্রহর, দেড় প্রহর, দুই প্রহর রাত্রি হউক, আমাকে দেখিতে উহারা আসিবে। আসিলেই উহাদের কাছে আমি উঠিয়া যাইব। তোমরা কেন উহাদিগকে আঘাত কর? বৃথা বৃথা আমাকে কেন দগ্ধ কর? মন যাহাকে চায়, প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।"

"তুমি কেন ত্যাগ করিবে?" গভীরগর্জ্জনে আস্ফালন করিয়া হরবিলাস কহিলেন, "তুমি কেন ত্যাগ করিবে? যিনি ত্যাগ করাইতে পারেন—"

"অত কথা শুনিবার নিমিত্ত কি আমরা এখানে আসিয়াছি? ক্ষত্রিয়-হস্তে কি অস্ত্র নাই? যাহাদের মরিবার ভয় নাই, তাহারা সম্মুখে আসুক; যাহাদের মরিবার ভয় আছে, তাহারা একটু তফাতে থাকুক্। দূর হইতে

ক্ষত্রিয়-তরবারি দর্শন করিয়া প্রাণের ভয়ে তাহারা কাঁপুক। কিন্তু জগৎ! অত নিষ্ঠুর হইতে নাই। ছেলে আছে, রাজা আছে, শশী আছে, স্বর্গভূষণ আছে, অনেক লোক তোমার। অত লোককে বঞ্চনা করিয়া কি করিয়া সুখী হইতে পারিবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। মিহিরা! আবার না কি তোর আর এক নাম রেজিয়া? থাক্ তুই, আমার চৈতন্য হইয়াছে।”

এই কথাগুলি চতুর্ভুজের।—গম্ভীবভাব ধারণ করিয়া চতুর্ভুজের স্বরের সঙ্গে স্বর মিলাইয়া হরবিলাস কহিলেন, “আমারও চৈতন্য হইয়াছে। নারীজাতিকে আর বিশ্বাস করিব না।”

হাসিয়া হাসিয়া নিকটে আসিয়া জগৎকুমারী কহিলেন, “কাহার কথা বলিতেছ?”

উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না, উত্তর দিতে পারিতেনও না। ভূপেশচন্দ্র নিষেধ করিয়া কহিলেন, “অবিশ্বাসী নারী। তাহাদের কথায় যাহারা কথা কহে, তাহারা নির্ব্বোধ। হরবিলাস! আমার কাছে এসো। ঐ সকল রাক্ষসীকে দূর করিয়া দাও। অপ্সরাসুন্দরীকে লুকাইয়া রাখ, রাজা বিরাটকেতুকে যদি বাঁচাইতে পার, চেষ্টা কর। রাত্রি অনেক হইয়াছে। চতুর্ভুজকে বিদায় দাও, তাহারা কি আসিয়াছে?”

“না ত, তাহারা কেহই আসে নাই।”

“ডাকো। জগৎকুমারীর অহঙ্কারের সঙ্গে অহঙ্কৃত জগতের অহঙ্কার চূর্ণ কর। ডাকো।”

“নাম ভুলিয়া গিয়াছি।”

“না,—ভুলিয়া যাইলে হইবে না, কলঙ্কিনী বেশ্যা যাহা বলিয়াছে, তাহা মনে করিলে হইবে না। কাটগড়া ভাঙ্গিয়া ফেল। নাম আমার মনে আছে। ভাঙ্গিও না, ভাঙ্গিও না। অকাশে একজনকে স্মরণ করিয়া আমি বাহির হইতে পারিব। এই ত বাহির হইয়াছি, হরবিলাস! কোথায় তাহারা? যাহাদের নাম করিয়া একটা গণিকা কুলটা আমাদের ভয় দেখাইতেছিল, কোথায় তাহারা? স্বর্গভূষণ! আচ্ছা, তুমি বাঁচিয়া আছ, মিহিরমোহিনী তোমার কে হয়? মনে করিয়া বলিতে পার? এক উদরের ভগিনী। জগৎ-কুমারী তোমার কে হয়? বলিতে পারিবে না। শশিকুমার! জগৎকুমারী

তোমার কে হয়? বলিতে পারিবে না। দুই জনেই দুই জনের কথা বলিতে পারিবে না। রাজা বিরাটকেতু! এখন ত তুমি পাগল নও, বল দেখি রাজা! শশিকুমার তোমার কে?—ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে একটু একটু করিয়া বলিয়া দিয়াছি, তোমার রাণী তোমার শশিকুমারের রহস্য-নায়িকা। সন্তান হইয়াছে। রাজা! আর কি লজ্জা রাখিতে পারি? দেশের গৌরবকে মাথায় রাখিয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলি, তোমার প্রিয়তমা রাণী জগৎকুমারী তোমার প্রিয়তম পুত্রের--মিহিরা! চিনিতে পারিস্, শশিকুমার তোর কে হয়? আরও চিনিতে পারিস্, স্বর্গভূষণ তোর কে হয়? এক প্রকারে আমি তোর পালক পিতা। জন্মদাতা পিতার নাম অশ্বানন্দ। গর্ভধারিণী জননীর নাম মহালক্ষ্মী। স্বর্গভূষণের গর্ভধারিণীও সেই সতীলক্ষ্মী (!!!) মহালক্ষ্মী। এক মায়ের গর্ভে উভয়ের জন্ম। কিন্তু মিহিরা! আমি এক আশ্চর্য্য দেখিতেছি। রাণী হইবার পূর্ব্বে শশিকুমারের,—শশিকুমার কে?—যাহার তুই রাণী হইয়াছিলি, জগৎকুমারী নামে যাহার কাছে আদর পাইয়াছিলি, সেই বিরাটকেতু ঐ শশিকুমারের জন্মদাতা পিতা। বড় চমৎকার ঘটনাই হইয়াছিল! বড় দুঃখেই আমি এ সকল কথা বলিতেছি। মিহিরা! তোর কাছে আমায় লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইত। কিন্তু এখন পারিতেছি না কেন? তোর না কি ভারি লজ্জা, তুই না কি কথায় কথায় লজ্জা আনিয়া এই ঘরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিতেছিস্, সেই জন্যই আমাকে লজ্জা ত্যাগ করিতে হইল। মিহিরমোহিনি! সাধ করিয়া আমি নাম রাখিয়াছিলাম, মিহিরমোহিনী, সে সাধে আমার ছাই পড়িয়াছে। পৃথিবীর লোকেরা জলের পদ্মিনীকে মিহিরমোহিনী বলিয়া ডাকে। আমি ভাবিয়াছিলাম, তুই স্থলের পদ্মিনী। কিন্তু মা! তুই হলি কি?—ঐ দেখ, আবার ভুলিয়া যাই! যেন আত্মবিস্মৃত হইতেছি। যাহাকে মা বলিব না মনে করি, তাহাকেই আবার মনের ভুলে মা বলিয়া ডাকি। রসনাকে দমন করিতে পারি, মনকে দমন করিতে পারি না। চক্ষুকেও পারি না। চক্ষু যেন দেখিতেছে, সেই সূতিকাগারের ছোট মেয়ে। সেই চক্ষুই আমাকে ভুলাইয়া দিতেছে। এক এক দেশের এক একজন লোক মনের বিবেকে, নিজের হস্তে, নয়নে শলাকা বিদ্ধ করিয়া অন্ধ হইয়াছিল। আমি যদি সেই প্রকারে অন্ধ হইতে

পারি, তাহা হইলে মিহিরমোহিনীকে দেখিয়া আর আমার মায়াদয়া হইবে না, এই সকল লোককে দেখিয়াও এ জন্মে আর আমি কাতর হইব না। কিন্তু পারি কৈ? মিহিরমোহিনি! তুই যে এমন কুলকলঙ্কিনী হইবি, অন্ধকার সূতিকাগৃহে ইহা আমার মনে ছিল না। ছোটবেলা যত দিন প্রতিপালন করিয়াছি, তখনও জানিতাম না। কিন্তু মিহিরা! এত দিনের পর তুই আমার চক্ষুদান দিলি। পাপসর্প তোর মস্তকে দংশন করিয়াছে। কিন্তু তুই মরিস্ নাই। সেই বিষ আমার দেহকে জর্জ্জরিত করিতেছে। মিহিরা! এই শশিকুমার তোর পতির পুত্র, এই স্বর্গভূষণ তোর মাতার পুত্র। কেমন সম্বন্ধ ঠিক্ হইয়াছে'—তোর মৃত্যু নাই, কিন্তু আমার যেন মৃত্যুকামনা হইতেছে।"—না বলিয়া দিলেও পাঠক-মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, এই কথাগুলি আমাদের চতুর্ভুজলালের।

জগৎকুমারী দাঁড়াইলেন। বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া, সেই হস্ত নয়নে উত্থিত করিয়া, সেই হস্তের দ্বারা ললাটে আঘাত করিয়া, ঊর্দ্ধদিকে সেই দুই হস্ত তুলিয়া সকরুণস্বরে জগৎকুমারী কহিতে লাগিলেন, "পরমেশ্বর! আমারে দয়া কর! পিতা!—পিতা জানি না, যিনি সম্মুখে রহিয়াছেন, তিনিই আমার পিতা। আমি পাগলিনী হইয়াছি। পতিত্যাগিনী পাগলিনী। পিতা! তুমিও আমাকে দয়া কর। আমি মরিব। এই ঘরেই মরিব। ছার জীবনে,—পাপজীবনে আর আমার কাজ নাই! না জানিয়া, না বুঝিয়া, এই জীবনে, এই বয়সে, কত পাপ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই, সীমাও নাই। এ জীবন আহুতি দেওয়াই ভাল। কে সুহৃদ আছ, বিষ দাও, বিষপান করিয়া এই পাপজীবন বিসর্জ্জন করি।"

মৃদুগম্ভীরগর্জ্জনে হরবিলাস কহিলেন, "একটু থাক্। এখনও সময় আইসে নাই। তুচ্ছ বিষ তোর কলঙ্কিত জীবন হরণ করিতে পারিবে না! জলধির অগাধ জলরাশি তোর পাপজীবনকে ডুবাইতে পারিবে না! বিস্তৃত অনন্ত অগ্নিকুণ্ড তোর ঐ পাপজীবনকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না! হিমালয় পর্ব্বতের শিখর হইতে লাফ দিয়া পড়িলেও তোর মরণ নাই। রাণী জগৎ-কুমারি! তোমার যম আমার হাতে। কিন্তু বিলম্ব আছে। আরও অনেক কথা শুনিতে হইবে, অনেক খেলা খেলিতে হইবে, বিস্তর খেলা খেলিয়াছ,

এখনও বিস্তর বাকী। অঙ্কশাস্ত্র প্রমাণে জমাখরচ মিলাইলে যেখানে খরচ কম্ থাকে, সেই খানেই বাকী পড়ে। এখনও বিস্তর বাকী।”

করাল ক্রোধকে হাস্য মাখাইয়া ছোট ছোট কথায় এইপ্রকার গুপ্ত আভাস ব্যক্ত করিয়া কুমার হরবিলাস আপনার মাথার উপর তরবারি ঘুরাইলেন। হাত ধরিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, বাধা দিও না ভাই। বলিতে দাও, শুনিতে দাও, পাপীলোকের মনের অনেক কথা আসন্নকালে আকর্ষণ করা যায়। জগৎকুমারী মরিবার আকিঞ্চন পাইতেছে। মৃত্যু কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র পাপীর নিকটে উপস্থিত হয় না। তুমি ইহার কথায় বাধা দিও না।”

“তুমি আবার কে গা?” মুখ ফিরাইয়া, ভূপেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া জগৎকুমারী কহিলেন, “কথায় উপর কথা ফেলিতেছ, তুমি আবার কে গা? আমি মরিতে পারি না পারি, তোমার তাহাতে কি?”

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “আমার কিছুই না, আমি কেহই না, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত দেখিবার আশা করে, তাহাদেরই মধ্যে আমি একজন সামান্য দর্শকমাত্র।”

শশিকুমার, স্বগভূষণ, আর রঘুবর বাও একসঙ্গে ছয় চক্ষু পাকল করিয়া ভূপেশচন্দ্রের দিকে সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। চক্ষে যদি অগ্নি থাকিত, রাজপুত্র ভস্ম হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কৌতুকান্বিত হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “অতি অল্পক্ষণের জন্য যে চক্ষু পৃথিবীর আলো দেখে, সে চক্ষু ঐ রকমেই জ্বলে। বেশী জ্বলিলেই শীঘ্র নির্ব্বাণ হয়। তোমরা মনে করিতে পার, তোমাদের কুটিল দৃষ্টিপাতে আমি ভয় পাইব; কিন্তু তোমরা জান না, মনে করিতেও পার না, অনেকদিন পূর্ব্বে ভয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ভয় করিবার অনেক বস্তু ছিল, ভয় করিবার অনেক কারণ ছিল, ভয় করিবার অনেক সময় ছিল, কিন্তু ভয় করিবার মানুষ ছিল না। কোন মানুষকে দেখিয়া আমি কখনও ভয় করি নাই। হৃদয়ে আমার একটী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম ধর্ম্ম। তিনি সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন, বিশ্বেশ্বর হইতে পারেন, কিম্বা সর্ব্বরাজ্যের অধিপতি ত্রিলোকেশ্বর হইতে পারেন, আমি তাঁহাকেই একনামে ধর্ম্ম বলিয়া জানি। তাঁহাকেই কেবল ভয় করি, আর কাহাকেও না। তোমরা দেখিতেছ, মুক্তকোষ তরবারি আমি

ভূতলে রাখিয়াছি। যে ক্ষত্রিয়কুমার ক্ষণকালের জন্যও অস্ত্রশূন্য থাকে না, সেই ক্ষত্রিয়কুমার আজ নিরস্ত্র। তোমরা কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছ কি? জীবের প্রতি আমার হিংসা নাই, মায়া আছে। যাহারা অকারণে পরমশত্রু, তাহাদিগকেও আমি ক্ষমা করিয়াছি। শশিকুমার না জানিতে পারেন, কিন্তু তুমি কি না জান স্বর্গভূষণ? তোমার পিতাই বা কি না জানেন? আরও,—শ্লাঘা করিয়া বলিতেছি না,—আরও, যাঁহাকে রক্ষা করিতে এই কাটগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, যাঁহাকে মুক্ত করিবার অভিলাষে এই বাতুলালয়ে আসিয়াছি, তিনিই বা কি না জানেন? তিনি এখন আমার চক্ষে ইনি। এই রাজা বিরাটকেতু এখন বড় বিপদাপন্ন। পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহাঁর মনে এখন কষ্ট দেওয়া ভাল হয় না। তোমরা যেরূপ কোপদৃষ্টিতে এখনও আমার পানে চাহিতেছ, কার্য্যে আমি যদি যথার্থ প্রতিহিংসা জানিতাম, তাহা হইলে কখনই আজ অক্ষত শরীরে তোমরা বাহির হইতে পারিতে না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার হস্তে না হউক, অন্য হস্তে উচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হইত;—হইতই হইত। কি দেখ স্বর্গভূষণ! তোমাদের অবস্থা তোমরা যদি নিজেও না জানিতে পার, আমি জানিতে পারি। রাজা রঘুবরকে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তবে কি জান স্বর্গ ভূষণ! মানুষ একেবারে শোকে দুঃখে অবসন্ন হয় না। উপযুক্ত পুত্রকে শ্মশানে ভস্মশেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া পিতা আবার আত্মপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য অন্নজল গ্রহণ করেন। রাজা রঘুবর বাহাদুর তাহাই করিয়াছিলেন। তুমি ত মরিয়াইছিলে। যে লোক তোমাকে অনেক সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছিল, যে লোক তোমাকে অনেক পাপকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল, যে লোক তোমাকে কুমন্ত্রণা দিতে বাকী করে নাই, সেই লোক তোমার বন্ধু। পত্রে লিখিয়াছিল, সেই লোক আমার চিরশত্রু;—জাতশত্রু। যদি মনে করিবার শক্তি থাকে, মনে করিয়া দেখ, টাকার লোভে তোমাকে খুন করিবার জন্য সেই লোক তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছিল। সেই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। আমি যদি বিচারপতি হইতাম, রাজ্যের রাজক্ষমতায় আমার যদি কিছুমাত্র হাত থাকিত, তাহা হইলে সেই বেচারা বিতাস্থকে কদাচ আমি সেরূপে মরিতে দিতাম না। মরিতে দেওয়া না দেওয়া

মানুষের সাধ্য নয়, কিন্তু মারিতে দিতাম না। তুমি স্বর্গভূষণ! মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছ, আমি খুসী হইয়াছি। রাজা রঘুবর রাও পুত্রশোক ভুলিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। এখন একটু শান্ত হইয়া থাকিলেই ভাল দেখায়। বিষ-দন্তবিহীন ভুজঙ্গের ন্যায় ফণা তুলিলে কোন ফল হইবে না। আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসা আসিলে, আমার হস্তে শক্রবিনাশী অসি থাকিলে কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ক্ষমা করিতে জানি, ক্ষমা করিতে পারি, ক্ষমা করিয়াছি, ক্ষমা করিলাম, কিন্তু অপরে তোমার দুষ্টতা ক্ষমা করিবে কেন রাজকুমার? জীবন যাইতেছিল একজন দয়ালু ভদ্রলোকের অনুগ্রহে জীবন পাইয়াছ। ঠাণ্ডা হইয়া থাক। আমার প্রতি রোষকষায়িত-লোচনে চাহিয়া দোষাও না। আমি ছাড়া এখানে তোমার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। বেশ্যা জগৎকুমারী তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। রাগ কেন? তোমার রাগে তোমারই অমঙ্গল সম্ভাবনা। রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র আমি। যদি অহঙ্কার বিবেচনা কর, এমন সময় এমন কার্য্যে সে অহঙ্কার আমার অলঙ্কার। রাজা রঘুবরের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে আমার কষ্ট হয়। তুমি স্থির হইয়া থাক; যাহা বলিবার, ইঙ্গিতে সংক্ষেপে তাহা বলিলাম, আর অধিক প্রকাশ করিবার এখন আবশ্যক বুঝিতেছি না।"

অসি ঘূর্ণিত করিয়া হরবিলাস কহিলেন, "রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র! তুমি আমার মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমি তোমার অবাধ্য হইব না। তোমার আজ্ঞা অবহেলা করিব না। কিন্তু ধর্ম্মাত্মন্! একে একে তুমি যেন আমাদের সকল আশাভরসা ঘুচাইয়া দিতেছ। এ যুগে এত ক্ষমা কি শোভা পায়? যুগ আসিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পাপময়ী পৃথিবী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। এ যুগ কেবল পাপ প্রসব করে। এ যুগে সরলের সহিত সরলতা, শঠের সহিত শঠতা, এইরূপ ব্যবহার না করিলে সংসারাশ্রমে তিষ্ঠিবার উপায় নাই। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপ্রিয়। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বীর্য্যবান্ চারি ভ্রাতাকে পদে পদে বীরের কার্য্যে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের জন্য কুরুসভায় পাশাখেলায় পরাজয়। তাঁহার ধর্ম্মে, তাঁহার ক্ষমায় কুরু-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। তাঁহার ধর্ম্মে, তাঁহার ক্ষমায়, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস। তাঁহার ধর্ম্মে, তাঁহার ক্ষমায়, সংবৎসরকাল বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস। তাঁহার

ধর্ম্মে, তাঁহার ক্ষমায় দ্রৌপদীহরণকারী জয়দ্রথের পরিত্রাণ। তাঁহার ধর্ম্মে, তাঁহার ক্ষমায় চিত্ররথের হস্ত হইতে সপরিবার রাজা দুর্য্যোধনের মুক্তিলাভ। পাণ্ডবের যতদূর অসহ্য কষ্ট, তৎসমস্তেরই মূল রাজা যুধিষ্ঠির; সমস্ত কষ্টেরই হেতুভূত রাজা যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম আর ক্ষমা। তোমাকেও যেন দেখিতেছি, তুমি রাজকুমার যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মপালন করিতেছ। ধর্ম্মের আদর আমি করি না, এমন নহে, ক্ষমার আদর আমি জানি না, এমন নহে, ধৈর্য্যের মহিমা আমি বুঝি না, এমনও নহে; কিন্তু ভ্রাত! সকল বিষয়েরই সীমা আছে। সীমা লঙ্ঘন করিলেই গুণগৌরব খর্ব্ব হয়। যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়া আসন্নকালেও ছোট হইতে চাহে না, তাহাদিগকে ক্ষমা করা কি সাধুধর্ম্মের উপদেশ? মহাপাপে লিপ্ত হইয়াও যাহারা আরও পাপগর্ব্বিতভাবে সর্পের মত গর্জ্জন করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা কি সত্য সাধুক্ষমার উপদেশ? দন্তশূন্য হইয়াও যাহারা নিরপরাধী সাধুলোককে দংশন করিবার অভিলাষে বদন ব্যাদন করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা কি সত্য সাধু-ধর্ম্মের অনুজ্ঞা? আমি ত রাজকুমার ক্ষমা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিব না। অনুমতি কর, পাপাত্মাদের উচিত শাস্তি প্রদান করি। পিতার অনুমতি শীঘ্রই গ্রহণ করিতে পারিব, অপ্সরাদেবীর অনুমতিও শীঘ্রই পাইব; কেবল তোমার অনুমতি অপেক্ষা। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, তথাপি কি মানুষ চিনিতে পারিতেছ না? তুমি যেমন অজ্ঞাত পরিচয়ে দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছ, আমিও সেইরূপ ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কে আমি, তাহা জানিতে না, কিন্তু আমার কার্য্যকলাপ অনেকদূর তোমার জানা আছে। ক্ষমা জানি, ধর্ম্ম জানি, ধৈর্য্য জানি, দয়া জানি, কিন্তু যাহারা অপাত্র, তাহাদিগকে ঐ সকল অমূল্য বস্তু প্রদান করিতে জানি না। কুলকলঙ্কিনী কুলটা কালসাপিনী জগৎকুমারী রক্ষক ডাকিতেছিল, তাহা কি তোমার মনে নাই রাজকুমার? তাহা কি তুমি শুনিতে পাও নাই? ডাকুক্।—আমি আদেশ করিতেছি, ডাকুক্; তুমি আদেশ কর, ডাকুক্। জগৎকুমারীর রক্ষকেরা আমাদের সম্মুখে আসিয়া জগৎকুমারীকে রক্ষা করুক; জগৎকুমারীর দলকে রক্ষা করুক; তাহাই ত উত্তম। তাহারা

প্রবেশ করুক, তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া থাক। যে পথে প্রবেশ করিয়াছি, সে পথে বাহির হইব না। কাটগড়া ভাঙ্গিয়া দিব, নখে নখে শত্রুমুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিব। মশামাছী বধ করিতে হাতে তলোয়ার? বৃথা জীবন, বৃথা রক্ত, বৃথা ক্ষত্রিয় নাম।”

হান্ হান্ শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিন জন লোক অস্ত্রহস্তে আগুয়ান হইল। “অনুমতি দিয়া ভাল করি নাই। আমাদের পাগল আমরা রাখি, অনেক পাগল রাখিয়াছি, কিন্তু এমন পাগল দেখি নাই। লোক জড় করে, লোকেরা বীরদর্প প্রকাশ করে, আমরা কি না বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি? যেন কেহই না। অন্য লোক ঘরের ভিতর আধিপত্য করে, ইহা কি সহ্য করা যায়? আমাদের অস্ত্রের মুখে মহামহা বীর দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু ইহারা,—কে ইহারা,—ইহারাই জানে। বাঘের মুখে আসিয়াছে, তাহা জানে না! অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, নিজের লোক বলিয়াছিল, দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিতে দিয়াছিলাম. তাহারই বুঝি এই ফল? হাঁকা, ডাকা, হাঙ্গামা! কুচি কুচি করিয়া কাটিব। জীবন্ত আসিয়াছিল, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বাহির করিব। কাহারও প্রবেশের অনুমতি নাই। যাহারা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা –”

“কি? প্রবেশের অনুমতি নাই? টুক্‌রা টুক্‌রা? খণ্ড খণ্ড? এতদূর স্পর্দ্ধা? আমি তোদের চিনি।” ভূমে পদাঘাত করিয়া দুই হস্ত উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিয়া ভীষণ ব্যাঘ্রগর্জ্জনে হরবিলাস কহিলেন, “টুক্‌রা টুক্‌রা! আয় দেখি,—আয় দেখি, কে কাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে! অপ্সরাসুন্দরি! একটু সরিয়া যাও। মহারাণী বিরজা! পূজনীয়া জননীদেবি। অপ্সরাকে ধরিয়া রাখ। একটু সরিয়া যাও,—উভয়েই যাও। আজ আমি নূতন নূতন কথা ভুলিয়া গিয়া পুরাতন দৌরাত্ম্যের প্রতিশোধ লইব। কেহ যদি নিষেধ করেন, শুনিব না। পিতা যদি নিষেধ করেন, চরণে তলোয়ার রাখিয়া ক্ষমা চাহিব। যাও, যাও, তোমরা সরিয়া যাও। হিন্দু-রাজত্বে যবনের আধিপত্য কত দূর, সিংহের আসনে ইন্দুরের প্রভুত্ব কত দূর, আজ দেখিব। আয় আনোয়ার! আয় লেকায়ৎ! আয় হনুমান! কে তোদের রক্ষা করে দেখি!– কে এখানে উপস্থিত আছে জানিস্? ইন্দুরের কিচিমিচি,

মাছীর ভন্ ভন্ ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতে দিব না। একমাত্র আমি। স্মরণ করিয়া দেখ্, আমি তোদের সেনাদলে পোশাক যোগাইতাম। তোরা জানিতিস্, আমি কাপড় বেচিয়া খাই। কিন্তু আজ দেখ্, অনেক দিন দেখিয়াছিস্, অনেক দিন চিনিয়াছিস্, হাসিয়া হাসিয়া অনেক দিন আমার সহিত কথা কহিয়াছিস্, কিন্তু আজ দেখ্, সেই কাপড়ব্যাপারী আমি। রাজকুমার ভূপেশচন্দ্রের দেহরক্ষক, অনুগত ভৃত্য হরবিলাস আমি। সম্মুখে ভূপেশচন্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গুলীর আঘাতে এই বাতুলালয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তিনি কেমন স্থির দেখ্। যাঁহাকে নষ্ট করিবার জন্য তোরা রাশিরাশি কুচক্রজাল বিস্তার করিয়াছিলি, সেই ভূপেশচন্দ্রের কতদূর ক্ষমা, প্রাণ থাকিতে থাকিতে তাহা দেখ্। প্রাণ আজ আর থাকিবে না। শেষ দেখাই দেখা, শেষ কথাই কথা, শেষ পরিচয়ই পরিচয়। প্রস্তুত হইয়া দাঁড়া। দেখ্ দেখ্ ভূপেশচন্দ্রের ক্ষমা। ক্ষণেকের জন্য তিনি সুস্থির হইতে পারেন, কিন্তু আমি,—আমি হরবিলাস, আমার ক্ষমা কম;—আমি শীঘ্র সুস্থির হইতে জানি না। অনুমতি পাইয়াছি, দাঁড়া তোরা। ভিতরে আছি, রাজা বিরাটকেতু মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই জন্য ভিতরে আসিয়াছি। বাঁচাইয়াছি। বাহির হইতে কি পারিব না? জগৎকুমারি! তুমি কেন ঘোম্‌টা টানিতেছ? এমন সময়েও আমার মুখে হাসি আসিতেছে। বেশ্যার আবার লজ্জা! শশিকুমারকে কাটিব, স্বর্ণভূষণকে কাটিব, আর এই তিনটা নরকের পিশাচ, ইহাদিগকেও কাটিব। যদি না কাটি—” ভূপেশচন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে হরবিলাস আবার কহিলেন, “ভুলিয়া বলিয়াছি ও কথা;—ও কথা বলিতে নাই। আনোয়ার! আমি ভিতরে রহিয়াছি, বাহির হইতে পারিব না, ইহা মনে করিয়াই বুঝি তোদের এতদূর দর্প? জগৎকুমারীর রক্ষাকর্ত্তা তোরা? ঐ পাপীয়সীর রক্ষাকর্ত্তা ত্রিসংসারে নাই। অস্ত্রধারণ করিয়া আমাকে তোরা কাটিতে আসিয়াছিস্! প্রভুত্ব দেখাইতে প্রবেশ করিয়াছিস্! মিথ্যা আকিঞ্চন। আমি আছি, ভূপেশচন্দ্র আছেন, ছোট একটী ক্ষত্রিয়পুত্র দয়াল কুমার আছে। কিন্তু একা আমি তোদের মত শতসহস্র নারকীকে চক্ষের নিমেষে নরকনিবাসে প্রেরণ করিতে পারি।”

অস্ত্র ঘুরাইয়া আনোয়ার-বথ্ত কহিল, "যম তোমার নিকটে। যতক্ষণ গর্জ্জন করিতে পার, ততক্ষণ গর্জ্জন কর।"

মুখে হরবিলাস যাহা কহিলেন, কার্য্যে তাহা দেখাইলেন না। কাটগড়া হইতে বহির্গত হইলেন। সদর্পে কহিলেন, "আনোয়ার! এত জোরের জোরের কথা তোর? মুণ্ড এইখানে গড়াগড়ি যাইবে। রক্ত এইখানে গড়াইয়া যাইবে। এখনও পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাতে এতদূর অহঙ্কার?"—আসি উত্তোলন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছিলেন, বিশ্বেশ্বরের সহিত ভূপেশচন্দ্র আসিয়া নিবারণ করিলেন। অসিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "কর কি হরবিলাস। কর কি? ইঁদুর মারিয়া হস্ত কলঙ্কিত কর? ক্ষত্রিয় অসি কলঙ্কিত কর? আমার দিকে চাহিয়া দেখ, ক্ষমা দাও। এক এক চপেটাঘাতে এমন সহস্র সহস্র আনোয়ার আমি নিপাত করিতে পারি। ভাই! প্রাণাধিক! একটা সামান্য পতঙ্গকে নিধন করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-কুমারের তরবারি উঠিবে? না, সম্মুখে আমি থাকিতে কখনই তাহা উঠিতে দিব না। আনোয়ার! কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? সে দিন তোমার ফুরাইয়া গিয়াছে। তোমার দম্ভ, তোমার দর্প, তোমার প্রভুত্ব, অনেকবার আমি সহ্য করিয়াছি, এখনও জীবন রক্ষা করিলাম। জানিতে তোমরা, আমি নিঃসহায়। সত্য সত্য তাহা হইতে পারিত, কিন্তু ক্ষত্রিয়-বীর্য্য কেবল সাহস সহায় করিয়া পৃথিবীতে চরে। মনে করিলে তখনই আমি তোমাকে কাটিতে পারিতাম। কিন্তু ইচ্ছা আমাকে তেমন উপদেশ প্রদান করেন নাই। তুমি আসিয়াছ, লেকাবৎ আসিয়াছে, হনুমান আসিয়াছে, দেখিতেছি। বড় হাসির কথা। মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল প্রদান করিয়া যাহাদিগকে আমি বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, তলোয়ারে তাহাদিগকে কাটিব, কিম্বা কাটিতে দিব, এমন ছোট বংশে আমার জন্ম হয় নাই। আসিয়াছ, থাকো, যাহা দেখিতে হয়, দেখ। দর্প প্রকাশ করিয়া বীরত্ব দেখাইবার প্রয়াস পাইও না। হরবিলাস বালক। বিশ্বেশ্বর বালক, ইহারা উভয়ে আমার কথা অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র নহে। তুমি অস্ত্র-ধারী হইয়া আসিয়াছ, তোমার সঙ্গীরা অস্ত্রধারী হইয়া আসিয়াছে, দেখিতেছি; কিন্তু আমার একটীমাত্র অঙ্গুলী যদি তোমাদের অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা হইলে

তোমাদের তিনটী মস্তক বাতাসে উড়িয়া যাইবে। আসিয়াছ, স্থির হইয়া থাক, কর্তৃত্ব থাকে, জানাও। শান্ত হইয়া কথা কও। জোর করিলেই সব কথা ফুরাইবে।”

দূর হইতে হাস্য করিতে করিতে অপ্‌সরা সুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া ভূপেশ-চন্দ্রকে কহিলেন, “কাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছ ভূপেশ? দেখিতেছি তুমি নিরস্ত্র। ইহারা সশস্ত্র। আর আমারে কেন যন্ত্রণা দাও? নিপাত কর। আমার বক্ষঃ বস্ত্রে একখানি রক্ষাঅস্ত্র লুকাইয়া আছে। গ্রহণ কর, শত্রুপক্ষ বিনাশ কর। মায়াদয়া অনেক দেখাইয়াছ, ক্ষমাধৈর্য্য অনেক দেখাইয়াছ, কিন্তু আর কেন রাজকুমার? ক্ষত্রিয়সন্তান নিরস্ত্র। হও নিরস্ত্র, ভয় করি না, আমার অস্ত্র গ্রহণ কর। কাটিয়া ফেল। না পার, আমারে অনুমতি দাও, ভৈরবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নেত্র পালটিতে রিপুকুল সংহার করিয়া ফেলি।”

দুই দিকে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া রাজকুমারাকে বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “তোমাকে এখানে কে ডাকিয়াছে?—যেখানে আমি আছি, যেখানে হরবিলাস আছে, যেখানে এই ক্ষুদ্রসর্প বিশ্বেশ্বর আছে, সেখানে বৈরীদল অগ্রসর হইতে পারিবে না, তাহা তুমি জান; যুদ্ধক্ষেত্র নয়, তাহাও তুমি জান। বিপক্ষ অনেক আছে, যাঁহাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি, তিনিও বিপক্ষ, তাহাও তুমি জান, স্বহস্তে কাহাকেও আমি আঘাত করিব না, তাহাও তুমি জান, জানিয়া শুনিয়া কেন তবে আমাকে নিবারণ করিতে আসিয়াছ? যমের পিতা সূর্য্যদেব। সেই সূর্য্যবংশে তোমার পিতার জন্ম। তুমি অপ্সরা! সূর্য্যবংশের কুললক্ষ্মী। তুমি যেখানে উপস্থিত, আমি সেখানে উপস্থিত, সেখানে বিপক্ষ কখনই বিজয়ী হইবে না। যেখানে বসিয়া ছিলে, সেইখানে যাও। নিরস্ত্র হইয়াও আমি বৈরীকুল বিনাশ করিতে সমর্থ।”

অপ্সরাসুন্দরী সরিয়া গেলেন। পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিয়া সেই তিনজন রক্ষক ভূপেশচন্দ্রকে কহিল, “এই নিবাস সকলের জন্য অবারিত নহে। অনুমতি দিয়াছিলাম, প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলে, কিন্তু কতক্ষণ? শীঘ্র বাহির হইয়া যাও। বিলম্ব করিলে দিল্লীশ্বরের আদেশে অস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।”

"অস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ?"—ক্রোধপূর্ণ হাস্যের সহিত ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ? আনোয়ার! সাবধান হইয়া কথা কও। অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। বাড়ীখানা উপ্‌ড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি। তোমাদের সর্ব্বদর্প চূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু আসিয়াছি এক অনুরোধে। সে অনুরোধ মনে মনে জাগে। তোমরা কেন ভয় দেখাইতেছ? তোমাদের ভয়ে ভয় পায়, এখানে এমন লোক কম আছে। জান আমি কে?"

"জানি,—তুই দাগী বদ্‌মাস ভূপেশচন্দ্র।"

"হাঁ! সত্য সত্য আমি দাগী বদ্‌মাস ভূপেশচন্দ্র। কিন্তু এখন তোমরা কোন্ সাহসে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ?"

"মরিবার সাহসে, কাটিবার সাহসে।"

"তাহা বুঝিয়াছি। আমাকে কাটিবার জন্য তোমরা যে আসিয়াছ, বিরাটকেতুকে আটক করিবার জন্য যে তোমরা আসিয়াছ, অপ্সরাসুন্দরীকে অসতী করিবার জন্য তোমরা যে এখানে আসিয়াছ তাহা বুঝিতেছি। দল আছে, দলে থাক, ঐ দিকে চাহিয়া থাক, যে দিকে শশিকুমার আছে, যে দিকে স্বর্গভূষণ আছে, সেই দিকে চক্ষু রাখ আমাকে মাতাইয়া দিও না। আমার চক্ষু সকল দিকে ঘোরে। তলোয়ার নাই, এখনি আনিতে পারে, এক কোপে আমি সহস্র মুণ্ড নিপাত করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না, তোমরা ক্ষমা কর বাহির হইয়া যাও।"

"আমরা বাহির হইয়া যাইব? আমাদের ঘর, আমাদের পাগল, আমরা রক্ষাকর্ত্তা আমরা বাহির হইয়া যাইব? তুমি কে? বাহির হইতে বলিতেছ, তুমি কে?"

"আমি?—তিনজনেই ত তোমরা আমাকে জান। তখন আমি অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া এক প্রকার ক্রীতদাস ছিলাম। তাহার পর, অনেক প্রকার সাজা পাইয়াছিলাম। তাহার পর সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া ভূপেশচন্দ্র হইয়াছি। দেখিতেছ আমার হস্ত, দেখিতেছ আমার পা, দেখিতেছ আমার মস্তক, দেখিতেছ আমার মুখ; অধিক আড়ম্বর করিও না। এক এক মুষ্ট্যাঘাতে সমস্ত আড়ম্বর চূর্ণ করিয়া দিব। অপ্সরা! আর তফাতে থাকিতে হইবে না। হরবিলাস! আর ক্ষমা করিতে হইবে না। তোমার যাহা

ইচ্ছা, তাহা তুমি কর। রাজা বিরাটকেতুকে কেহ যেন আঘাত না করে। রাজা রঘুবরকে কেহ যেন একটীও কুৎসিত কথা না বলে। তলোয়ার দাও। অধিকক্ষণ আর আমি নিরস্ত্র থাকিব না। মহারাজ! মহারাজ! মহারাজ! পিতা! এই নরকে আর কতক্ষণ থাকিবেন? আনোয়ার! বাঘ ছিলে, কুকুর হইয়াছ। লেকায়ৎ! বেরাল ছিলে, ইঁদুর হইয়াছ। হনুমান! হনু ছিলে, মর্কট হইয়াছ।—থাক্ থাক্, জীব জন্তু থাক্, মারিব না। মহারাজ! ইহারা সকলেই থাকুক, বিরাটকেতুকে লইয়া, অপ্সরা-সুন্দরীকে লইয়া আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি।"

"তাই বুঝি তাই? আমাদের হুকুম অমান্য করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করে, এমন সাধ্য কাহার?"

"সাধ্য নাই? বাধা আছে? কে বাধা দিতে পারে, আসুক।"

"আমরাই পারি। এই আলয় হইতে কেহ বাহির হইতে পারিবে না; রাজার হুকুম আছে। নিষেধ করিতে আমরাই পারি।"

"সত্যই পারে!"

কথা কাটাকাটি করিতে করিতে অধিক উত্তেজিত হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "রক্তপাতে আমার বাসনা নাই। ঘুম ছিল, ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তোমরা আমাকে যেন রণভূমে জাগাইতেছ। যদি অস্ত্র প্রহার করি, আমার দোষ নয়। হরবিলাস যদি অস্ত্র প্রহার করেন, নিবারণ করিব, নিবারণ না শুনিলে আমি অপরাধী হইব না। তোমরা আপনারাই বাড়াবাড়ি করিতেছ। আনোয়ার! মনে করিয়া দেখ দেখি, যে রাত্রে তুমি আমার পত্রখানি পুড়াইয়া ফেল, সে রাত্রে আমি তোমাকে কতদূর ক্ষমা করিয়াছি। মুষ্ট্যাঘাত করিতে পারিতাম, চপেটাঘাত করিতে পারিতাম, পদাঘাত করিতে পারিতাম, সঙ্গে অস্ত্রও ছিল, মস্তকও ছেদন করিতে পারিতাম, কিন্তু ধৈর্য্য আমার সহচর। ক্ষমা আমার সহচরী। ধৈর্য্যকে আর ক্ষমাকে বুকে রাখিয়া আমি তোমার জীবনকে তোমার দেহে রাখিয়াছি। মনে আছে সে কথা আনোয়ার? তোমার তখন বেশী ক্ষমতা ছিল। আমি তখন ছোট ছিলাম। আমি তোমাকে জানিতাম, তুমি আমাকে জানিতে না। কিন্তু এখন?—এখনও দুরাত্মা! ধর্ম্মের অনুরোধে আমি তোকে

ক্ষমা করিতেছি। এক হাত আমার অন্য দিকে থাকিয়া হরবিলাসকে নিবারণ করিতেছে। কেন জান আনোয়ার! ঐ মুণ্ড এই দণ্ডে হরবিলাসের খড়্গে ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে পারে। তাহা হইতে আমি দেখিব না। আস্ফালন করিতে আসিয়াছ, আস্ফালন কর। আমি অনেক সহ্য করিতে জানি, অনেক সহ্য করিব, কিন্তু ভুজঙ্গশিশুরা সহ্য করিবে না। বিষ আমারও আছে, তাহাদেরও আছে। যেখানে অপ্সরাসুন্দরীর অপমান, সেখানে তোমাদের মস্তক আমার পদতলে বিদলিত হইতে পারে। কিন্তু সে জন্যও না। অপ্সরার পালক পিতা বিরাটকেতু পাগল হইয়াছেন। তাঁহাকে আরাম করিবার জন্য,—উদ্ধার করিবার জন্য, মুক্ত করিবার জন্য, আমি এই বাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়াছি। তোমরা মরিবে, মরিবার জন্য আসিয়াছ, একটী মাত্র হুঁ দিলেই তোমাদের জীবাত্মা তোমাদের দেহ ছাড়িয়া অন্য লোকে প্রস্থান করিতে পারে। কিন্তু আনোয়ার! দেখিবার অনেক আমার বাকী আছে।”

একটী ছেলে ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলো, বলিতে পারিতাম, কিন্তু ছেলে বলে কি? ঘুমন্ত কি জাগন্ত? ছেলে বলিতেছে, “নছিক্ পুলুছ! দানে না।—কথা বোল্‌তে দানে না। আমি আছি, মাচ্ আছে, দানে না। ছুছু কোলে কতবার বলেছি, শোনে না। আজা! তুমি কেন কথা কও? কুট্ কুট্ কোলে উঁদুর কামড়ায়। তোমরা কি দেখ না? গেন্থ, গেন্থ! মন্থ, মন্থ! চুল ছিঁড়ে নিল! নছিক্! নছিক্! নছিক্ পুলুছ!”

ছেলেটা কে? জগৎকুমারীর কুমার। “ছেলে! তুমি জগৎকুমারীকে জান? পিতার নাম জান?”

ছেলে একটু কাঁদিয়া উত্তর করিল, “কে একজন বোল্‌ছিল, নছিক্ পুলুছ। সে এখন কোথায় গেল?”

“কোথাও যায় নাই। নছিক পুলুছ তিনজন। জগ্যভূছন, ছছিকুমাল, আর বিলাটকেতু।”

“বিলাটকেতু? ও মা! জুজু যেন!”- কথা বলিয়া শিশু যেন অজ্ঞান হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সান্ত্বনা করিয়া একজন তাহাকে কত কথা

বুঝাইতেছিল, কিন্তু শিশু কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। হাস্য করিয়া চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "রাজা বিরাটকেতু! চাহিয়া দেখ, কেমন ছেলে। তোমার শশিকুমার অপেক্ষা এ ছেলে সুন্দর।" মুখ লুকাইয়া হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ পুনরায় কহিলেন, 'মহারাজ! পরম ভাগ্যফলে, ভাগ্যবলে লোকে নাতীর মুখ দেখে। তুমি নাতীর মুখ দেখিতেছ। এই ছেলেটী তোমার নাতী হয়। অপ্সরাসুন্দরীর সন্তান হয় নাই, কিন্তু এই ছেলেটী তোমার পুত্রের পুত্র।—শশিকুমারে ঔরসে রাণী জগৎকুমারীর গর্ব্ভে এই পুত্র-রত্নের জন্ম।—নাতীও বটে, ছেলেও বটে!—শশিকুমারের সম্পর্কে নাতী, জগৎকুমারীর সম্পর্কে ছেলে!"

"অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ? তুমি বল কি চতুর্ভুজ। জগৎকুমারীর গর্ভে? ওঃ—ওঃ—ওঃ! আমাকে ধর!—চক্ষে আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না, কর্ণে আর কিছু শুনিতে পাইতেছি না। জগৎকুমারীর ছেলে হইয়াছে? শশিকুমারের ছেলে?—তুমি বল কি চতুর্ভুজ? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ?"

আবার পূর্ব্বরূপ মুখ লুকাইয়া হাসিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "না রাজা! তুমি বৃদ্ধ হইবে কেন? নছিক্ পুলুছ তুমি। নূতন রাণী বিবাহ করিয়াছ। নূতন সন্তানের মুখ দেখিবে না? অপ্সরাসুন্দরীকে পালন করিয়াছিলে, লক্ষ টাকার লোভে কাশরোগী স্বর্ণভূষণকে সেই কন্যারত্ন সমর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলে, শশিকুমারকে জানিতে না। কিন্তু দেখ দেখি রাজা, সেই শশিকুমার তোমার কতদূর উপকারী বন্ধু? প্রয়াগধামের লোকে জানিত না। কিন্তু সেই শশিকুমার তোমাকে কেমন একটী পুত্র দিয়াছে। তোমার পুত্র, শশিকুমারের পুত্র, রাণী জগৎকুমারীর পুত্র। এমন চমৎকার সম্পর্ক-ঘটনা সচরাচর সকলের অদৃষ্টে সংঘটিত হওয়া দুর্ঘট। পুত্র বল, পৌত্র বল, দুই সম্পর্কে যাহাই বল, কিন্তু রাণী জগৎকুমারী ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া এই ছেলেটী তোমার জন্যই প্রসব করিয়াছেন। কি বলিস্ মিহিরা? আমার কথা ঠিক্ কি না? রাজা বিরাটকেতু বৃদ্ধ? কাহার সাধ্য, কে বলে এমন কথা? পাকা চুলে সিন্দূর পরিয়া তুই সাবিত্রী হইবি। ছেলেটী নছিক্ পুলুছের কোলে দিয়া, রাজরাণী হইয়া আবার নূতন রাণীরূপে সংসারধর্ম্ম

করিবি। মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। তোর নছিক্ পুলুছ্ বিংশতি সহস্র প্রাপ্ত হইবে। কোন অভাব থাকিবে না, শশিকুমার উত্তরাধিকারী হইবে না, অপ্সরাসুন্দরী উত্তরাধিকারিণী হইবেন না, তুই মিহিরা, একাকিনী বিরাটকেতুর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, নূতন রাণী জগৎ-কুমারী। আর এই ছেলেটী শশিকুমারের বদলে একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু মিহিরা! কাহার ছেলে তাহা কি তুই মনে করিয়া বলিতে পারিস্? ভুজঙ্গিনি! তোর ফণা কোথায় গেল? তিন ফণা যখন তোর মস্তকের উপর উঠিয়াছিল, তখন কেবল আমি,—আমি চতুর্ভুজ,—আমি তোর মস্তক রক্ষা করিয়াছিলাম। স্ত্রীলোক তুই, তোরে আর অধিক কথা কি বলিব, আমি এখানে উপস্থিত না থাকিলে এই বাতুলালয়ে সমুদ্রস্রোতের মত মহারক্তস্রোত প্রবাহিত হইত। জগৎকুমারি! তোর কি কাণ আছে? তুই কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছিস্? তোর কি চক্ষু আছে? তুই কি আমাকে দেখিতে পাইতেছিস্? পাপিনী সাপিনী কালভুজঙ্গিনি! বড় অহঙ্কার তোর! থাক্ তুই! সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিব। হস্তিনাপুরীতে মুসলমানী সাজিয়াছিলি, রেজিয়াবেগম নাম ধারণ করিয়াছিলি, সেই সময়ের গর্ভ, সেই সময়ের এই ছেলে। কত খেলা খেলাইতে জানিস্ তুই মায়াবিনি! আমি মাটীতে থাকি, কিন্তু শূন্যে শূন্যে বিচরণ করি; আমার গুপ্তচরেরা শূন্যে শূন্যে বিচরণ করিয়া সব কথা আমার কর্ণে আনিয়া দেয়। মিহিরা! কাক পাখী বড় ধূর্ত্ত, বনের শেয়াল বড় ধূর্ত্ত, দেশের ক্ষৌরকার নাপিত বড় ধূর্ত্ত, আমি দেখিতেছি, নারীজাতি কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও সহস্রগুণ ধূর্ত্ত।”

“কাহারা?—কাহারা?—কাহারা? কথার উপরে কথা কহিতেছে, চক্ষু বিকাস করিয়া অস্ত্র কাঁপাইতেছে, উহারা কাহারা? জানে না, কাহারা এখানে উপস্থিত আছে? গলা টিপিয়া মারিতে পারে, বুকে পা দিয়া মারিতে পারে, জিব টানিয়াও খুন করিতে পারে। তলোয়ারে প্রয়োজন কি? থাক্, থাক্, থাক্! মুসলমানের বীর্য্য ক্ষত্রিয়বীর্য্যের নিকট কত ছোট, দেখ্। মুসলমানরাজত্বের শেষ হইয়া আসিতেছে। চন্দ্রসূর্য্যবংশের ক্ষত্রিয়-সন্তান এখানে উপস্থিত। কাহাকে রক্ষা করিব, কাহাকে নিধন করিব,

জানি না। মহারাজ উদয় সিংহের কন্যা সূর্য্যবংশের অলঙ্কার। তাঁহাকে আর তাঁহার সতীত্বকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনখানি রক্ষাকবচ আছে, ভূপেশচন্দ্রের তলোয়ার ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত। তাহা বলিয়াই কি আমরা নিরস্ত্র? আনোয়ার! তোর বলবিক্রম যাহা কিছু আছে, প্রকাশ কর্। বিচার করিবার জন্য বিচারাসনে বসিয়াছিলি, সে অভিমান পরিত্যাগ কর্। ক্ষত্রিয়কুমারের তলোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্। সকল দিন সকলের সমান যায় না। তোর এক দিন ছিল, আমাদের এক দিন আসিয়াছে। আনোয়ার! বিংশতি সহস্র মুদ্রা! স্বর্ণভূষণ তোরে বিংশতি সহস্র দিয়াছে। দিয়াছে কি না, জানি না,—স্বীকার করিয়াছে। ঘুস্‌খোর মুসলমান! লাথী মারিয়া দর্প চূর্ণ করিব। খৎ লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলি; স্বর্ণভূষণ খৎ লয় নাই। বাতাসে বিংশতি সহস্র উড়িয়াছে বলিয়া গর্ব্ব জানাইয়াছিল কিন্তু আনোয়ার! রাজপুত্রের রাজা পিতা রঘুবর রাও এখন এক মুষ্টি তণ্ডুলের নিমিত্ত লালায়িত! আমাদের নিকট অনেক অহঙ্কার করিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের নিকট অহঙ্কার চলে না। এই বিরাটকেতু এক সময় পেয়াদা ছিল, এক সময় রাজা হইয়াছিল, এক সময় ফকির হইয়াছে, এক সময় পাগল হইয়াছে। কখন কি হয়, কেহ জানে না; বিচিত্র বিশ্বের খেলা! রঘুবর রাও! তুমি ত কথা কহিতে পার, তবে কেন মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছ? বোবা না কি? ছলনা ছাড়িয়া দাও, দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; ভূপেশচন্দ্রের আদেশে ডাক ছাড়িয়া আমি তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, কথা কও, উত্তর দাও। স্বর্ণভূষণ তোমার কে?"

রঘুবর কথা কহিলেন না, উত্তর দিলেন না। চক্ষে হস্ত দিয়া কত কি যেন চিন্তা করিলেন। রাগে রাগে যেন ফুলিতে লাগিলেন। অভিমানী লোকের রাগ বড়। সে রাগ সহজে থামাইতে পারা যায় না।

স্তব্ধ।—একদণ্ড, দুই দণ্ড, চারি দণ্ড, স্তব্ধ। কাহার কথা কে শুনিবে, কাহার কথায় কে উত্তর দিবে, বক্তা কিম্বা উত্তরকর্ত্তা, কিম্বা প্রশ্নকর্ত্তা?—যেন সকলেই অগাধ জলে ভাসিতে লাগিলেন, থাই পাইলেন না। নৌকা আছে, ঢেউ ভেদ করিয়া সাগরের বুকে নৌকা চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু থামিবার স্থান কোথায়? ঘরে অনেক লোক, সমস্ত লোকেই যেন ভিন্ন ভিন্ন কারণে

রাগে রাগে পাকা। শীতল কেবল অপ্সরাসুন্দরী আর ভূপেশচন্দ্র। যাহারা রাগ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, অপ্সরা আর ভূপেশচন্দ্র হাস্য করিয়া তাহাদিগকে থামাইতেছেন।

"মানুষ বড় দুরন্ত জন্তু। আমরা মানুষ হইয়া মনুষ্য-ধামে আসিয়াছি, কিন্তু মানুষ দেখিলেই ভয় করে। জগৎপিতা ক্রমে ক্রমে জগতের সমস্ত জীবজন্তু সৃজন করিয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে মানুষের সৃষ্টি, আকাশে ডাকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর আনাইতে পারি না। দুষ্ট মানব, ধূর্ত্ত মানব, বঞ্চক মানব। যত কিছু দুষ্ক্রিয়া জগতে থাকিতে পারে, মানুষেরা তাহা দেখায়। অন্য অন্য জীবেরা ততদূর দেখাইতে পারে না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুমার হরবিলাস পুনর্ব্বার কহিলেন, "এই তিনটী লোককে আমি কাটিব। সাহস কি অধিক আছে? থাকে যদি, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া। বুকে তোদের ঢাল আছে? বুক ঢাকিয়া রাখ্। আমি ভূপেশচন্দ্র নহি। ক্ষমা আমি বেশী জানি না। ভূপেশচন্দ্রের ভ্রাতা আমি। ভূপেশচন্দ্রকে তোরা যত যন্ত্রণা দিয়াছিস্,—রঘুবর রাও! কথা কহিতেছ না কেন?—স্বর্গভূষণ! নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে কেন?—জগৎকুমারি! রক্ষাকর্ত্তা ডাকিতেছিলে, রক্ষাকর্ত্তা আসিয়াছে। যদি কিছু শিখাইয়া দিতে হয়, শিখাইয়া দাও। কিন্তু কিন্তু ক্ষত্রিয়সন্তানের এই তলোয়ার এই ক্ষেত্রে রক্তক্ষেত্র দেখাইবে। জান না তোমরা আমাকে, আমি মহারাজ মহানন্দ বাহাদুরের পুত্র। রাজা ক্ষমা করিতে পারেন, রাণী ক্ষমা করিতে পারেন, ভূপেশচন্দ্র ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ভুজঙ্গ, আমি হরবিলাস, আমি বেশী ক্ষমা করিতে জানি না। পায়ে পায়ে সমস্ত বিপক্ষদল বিদলন করিয়া ফেলিব। দুষ্টবুদ্ধিতে যাহারা পরিচালিত হয়, আমার কাছে তাহাদের নিস্তার থাকে না। শত্রুপক্ষের নিপাত আমার ইষ্টমন্ত্র। কে কে তোরা এখানে আছিস্? সম্মুখে আসিয়া দেখা দে। রাজা বিরাটকেতু বাতুলালয়ে, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কিম্বা উদ্ধার করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। প্রাণে যাহাদের ভয় আছে, তাহারা যেন হরবিলাসের তলোয়ারের সম্মুখে সাহস করিয়া দণ্ডায়মান না হয়।"

"কথা কহিতেছি, কথা শুনিতেছ না। কেন ভাই এত চঞ্চল হও তুমি?

দিন আছে, সময় আছে, দিনকর সূর্য্যদেব সাক্ষী আছেন, নিশাকর চন্দ্রদেব সাক্ষী আছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রেরা সাক্ষী হইবে, বৃক্ষলতারা সাক্ষী হইবে, সমুদ্রের জল, নদনদীর জল, সরোবরের জল, সংসারের ভালমন্দ বিচারের সাক্ষী হইবে। মানুষকে মন্দ কথা বলিতে নাই। যাঁহারা বন্ধু, তাঁহাদিগের প্রতি বরং অভিমান করা সাজে, কিন্তু যাহারা শত্রু, তাহাদিগকে দয়া করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকে, শত্রুকে উর্চু পিঁড়ি দাও। এ কথার মূল্য অনেক। সেই মূল্যবান্ বাক্যে আমি নমস্কার করি।”

ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কোন্ দিক দিয়া ভাঙ্গিয়া কে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আর কেহ জানিতে পারেন, কিন্তু ভূপেশচন্দ্র তাহা জানিতে পারেন নাই। হরবিলাসকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে অতগুলি কথা কহিলেন, কিন্তু নিকটে কাহারা, তাহা দেখিলেন না। কলিযুগ। এ যুগে পিতাকেও পুত্র গ্রাহ্য করে না। কিন্তু হরবিলাস কালভুজঙ্গস্বরূপ হইয়াও;— নরবিনাশী অসি হস্তে ধারণ করিয়াও ভূপেশচন্দ্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। মাথা তুলিলেন না, হাত তুলিলেন না, অসি তুলিলেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন, “ক্ষমা যে একটী কি পদার্থ, তাহা তুমি ভাল জান রাজকুমার। সম্মুখে বিপক্ষ আসিয়াছে, সম্মুখে বিপক্ষ দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি ক্ষমা। আমি তোমার অবাধ্য হইতে পারি না। কিন্তু রাজকুমার! ক্ষত্রিয়রক্ত শিরায় শিরায় বহে। সে রক্ত ক্ষত্রিয়ের সর্ব্ব শরীরকে অভিষেক করে। তুমি তাহা জান, জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে নিবারণ করিতেছ? দেখিতেছ কাহারা? ইহারা মুসলমানরাজ্যের মুসলমান। আনোয়ার আর লেকায়ৎ, ইহাদের নামেই ত পরিচয় আছে, কিন্তু হনুমান? এ লোকটা আরো ছোট; হিন্দু হইয়া মুসলমানের দাস। কিন্তু রাজকুমার! পিতা বর্ত্তমানে তুমি আমাকে নিবারণ করিতেছ, শুনিতেছি, সহ্য করিতেছি। পরিণাম কি আছে, তাহা জানিতে পারিতেছি না।”

সত্য সত্য হরবিলাস যাহা কহিলেন, ফলে তাহাই দাঁড়াইল। আনোয়ার বখ্‌ত মহাগর্জ্জন করিয়া ভূপেশচন্দ্রকে কহিল, “তত দিনের কথা এত শীঘ্র ভুলিয়াছিস্? যবনের পদানত ভৃত্য! বার বার দণ্ডপ্রাপ্ত ভৃত্য! আসামী! দাগী আসামী! সে সকল কথা কি মনে পড়ে না? এখন আমরা এই বাতুল-

নিবাসের কর্ত্তা। ইচ্ছা করিলে বাহিরের লোককে জুতার গুঁতা মারিয়া বাহির করিতে পারি।"

"পার তুমি অনোয়ার?--পার; কিন্তু মনে কর, আমি তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিযাছি। একটীও মন্দকথা বলি নাই। ভুজঙ্গশিশু, যাহার হস্তে প্রাণ যাইতেছিল, তাহাকে বরং শীতল করিয়াছি। তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? শত্রু, শত্রু, শত্রু।—শত্রুকে আমি স্বহস্তে মারিব না। যাহারা মারিতে পারে, তাহারা সম্মুখে আছে। অহঙ্কার থাকে, অহঙ্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াও। যবনের বীরত্ব থাকে, বীরত্ব দেখাও। সম্মুখসংগ্রামে আমি তোমাদের ক্ষমা করিব না। যাহাকে ক্ষমা করিতে বলিতেছি, তাহাকেও নিষেধ করিব না। নিষেধ করিতেছিলাম কেন জান? তোমরা সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত হও নাই। সম্মুখযুদ্ধে ক্ষত্রিনকুমার ভয় করে না। কুমারের কথা কেন, কুমারীরা,- ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনারাও চক্ষের নিমেষে তোমাদের মুণ্ড নিপাত করিতে পারে। জানিলাম, ভাল কথার তোমরা কেহ নও। প্রাণ যাইতেছিল, রক্ষা করিলাম, তাহারই বদলে এই, তাহারই বুঝি এই ফল?"

"চুপ্ থাক্ শূওরের বাচ্চা! আমাদের দয়ায়, আমাদের আশ্রয়ে, আমাদের অর্থে উদর পোষণ করিয়া এত গর্ব্ব বাড়িতেছে তোর? লাথী মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে পারি, কীলে কীলে দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। আনোয়ার আমি, মনে করিলে আরো আরো কিছু করিতে পারি, তাহা কি জানিস্ না? জানিবার অনেক আছে। যে প্রকারে জানাইতে পারি, তাহারও সরঞ্জাম অনেক আছে। দুরন্ত বদ্‌মাস! জিব চাপিয়া রাখিতে পার না? আমাদের নিকটে জোর জোর কথা? আলয় কাহার? দিল্লীশ্বর এখনও মরিয়া যান নাই, দিল্লীশ্বরের বাতুলালয়।"

"এই কথাই ঠিক্ কথা। দিল্লীশ্বরের বাতুলালয়ই বটে! কিন্তু আনোয়ার।" হাস্য করিয়া ভুপেশচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু আনোয়ার! দিল্লীশ্বর কাহাকে বল? হুমায়ূন?—না,—তাঁহাকে আমি দিল্লীশ্বর বলি না।—আক্‌বর? ছিলেন তিনি দিল্লীশ্বর, তাঁহার নামে সহস্র সেলাম করিতে পারি, কিন্তু এখন দিল্লীশ্বর কে? রাত্রি অন্ধকার হইযাছে, দিবাকর অস্তগত হইয়াছেন, হইয়াই ত থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ নাই। আনোয়ার! কাহার

অহঙ্কারে অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ ? আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তগত। আর্য্যরাজত্ব বোধ হয় যেন জন্মের মত বিলুপ্ত। কিন্তু তাহা বলিয়া কুকুর কখনও শিবের মাথায় উঠিতে পারিবে না। যত দম্ভ প্রকাশ করিবে,—দিন ছিল, দিন গিয়াছে,—এখন যতই দম্ভ প্রকাশ করিবে, ততই আমার ক্ষমা হারাইবে। হরবিলাস। এই দুর্বিনীত পাপিষ্ঠকে বন্ধন কর। প্রাণে মারিও না, অস্ত্র রাখ, আমার বাক্য পালন কর, দেখি, মুসলমানরাজত্বের শেষে ছোট ছোট মুসলমানের কতদূর প্রভুত্ব, কতদূর আধিপত্য।"

ক্ষুদ্র দয়াল গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। আবার ভূপেশচন্দ্র তাঁহাকে থামাইলেন। অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "মানুষ মারিও না। যাহারা যাহা করিতে জানে, তাহা করুক। উপরে একজন আছেন—"

"আমি উপরে আছি।"—তরবারি ঘুরাইয়া ক্ষুদ্র দয়াল কহিলেন, "আমি উপরে আছি। তুমি দেবী চুপ করিয়া থাক। এত অবজ্ঞা ক্ষত্রিয়-প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। ভাঁটা কি পড়িয়া গিয়াছে ? চন্দ্রসূর্য্যবংশের রাজকুমারগণের সৌভাগ্যনদীতে জোয়ার কি আর আসিবে না ? বৎসর,—বৎসর,—ছয় শত বৎসর গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত ছয় শত বর্ষ যবনের অধীন হইয়াছে। কিন্তু এখনও ক্ষত্রিয়বীর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।"

"কাট্, কাট্, যবন কাট্! নিকটে যাহারা আসে, তাহাদেরও কাট্!" ভীমকণ্ঠে এই কথা বলিয়া কুমার হরবিলাস যেন লাফাইতে লাগিলেন। অপ্সরাসুন্দরী বীরাঙ্গনাবেশে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় পাইলেন। উগ্রমূর্ত্তি, মুক্তকেশ। দুই চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বীরাঙ্গনা কহিলেন, "কে কে আছিস্, থাক্ তোরা। উদয় সিংহের কন্যা আমি। এই বংশের কত সতী মুসলমানের দৌরাত্ম্যে আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন, তাহা কি তোরা শুনিয়াছিস্ ? এক প্রদীপ জ্বলিতেছে, এ প্রদীপ শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবে না। ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস্, দেখ্! ক্ষত্রিয়কুমারেরা ভয় করিতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়-কুমারী ভয় করে না মুণ্ড গড়াগড়ি যাইবে। যবন! যবন নাম শুনিলেও ঘৃণা হয়। কিন্তু কাহার কাছে বীরত্ব ? কুমার ভূপেশচন্দ্র, কুমার হরবিলাস, কুমার বিশ্বেশ্বর, বড় শান্ত ইহাঁরা। কিন্তু যবন! জানিস্, শূন্যহস্তে কে এখানে

দাঁড়াইয়া? সকলকে আমি ক্ষমা করিতে পারি, করিয়াছিও অনেক দিন, কিন্তু দিন কি ফুরায় না? শেষ দিন আসিয়াছে। আজ আমি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি। আকাশ যেন ফাটিয়া গিয়াছে, রাজকুমারেরা সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কুমারী সরিয়া যাইবে না। আয়! আয়! আয়! কে তোরা আসিয়াছিস্, আয়!”

অনেক পাগল একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ হাসিল, কেহ কেহ কাঁদিল, কেহ কেহ মহাবিকারের রোগীর ন্যায় যমালয়ে যাইবার জন্য যেন, এলোমেলো বকিতে লাগিল। কেহ কেহ চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপ্‌ড়াইয়া মহরমের মুসলমানের মত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সকলের কর্ণ সেই দিকে,—সকলের চক্ষু সেই দিকে। আলয় নিস্তব্ধ নহে, কিন্তু যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহাদের চক্ষুকর্ণ নিস্তব্ধ। রাজা রঘুবর রাও এতক্ষণ যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলেন, গোলেমালে দুটী একটী কথা কহিয়াছিলেন কি না, শুনিতে পাওয়া যায় নাই, বুঝিতে পারা যায় নাই। এখন কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, “এ মায়া কে দেখাইতেছে? স্বর্ণভূষণ বাঁচিয়া আসিয়াছে, ইহা ত সত্য হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহা মায়া! আমি দেখিয়াছি, আমার চক্ষু দেখিয়াছে, আরও আরও অনেক লোক দেখিয়াছে, স্বর্ণভূষণের কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা। সে কাটা জোড়া দিয়া বাঁচাইতে পারে, শুদ্ধ এক মায়া ছাড়া তেমন আর কেহ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।”

যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সে সময় বাক্যশূন্য। ভূপেশচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিলেন। মহারাজ মহানন্দ রাও ভ্রূভঙ্গীতে সেই দিকে চাহিলেন। কথা কহিয়া কেহই তাঁহার কথা খণ্ডন করিবার চেষ্টা পাইলেন না। রাগরঞ্জিতবদনা অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “যবনের সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম, পাপের প্রতিফল পৃথিবীতে আছে কি না, শুনাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দিতেছিলাম, তুমি আবার এমন সময় উন্মত্ত হইয়া উঠিলে কেন? এ গারদে যে আসে, সেই উন্মত্ত হয়, এ কথা যিনি বলেন, তিনি সব তত্ত্ব জানেন না। যাহাদের মনে পাপ আছে, সংসারে যাহারা দুই পথের মধ্যে পাপপথ ভিন্ন ধর্ম্মপথ জানে না, তাহারাই বাতুলাশ্রমের আশ্রমী। বিমুক্ত সংসার তাহাদের পক্ষে অবিমুক্ত বাতুলালয়। এ আশ্রমে প্রবেশ না করিলেও

আমার বুদ্ধিতে, আমার চক্ষে তাহারা বাতুল। রাজা রঘুবর! জগতের কোন জীবকে আমি ঘৃণা করি না। কিন্তু তোমাকে আর তোমার মত লোককে মর্ম্মে মর্ম্মে আমি ঘৃণা করি। কথা কহিবার সময় তোমার মুখ দিয়া যেন গরল সৃষ্টি হয়। তুমি মহাপাপী! যে যবনেরা আমার চক্ষের সমীপে, তাহাদের অপেক্ষাও তুমি মহাপাপী। ইহারা করে কি? হাতেমুখে পরের মন্দ করে, কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়কুলের কুলাঙ্গার, মনে মনে আত্মীয় লোকের মন্দ কামনা কর। তলোয়ার আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু কখন জান? আমার পূজনীয় পিতার তুল্য রাজা বিরাটকেতুকে অজ্ঞান অবস্থায় কোলে করিবার জন্য এই রাজপুত্র (ভূপেশচন্দ্রের দিকে চক্ষু আর অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বীরাঙ্গনা কহিলেন,)—যখন অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, ঠিক সেই সময়েই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। লোককে কহিতেছি, ভঙ্গীতে যেন দেখাইতেছি, অস্ত্র আমার হাতে আছে; কিন্তু নাই রাজা! নিরস্ত্র কামিনী হইয়াও আমি শত্রু নিপাত করিতে পারি। অহঙ্কার মনে করিও না, সত্য কথা! অহঙ্কৃতা নারী আমি নই। কিন্তু জান, সময় যখন যেরূপ উপদেশ দেয়, সেই উপদেশে তখন আমি উচিত অনুচিত বিবেচনা না করিয়া সেই অহঙ্কারকে হীরক অলঙ্কার মনে করিয়া বুকে ঝুলাই। তুমি রাজা! একটু চুপ করিয়া থাক। যাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, তাহাদের সঙ্গে কথা কহি। তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পুত্রও ক্ষত্রিয়কুমার। কিন্তু ক্ষত্রবংশের কুলমর্য্যাদা,—একদিন হয় ত তুমি জানিতে, এখন ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার পুত্র বাঁচিয়া আসিয়াছে, তুমি ইহা মায়া মনে করিতে পার, কিন্তু মায়া নয়। পাপের ফল যমের নরকে ভোগ হয় না। পৃথিবীতেই নরক আছে! যম সেখানকার রাজা নহেন। নাম,—নাম, অনেক নাম থাকিতে পারে, সেই সকল অনেক নামের একনাম ধর্ম্মরাজ! তিনি পৃথিবীতেই নরক রাখিয়াছেন। তোমার পুত্র যদি বাঁচিয়া না আসিত, পৃথিবীর জীবিত লোকে তাহার নরক-যন্ত্রণা দেখিতে পাইত না। চতুর্ভুর্জ! তুমি যে কেন হও না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। স্বর্গভূষণকে বাচাইয়া জগৎকে তুমি একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ;—চমৎকার শিক্ষা দিয়াছ। মরিলেই ত সব ফুরাইয়া যায়। কোথায় পরলোক, কোথায় নরক, কেহই ত তাহা জানে না। এমন শিক্ষার

গুরু অতি কম। তুমি চতুর্ভুজ! এই রাজা রঘুবরকে চুপ করিতে বল। ইহাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু এখন নয়। যাহারা কর্ত্তা হইয়া, কর্ত্তা সাজিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গেই কথা।"

রঘুবর লজ্জা রাখিতে পারিলেন না। লজ্জার সঙ্গে অপমান মিশিয়া গেল। দুটী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অপ্সরাকে তিনি কহিলেন, "সহ্য করিতে পারিলাম না। নারীজাতির এতদূর দর্প? আমি যদি স্বর্গভূষণের পিতা না হইতাম,—"

"কেন রাজা?" ক্রোধের সঙ্গে হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "কেন রাজা? আবার ঘৃণা আমাকে বড় যন্ত্রণা দিতেছে। তুমি যদি;—তোমার মত আর কোন রাজা যদি স্বর্গভূষণের পিতা না হইত, তাহা হইলে এমন বর্ব্বরের পিতা হইত কে? তোমার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? বারম্বার বলিতেছি, চুপ কর। মহাশত্রু হইলেও তুমি এখন শত্রুতা করিতে পার না। কিন্তু যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বেশ লোক। তাহারা রাজক্ষমতা দেখায়। তাহারা চেষ্টা করিতে পারে। আগে তাহাদের নিপাত সাধন,—না,—সে কথা নয়, আগে তাহাদের মুখ বন্ধ করি, হাত বন্ধ করি, দর্প বন্ধ করি, তাহার পর তোমার সঙ্গে অন্য কথা।"

আনোয়ার বথত গর্জ্জিয়া উঠিল। যবনজাতিসুলভ কর্কশ গর্জ্জনস্বরে কহিতে লাগিল," স্ত্রীজাতির এত অহঙ্কার ত সহ্য করা যায় না। ইচ্ছা হয় কাটিয়া ফেলি, শত শত খণ্ডে ঐ দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া শূকরের পদতলে বিদ-লন করি। আমরা বাদ্‌সাহের লোক, আমাদের উপর এতদূর তেজের কথা?"

স্বর্গভূষণ সেই গর্জ্জনে যোগ দিলেন। মিহি আওয়াজে চীৎকার করিয়া রাজপুত্র কহিলেন "কাটিয়া ফেল! এতদূর দর্প সহ্য করা যায় না, সত্যই তা। আমার সঙ্গে একদিন একটা মানুষ ছিল, তাহাকে আমি ছোট কথায় আদর করিয়াছিলাম, শেষে দেখা গেল, সেই লোকের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী তাহাকে একদিন কালামুখ বলিয়া গালাগালি দিয়াছিল, তাহার স্বামী, বুঝিতে পারিয়াছ?—সেই স্ত্রীলোকটার স্বামী এক মুষ্টিপ্রহারে তাহার গলা কাটিয়াছিল। তেমনি করিয়া তোমরা ইহাকে কাটিয়া ফেল। বুঝিতে পারিয়াছ?"

"আমি বুঝিতে পারিয়াছি।" যেন রণকালীবেশে নৃত্য করিয়া অপ্সরা-সুন্দরী কহিলেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি। দেশের এখন এমনি দুর্দ্দশাই বটে! বাঘের দাঁত নাই। সিংহের নখর নাই, মহিষের শৃঙ্গ নাই, ক্ষত্রিয়-কুমারের বীর্য্য নাই! এক দিন,—সে অনেক দিন,—দ্বাপর যুগের শেষে রাজা দুর্য্যোধনের দুষ্ট ভ্রাতা দুরাচার দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল। পঞ্চপাণ্ডব তাহা বসিয়া দেখিয়াছিলেন। একদিন পঞ্চপাণ্ডব ভস্ম মাখিয়া বনচারী হইয়াছিলেন। কাঙ্গালিনীবেশে দ্রৌপদী তাঁহাদের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। পঞ্চপাণ্ডব মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। এক দিন,—তাহাও অনেক দিন,—অজ্ঞাত বাস-সময়ে বিরাট রাজার গৃহে মদগর্ব্বিত কীচক পাঞ্চালীকে লাথী মারিয়াছিল। ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডব তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেন, সময় আসিবে বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কথা কহেন নাই। সে দিন ত অনেক দিন গিয়াছে। এখন কলিযুগ, এ যুগে সাপের যেন আর বিষ নাই। ক্ষত্রিয়ের যেন আর কোন ক্ষমতাই নাই। ক্ষত্রিয়কুমারেরা স্বচ্ছন্দে বসিয়া শুনিতেছেন, এই কুকুরেরা অপ্সরাসুন্দরীকে কাটিয়া ফেলিবে। হা ধিক্! ধিক আমাকে! আমি উদয়পুরের রাজকুমারী; কে আমার গাএ স্পর্শ করিতে পারে?—আমি দিগ্বিজয়ী মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা, আমি অপ্সরাসুন্দরী। জানিস্ তোরা আমার নাম? অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। আমার জন্য,—শুদ্ধ কেবল আমারই জন্য এক জন বীরকুমার, মহারাজকুমার বহুকষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এখনও কি সে দুঃখের রজনী প্রভাত হয় নাই? আমি আর কতক্ষণ,—কতক্ষণ,—কতক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিতে পারি? বলিয়াছি ত ক্ষত্রিয়বীর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুমারীর তেজস্বিতা বিলুপ্ত হয় নাই, বিলুপ্ত হইবেও না। ক্ষণকালের জন্য অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তোরা মনে করিতেছিস্ আমি অস্ত্রশূন্য? ভগবান আমাকে অনেক অস্ত্র দিয়াছেন। নখাঘাতে শত শত শত্রুর মস্তক ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি; পদাঘাতে শত শত শত্রুর দেহচূর্ণ করিতে পারি। অপ্সরাসুন্দরী সমস্তই করিতে পারে, কেবল একমাত্র সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিতে পারে না। স্বর্গভূষণ! যবনের সঙ্গে যোগ দিতেছ? যবনকে আমি তৃণজ্ঞান করি।

অনেক বার অনেক সময়ে আমার উপর তুমি দৌরাত্ম্য করিয়াছিলে। একমাত্র দর্পকে সহায় করিয়া, একমাত্র ধর্ম্মকে বুকে রাখিয়া, একমাত্র সতীত্বকে কণ্ঠভূষণ করিয়া মহা মহা পাপচক্র হইতে, মহা মহা দৌরাত্ম্যজাল হইতে আমি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি; কিন্তু এখন স্বর্গভূষণ! তুমি আমারে ভয় দেখাইতে পার না। এ কি অন্ধকার! একা নারী আমি এত কথা কহিতেছি। একা নারী আমি এত ভয়কে দূর করিয়া দিয়া সাহসকে ডাকিয়া আনিতেছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুমারেরা কাপুরুষের মত নিস্তব্ধ।—ছি! ছি! ছি!—ছি ক্ষত্রিয় নামে! ছি ক্ষত্রিয় গৌরবে। এক অবলাকে তাহারা রক্ষা করিতে পারিলেন না। কাজ নাই, কাহারও সহায়তার আবশ্যক নাই, একাই আমি শত্রুবিজয়িনী হইব। ভূপেশচন্দ্র' চির দিন শান্ত হইয়া থাকিতে জান, শান্ত হইয়া থাক। কুমার হরবিলাস! তলোয়ার ফেলিয়া দাও। কুমার বিশ্বেশ্বর! ক্ষত্রিয় নাম পরিত্যাগ কর। মহারাজ মহানন্দ রাও! লজ্জাকে জলাঞ্জলি দাও। তোমরা উপস্থিত থাকিতে তোমাদের সম্মুখে ক্ষত্রিয়কুমারীর এতদূর অপমান! হা ধিক্। কি বলিয়া সহ্য করিতেছ রাজা? কি বলিয়া সহ্য কবিতেছ রাজকুমার? আচ্ছা। আমি দেখিব। আমি অপ্সরাসুন্দরী বাঁচিয়া রহিয়াছি, আমি দেখিব। শুনিব না,—মুসলমানে বলিবে, হিন্দুরক্ত হিন্দুস্থান হইতে লুপ্ত হইয়াছে, ইহা শুনিব না। রাজা রঘুবর রাও। তুমি কি বলিয়া, কোন্ লজ্জায় রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক? বলিতে গেলে এই প্রশস্ত আলয়ে আমি নারী একাকিনী অসহায়িনী।" দুইবার দুই দিকে চাহিয়া রাজকন্যা পুনরায় কহিলেন, "সহায় থাকিতেও আমি অসহায়িনী। এই সময়ে তুমি আমারে বিদ্রূপ করিতেছ? তোমার কাপুরুষ পুত্র আমারে বিদ্রূপ করিতেছে? মরিল না কেন? ডাকাত উহারে একেবারে মারিয়া ফেলিল না কেন? অসার অকর্ম্মণ্য জীবন লইয়া উহার কি ফল? রাজা! তুমি দেখিতে পারিতেছ, আমি দেখিতে পারিতেছি না। যবনের দৌরাত্ম্য তোমরা চক্ষে দেখিতে পার, তোমাদের চক্ষের লজ্জা, হৃদয়ের লজ্জা, দূরে গিয়াছে! যাউক, থাক তোমরা, দেখ তোমরা, দাঁড়াইয়া দেখ, চক্ষু বুজিও না। যদি বুজিয়া আসে, চক্ষের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, বীরবংশের অহঙ্কার অনন্ত সাগরে

ভাসাও; এক অবলা তোমাদের সাক্ষাতে কতদূর কার্য্য করিতে পারে, দেখ। কথা কহিওঁ না;—কথা কহিলে চন্দ্রসূর্য্যবংশের সেই দুই নামে কলঙ্ক দাগ পড়িবে। আমি কিন্তু সূর্য্যবংশে কলঙ্ক দিব না। চক্ষের উপর দেখিতেছি, যবন। যাহাদের রাজত্বে বাস করিতেছি, তাহারা যবন। এই তিনজন লোক দর্প দেখাইয়া ভয় দেখাইতে আসিয়াছে, ইহারাও যবন। হনুমানসিং যবন না হইতে পারে, কিন্তু যবনের দাসকে আমি যবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট তুচ্ছ জীব,—ঘৃণাকর তুচ্ছ জীব মনে করি। রাজা! আমারে একটু শান্তি দাও। তোমার সঙ্গে আমার বেশী কথা নাই। আমার সঙ্গে তুমি যেরূপ শত্রুতাচরণ করিয়াছ, বিনাদোষে, বিনা কারণে যত যন্ত্রণার দাসী করিয়াছ, সব মনে আছে। ভূপেশচন্দ্র তোমার সহোদরা ভগ্নীর গর্ভজাত কুমার। অগ্রে জানিতে না, এখন জানিয়াছ, সেই ভগ্নী তোমার এই স্থানেই উপস্থিত রহিয়াছেন; কিন্তু আমারে সাহস দিতে তোমরা কেহই পারিতেছ না। যিনি পারেন, যাঁহারা পারেন, তাঁহারা নিশ্চল।—কলের পুতুল বরং নড়ে চড়ে, কিন্তু তাঁহারা মাটীর পুতুলের মত, কাঠের পুতুলের মত, পাথরের পুতুলের মত নিশ্চল। আর কি ক্ষত্রিয়প্রতাপ ভারতবর্ষে আছে রাজা? ছয় শত বৎসর পরাধীন; ছয় শত বৎসর যবনের অধীন। শীতকালের নিস্তেজ সূর্য্য যেমন শীতের সরোবরের, শীতের নদীর সুস্থির জল শুষ্ক করিয়া লন, তোমাদের বংশের সূর্য্য তদ্রূপ তোমাদের গায়ের রক্ত চুষিয়া লইয়াছেন। শূন্য ভাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। সেনাদল ছিল, দলের সেনাপতি ছিল, হাবিলদার ছিল, কিন্তু এখন?—এখন এই সামান্য বাতুলালয়ের প্রহরী।—ইহাদের আস্ফালন তোমাদের রক্তমাংসের শরীরে কিরূপে সহ্য হইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। কেন আসিয়াছিলাম, কেন তোমরা আমারে এখানে আসিতে বলিয়াছিলে? যাহারা এখানে থাকে, তাহারা বেশ লোক। আমি কিন্তু সজ্ঞানে আসিয়া পাগলিনী হইলাম। আরও কি আমার মুখে আরও কথা শুনিতে চাও? ঐ দূরে,—ঐ দূরে গিয়া বসিয়া থাক। আমি একবার ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, কথা কহিব।" রঘুবরকে এই কথা বলিয়া রাজকুমারী অপ্সরাসুন্দরী শূন্যহস্তে হাস্য করিতে করিতে আনোয়ারকে কহিলেন "আয়! আয়! আয়!—আয় তোরা যবন! দেখ্‌বি আয়। ভূপেশচন্দ্র! তুমি

কি বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতেছ? তোমার চক্ষু কি ভাদ্রমাসের মেঘের ন্যায় বৃষ্টিধারাপ্রভাবে আকুল হইয়া পড়িতেছে? বজ্রাঘাতে সামান্য লোকের কর্ণ যেমন বধির হয়, বিনা বজ্রনিঃস্বনে তোমার কর্ণ কি সেইরূপ বধির হইতেছে? যে দিনে চিতোররাজ্যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, সে দিনে আমি মাতৃগর্ভেও প্রবেশ করি নাই। কিন্তু মনে আছে। যবনের হাতে অপমানের ভয়ে পুণ্যবতী সতীলক্ষীরা আগুনে পুড়িয়াছিলেন। আমিও তেমনি করিয়া পুড়িতে পারি, কিন্তু সেখানে তখন রাজপুত্র কেহ উপস্থিত ছিলেন না। যেন অনাথা হইয়া সূর্য্যবংশের সতীরা আলাউদ্দীনের ভয়, আক্‌বর শাহের ভয় সতীত্ব-আগুনে পুড়াইয়াছিলেন। যদি বলিতে চাই, বলিতে পারি, এখন ত আমি রাজপুত্রের মাঝ্‌খানে। এখন যদি আমি আগুনে পুড়ি, আমার নিন্দা নাই, নিরস্ত্র নারী আমি, কিন্তু এই সকল রাজপুত্রের মুখে,—দেখিতে হইবে না,---দেখিতে আসিব না, কিন্তু এই সকল রাজপুত্রের মুখে কালী ঢালা হইবে। ভূপেশচন্দ্র! তোমারে আমি লজ্জা দিতেছি না. তুমি পার, বীরদর্প তোমারে সাজে; যাঁহারা তোমার অনুবল, তাঁহাদেরও সাজে; কিন্তু ক্ষত্রকুলকলঙ্ক যে কয়জন বীরপুরুষ এখানে আসিয়া মুসলমানের দলে যোগ দিতেছেন, এই অপ্সরাসুন্দরীকে যাঁহারা কাটিতে চাহিতেছেন, পরকালে তাঁহারা যে কি কথা বলিয়া এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহা শিখাইতে হইবে। সেই কথা শিখাইবার জন্যই আমি এতক্ষণ মুসলমানের সঙ্গে, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছিলাম।”

যে বংশে যাহার উৎপত্তি, সে বংশের মহিমা কিম্বা লঘিমা তাহার মনে থাকেই থাকে। ভদ্রকুলের কুলাঙ্গনা যদি কখনও ক্ষুদ্র কুলে গিয়া পড়ে, বংশমর্য্যাদা লুকায় না। অপ্সরাসুন্দরী মুসলমানকে উপলক্ষ করিয়া, রাজা রঘুবর রাওকে,—সেই দলের ক্ষাত্রয়কুলাধমগণকে লক্ষ্য করিয়া যে কথাগুলি কহিলেন, বর্ণে বর্ণে তাহার নূতন নূতন অর্থ আছে, অর্থগুলি ঠিক্ যেন উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা। রঘুবর না বুঝিয়া থাকুন, আমরা বুঝিয়াছি। যেমন দিনকাল পড়িয়াছে, তাহার উপযুক্ত কথাই অপ্সরাসুন্দরীর মুখে।—পাঠক মহাশয় যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া না থাকেন, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য আবশ্যক।

বীরাঙ্গনার বাক্যে আমরা দুটী একটী টীকা করিব। ছোট কথায় অপ্সরা যেন কহিলেন ঃ—

গিয়াছে দিনের প্রভা এ দিনের মত।
অস্তাচলে দিনকর এবে অস্তগত॥
অন্ধকার হইয়াছে অনন্ত আকাশ।
নাহি নাহি নাহিস্বরে বহিছে বাতাস॥
উড়িছে খদ্যোতপুঞ্জ উঠিয়াছে তারা।
মিটি মিটি মিটি করি হাসিতেছে তারা॥
তারা ত তবুও ভাল, বিকাশিছে জ্যোতি।
ভারতের ক্ষত্রকুল জ্যোতিহীন অতি॥
কিছুই পদার্থ নাই, নাম মাত্র সার!
থাকে যদি, আছে কিন্তু শূন্য অহঙ্কার!!
সেই অহঙ্কার আজি নিহারি সম্মুখে।
ঘৃণা লজ্জা রসায়ন অবলার মুখে॥
জ্বলে না ক্ষত্রিয়তেজ এত আত্মাহীন।
কিবা ছিল, কিবা হলো, ফুরাইল দিন॥
দিনে দিনে ক্ষীণ জ্যোতি নব বিভাকর।
বিভাশূন্য, প্রভাশূন্য, পূর্ণশশধর॥
এ বড় মরম ব্যথা জানাইব কারে।
ক্ষত্রবীর্য্য বীর্য্যহীন ক্ষত্রিয় সংসারে॥
দীপি দীপি দীপি করি জ্বলিতেছে বাতী।
দিন গেছে, চুপি চুপি আসিয়াছে রাতি॥
যাঁর হাতে খাঁড়া ছিল, পড়েছে খসিয়া।
কাঁদিছে ক্ষত্রিয়সুত বিরলে বসিয়া॥

গগনেতে জ্বলিয়াছে যবনের দীপ।
তারারূপে ঝকিতেছে আকাশপ্রদীপ॥
একাকিনী আমি নারী দাঁড়াইয়া আছি।
হেরিতেছি যবনেরে মশা আর মাছী॥
টিপিয়া মারিতে পারি চক্ষের নিমেষে।
আসি নাই, আসিয়াছি যবনের দেশে॥
দুষ্টবুদ্ধি কুলাঙ্গার যবনের দল।
মায়াজাল পাতিয়াছে, করিতেছে ছল॥
সে ছলে ক্ষত্রিয় ভোলে, আমি কিন্তু নারী,—
যবনের ছলনায় ভুলিবারে নারি॥
তুমি রাজা রঘুবর! বিরাট প্রতাপ।
অক্ষরে অক্ষরে কত সঞ্চিয়াছ পাপ॥
লেখা আছে তব শিরে উজ্জ্বল অক্ষরে।
মহা পাপ, মহা পাপ! গাঁথা থরে থরে॥
দেখিছ তোমার পুত্র মহা বীরেশ্বর।
নহে তাহা তব পুত্র, রাজা রঘুবর!
ধূর্ত্ত শৃগালের সম চরিতেছে ভবে।
ভয় দেখাইছে শুধু হুয়া হুয়া রবে॥
যবনের ক্রীতদাস তনয় তোমার।
বৃথা রাজা! দেখাইছ বৃথা অহঙ্কার॥
একা নারী আমি পারি ধ্বংস করিবারে,
মায়ার ছায়ায় এই অনন্ত সংসারে॥
যবনে দোহাই দাও, দিতে পার দাও।
কিন্তু রাজা! কার কাছে প্রভুত্ব দেখাও?

আমি নারী মাটীঢিল তোমাদের কাছে।
তবু রাজা এই বুকে ক্ষত্ররক্ত আছে॥
অসি যদি ধরি আমি ক্ষত্রিয়ের নামে।
আগু হতে কেহ নারে সম্মুখ সংগ্রামে॥
দেখ শ্রী ভূপেশচন্দ্র! অপ্সরাসুন্দরী।
অসি হাতে দাঁড়াইবে বীর দর্প করি॥
দেখাইবে বীরপনা সম্মুখ সমরে।
দেখিবে অরাতিকুল মারে কিম্বা মরে॥
তোমরা দাঁড়ায়ে দেখ আমি একাকিনী।
বীরাঙ্গনারূপে সাজি হারি কিম্বা জিনি॥
অহঙ্কার! অহঙ্কার! ভীম অহঙ্কার!
সার্থক আমার পক্ষে ভীম অলঙ্কার॥
গরজনে কাঁপাইব অনন্ত অবনী।
কাঁপিবে আমার দাপে দিবস রজনী॥
জানাইয়া যাব সবে ক্ষণেকের তরে।
অনাথিনী বীরাঙ্গনা কত দর্প ধরে॥
তোমরা ত মজিয়াছ, ডুবিয়াছ কূপে।
জীয়ায়িব আমি সবে সঞ্জীবনীরূপে॥
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে বাঁচাইয়া দিব।
কে পারে আসিতে কাছে দেখিব দেখিব॥
ক্ষত্রবংশ ভারতের হীরা অলঙ্কার।
তাহা কি হইবে কভু জ্বলন্ত অঙ্গার?
হইবে না, হইবে না, দেখিতে দিব না।
অপমান কভু আমি প্রাণে সহিব না॥

ক্ষুদ্র যবনের কাছে আছি দাঁড়াইয়া।
হারি যদি রক্ত দিব বক্ষ বিদারিয়া ॥
অনন্ত প্রলয় আছে অনন্ত জগতে।
জানি তা ত লেখা আছে সর্ব্ব শাস্ত্রমতে ॥
সে প্রলয়ে আজি আমি করিব প্রলয়।
যবন কুক্কুর দলে দিব যমালয়।”

তীব্রগর্জ্জনে অপ্সরাসুন্দরী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, “আয় দেখি আনোয়ার বখ্ত! কত ক্ষমতা ধরিস্ তোরা, কত সাহস ধরিস্ তোরা, আয় একবার দেখি!—উদয়সিংহের কন্যার নিকটে কোন যবনের নিস্তার নাই। অনেক দুঃখ, অনেক পরিতাপ মনে আছে। এক দিনে যদি শোধ লইতে না পারি, দশ দিনে লইব। জীবন যদি অনন্ত হইত, অনন্ত দিনেও আমার প্রতিহিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইত না। প্রাণে মারিতাম না, প্রাণ গেল ত সকলই ত গেল, আমার প্রতিহিংসা মানুষ মারিবার জন্য হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। লোকের প্রতিহিংসা অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়ায়, আগুন জ্বালিয়া দাঁড়ায়, আমার প্রতিহিংসা শান্ত হইয়া থাকে। এক একবার ধিকি ধিকি জ্বলে, বিপক্ষকে এক একবার জ্ঞান দিয়া দেয়, এক একবার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করে। অহঙ্কার টানিয়া আনে; থাকিয়া থাকিয়া দগ্ধ করে। করিবেও তাহাই। স্বর্গভূষণ! তুমি কি দেখিতে আসিয়াছ? মুসলমানেরা অপ্সরা-সুন্দরীর প্রতি উৎপাত করিবে, ভূপেশচন্দ্রের প্রতি আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিবে; ইহাই দেখিতে কি তুমি আবার অভিলাষ কর? না রাজকুমার! তাহা পারিবে না। সে অভিলাষ পরিত্যাগ কর। আমাদের একজন অজানা বন্ধু তোমারে বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু কেন জান? পাপের ফল সকলের অজ্ঞাতে তুমি ভোগ করিবে, ইহা তিনি ভালবাসেন না। তিনি দেখিবেন, তাহারা দেখিবে, যাহারা তোমার কুমন্ত্রণার শিকড়, তাহারা দেখিবে, আমি দেখিব, আমরা দেখিব, পৃথিবীর সকল লোকেই দেখিবে; যিনি বাঁচাইয়াছেন, ইহাই তাঁহার সাধ, কিন্তু আমার সাধ এমন ছিল না। জন্মে তুমি অনেক পাপ করিয়াছ। যখন জানিতে না মিহিরমোহিনী কে,

তখনকার এক কথা। যখন জানিয়াছিলে, মিহিরমোহিনী বিরাটকেতুর পত্নী, তখনকার এক কথা। যখন জানিয়াছ, মিহিরমোহিনী তোমার মাতৃ-গর্ভের পুণ্যময়ী দুহিতা, তখন কে বল দেখি স্বর্গভূষণ ?—দূর হউক, আমার হস্তে তলোয়ার নাই।" ও সকল কথায় চক্ষুকে সাক্ষী করিতে হয় না, রসনাকে সাক্ষী করিতে হয় না, তলোয়ারকে সাক্ষী করিতে হয়। ভূপেশ-চন্দ্র ! আর আমি নিরস্ত্র থাকিব না, তলোয়ার দাও। তুমিও তলোয়ার গ্রহণ কর। ভাবে বুঝিতেছি, এই বাতুলক্ষেত্র আজ যুদ্ধক্ষেত্র হইবে।"

উঠিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "কেন রাজকুমারি ! বাতুল-ক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইবে কিজন্য ?"

"হইবে না কেন রাজকুমার ? ইহারা বড় গোল করিতেছে। মুসলমানেরা গোল করিতে পারে, কিন্তু আর্য্যবংশে, আর্য্যক্ষেত্রে যাহারা জন্মগ্রহণ করি-য়াছে, তাহারা ছোট হয়, ইহা দেখা যায় না। রাজা রঘুবরের সেই বংশে জন্ম। এই দুষ্ট স্বর্গভূষণের সেই বংশে জন্ম। পরিচয় জানি না, পিতা বলিয়াছিলাম, কিন্তু এই রাজা বিরাটকেতুরও সেই বংশে জন্ম। জন্মে কলঙ্ক দেওয়া বড় পাপ। মেয়ে হইয়া আমি যতদূর বংশের গৌরব রাখিতে পারিতেছি, রাজারা, রাজপুত্রেরা ততদূর রাখিতে পারিতেছেন না, এই বড় দুঃখ। একখানি তলোয়ার ক্ষত্রবীর্য্য দেখাইতে পারে, কিন্তু রাজস্থানের এতগুলি রাজার ছেলে মুসলমানের ভয়ে জুজু সাজিয়া রহিয়াছে। থাকে থাক্, থাকিতে দিব। আনোয়ার বখ্‌ত বিনাযুদ্ধে আমারে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তোমার যখন প্রভুত্ব ছিল, তখনও আমি তোমারে ভয় করি নাই। জান তুমি তাহা। ঐ তোমার পোষা কুকুর নিঙ্গেশ্বর অনেক দিন হিন্দুনামে পরিচয় দিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছিল। মানুষ ধরিয়াছিল, দেবী যশেশ্বরী পুনঃপুন উহাকে দেখিয়াছিলেন। আমিও দেখিয়াছিলাম। এখন নাম হইল লেকাবৎ খাঁ। আর ঐ যে ছোট ছোট চক্ষু ফুটাইয়া ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতেছে, ঐ হনুমান, -উঃ। পৃথিবী কি নিমকহারাম ! শ্লাঘা করিতে নাই, পরের উপকার করিয়া সে উপকারের কথা আপন মুখে বলিতে নাই, মরিয়া যাইতেছিল, আমরা বাঁচাইয়াছি। কিন্তু এখন কি না, ও আবার কি ?"—

দরজা বন্ধ ছিল, কাহারা দরজা ভাঙ্গিয়াছিল, আবার বন্ধ হইয়াছে। একজন লোক দরজায় উপস্থিত হইয়া রাজা বলিয়া ডাকিতেছে। বাতুলাশ্রমে রাজা বলিয়া ডাকিলে উত্তর দেয়, এমন লোক কে?—রাজা বিরাটকেতু উত্তর দিলেন না, আরও দুটী রাজা ছিলেন, তাঁহারাও উত্তর দিলেন না, রাজার ছেলে অনেকগুলি ছিলেন, তাঁহারাও উত্তর দিলেন না, অপ্সরা উত্তর দিলেন না। মুসলমানের আলয়, মুসলমান উত্তর দিল। ছুটিয়া গিয়া আনোয়ার একটা দরজা খুলিয়া দিল। কখনও যেন দেখা হইয়াছিল, আবার অনেক দিনের পর যেন দেখা হইল, এমনি একটা লোক প্রবেশ করিল।—নূতন লোক। পুরাতন হইলেও চক্ষের নিকটে নূতন লোক। সকলে তাহার মুখপানে চাহিলেন, অপ্সরা চাহিয়া দেখিলেন, ভূপেশচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, মস্তক অবনত হইল। মাথা নীচু করিয়া অপ্সরাসুন্দরী আর একবার কহিলেন, "ভূপেশ! কতক্ষণ নিরস্ত্র থাকিব? কতক্ষণ নিরস্ত্র থাকিবে? এ পাপাত্মাকে ক্ষমা করিতে হইবে না। চিনিয়াছ? ইহার নাম,—এই দুরাত্মা অনেক লোকের ত্রাণকর্তা বলিয়া পরিচয় দেয়। ঠিক্ যেন বাঙ্গালা দেশের পেট উঁচু মোটা গোঁসাই। এ লোক এখানে কি করিতে আসিয়াছে?—রাণী মহালক্ষ্মি! মিহিরমোহিনি! কীর্ত্তিদেবি! রাণী জগৎকুমারি! চিনিয়া লও। হাতে যদি শাস্তি থাকে,—তাহাই বা কেন থাকিবে? তোমাদের বংশই এই রকমে—"

মিহিরমোহিনী কহিলেন, "এত অহঙ্কার ধরিস তুই অপ্সরা?"

"ধরি ত! তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? ক্ষত্রিয়কন্যার তলোয়ার লক্ষ লক্ষ মুণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে পারে, তাহা তুমি জান?"

"জানি লো জানি!" পুরুষ ঘুচিয়া যেন নারী হইয়া আর একজন কহিল, "জানি লো জানি!"

হরবিলাসের তরবারি অরিবিনাশিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শূন্যে শূন্যে ঘুরিতেছে। অপ্সরা কহিলেন, "ক্ষত্রিয়রাজকুমার যদি পিতৃবংশের বীর্য্য দেখাইতে না পারেন, আমি পারিব। স্ত্রীলোক হইয়া আমি বীরপুরুষের মুখ রাখিতে পারিব। মুসলমান আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন? আনোয়ার! যখন হাকিম ছিলে, তখন ছিলে, যখন সেনাপতি ছিলে তখন ছিলে।
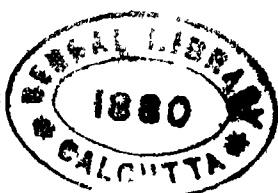
তখন ভূপেশচন্দ্র তোমার কাছে নালিশ করিয়াছিলেন, কেমন বিচার করিয়াছ, কেমন পলিতা পাকাইয়াছ, কেমন চুরট ধরাইয়াছ, তাহা তোমার মনে আছে? পলিতা পাকাইয়া,—পাপিষ্ঠ! দুরাচার! পামর!—পলিতা পাকাইয়া পত্র পুড়াইয়া দিয়াছ, তাহা তোমার মনে পড়ে? আমি কিছুই ভুলি নাই।”

কথা কহিতে কহিতে রাজকুমারী যেন অস্থিরা হইলেন। দুই তিন দি‍ক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “কেন আসিয়াছি? পাগলেরা যেখানে চীৎকার করে, সেখানে ত লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। বিচার যাহাকে বলে, সেখানে ত তাহা আসিতে পারে না। এই দুষ্ট যবন, এই দুষ্ট আনোয়ার আমাদের দুঃসময়ে এক দিন বিচারকর্ত্তা ছিল। বিচার করিয়া ভূপেশচন্দ্রকে যাহার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু—কিন্তু—নিরস্ত্র হইয়াও আজ বিচার আমার হাতে। মানুষের বুকে পা দিয়া আমি মারিয়া ফেলিতে পারি, বংশের অভ্যাসে খাঁড়া দিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারি। দাঁড়া!—আনোয়ার। দাঁড়া! দাঁড়াইয়া শোন্! অপ্‌সরা কাহাকেও মারিবে না। শীল চাপাইব, বুকে জাঁতা পিষিব, পায়ে পায়ে দলন্ করিব, কিন্তু প্রাণে মারিব না। পাপাত্মার শাস্তি এক কথায় হয় না। যাহারা গুপ্ত নরক বলিয়া ভয় দেখায়, পূজা করিতে হইলেও মূর্খ বলিয়া তাহাদিগকে আমি ছি ছি দিই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কোথায় আছে, পাপীলোকের তাহা অজ্ঞাত। একজন জ্ঞানী পুরুষ বিন্ধ্যাচলে একজন বিদেশী পথিককে কহিয়াছিলেন, আর অগ্রসর হইও না, থাম তোমরা।—অনেক কথা মনে আসিতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে থামাইতে না পারিলে কাহাকে সে সকল কথা শুনাইব? বিন্ধ্যাচলে অনেক ঠাকুরের বাস, এখানে যেমন অনেক পাগল জড় হইয়া রহিয়াছে, সেখানেও এইরূপ অনেক দেবদেবী জড় হইয়াছেন। আমি অনেক দেশ দেখিয়াছি। অনেক লোকের সঙ্গে আমার চক্ষের পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু তোমরা,—তোমাদের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ, কতক কতক তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। চক্ষু আমার অপক্ষপাতে সকলকে চিনিতে পারিতেছে না, কিন্তু মনের একটী চক্ষু আছে, জ্ঞানের একটী ধর্ম্ম আছে। সেই চক্ষে, সেই ধর্ম্মে আমি জানিতেছি, অনেক লোকের মন ভাল নয়।

ক্ষত্রিয়কুমারেরা কেন যে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই। আমি যদি বঙ্গবাসীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিতাম, বঙ্গবাসীর গৃহে সিন্দূর পরিয়া, ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে এইখানকার দুষ্টলোকেই সত্য আমারে কাটিয়া ফেলিত। যাঁহাদের প্রতি রক্ষা করিবার ভার, তাঁহারা আমারে রক্ষা করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মবল বড় বল। সেই বল, আমার যেন রক্ষাকবচ। আমি ক্ষত্রস্থানের ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই নিমিত্ত, যবন আমারে পরাস্ত করিতে পারিতেছে না। ভূপেশচন্দ্র! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কতক্ষণ আর তুমি এই অরক্ষিতা অঙ্গনার অবমাননা দর্শন করিবে? সময় কি এখনও পূর্ণ হয় নাই? দুঃখের রজনী, বিপদের রজনী কি আর প্রভাত হইবে না? অনেক দিনের বাসনা, বিপক্ষসমরে এলোচুল করিয়া, খাঁড়া হাতে করিয়া দাঁড়াইব। তুমি ভূপেশ! সে মূর্ত্তিও আমার এক সময়ে দেখিয়াছ। সেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে তোমারে আমি দেখাইয়াছি। তোমারে দেখাইব বলিয়া সাজি নাই। বৈরীকুলকে দলন করিবার নিমিত্ত। চামুণ্ডাদেবী আমার প্রতি যেন সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন; সে মূর্ত্তিতে আমি ঠকি নাই। কয়েকটা মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়াছি। শেষে অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। তুমি রাজকুমার বীরেন্দ্রকুমার! তোমারে পশ্চাতে রাখিয়া বীরাঙ্গনাবেশে আমি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলাম। আমার জীবনের জন্য নহে, বলিতে লজ্জাও আইসে হাসিও আইসে। ক্ষত্রিয় রাজকুমারকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই অবলারে সেখানে অস্ত্রধারিণী হইতে হইয়াছিল। ইহারা চুপ্ করিয়া আছে, চুপ্ করিয়া থাকুক্। আরও একটা হাসির কথা আছে রাজকুমার! কেহই জানে না, তুমিও না। দেবী জানিতেন, দেবী জানেন, আর আমি জানি। মন্দিরে যোগী সাজিয়া বসিয়া ছিলাম। দর্পণে ছায়া দেখিয়াছি, আপনারও মুখ দেখিয়াছি; তখন যদি ভূপেশ,—তোমার নাম ধরিয়া ডাকিতে আমার গায়ে কাঁটা দেয়, অভ্যাস করিয়াছি, সেই জন্যই ডাকি। গুরুলোক সম্মুখে রহিয়াছেন, তথাচ লজ্জা আমারে বাধা দিতে পারিতেছে না। তখন যদি ভূপেশচন্দ্র!—অন্য লোকে আমারে দেখিত, কদাচ চিনিতে পারিত না।—আমি তোমারে চিনি, যে বেশে থাকিয়াছ,

সেই বেশেই চিনিয়াছি। কিন্তু আমি যখন যোগী সাজিয়াছিলাম, তখন তুমি আমারে চিনিতে পার নাই। কত দিনের কত সূর্য্য, কত রাত্রের কত চন্দ্রনক্ষত্র, কত মেঘের কত বৃষ্টি, কত শীতের কত হিম-শিশির, কত গ্রীষ্মের কত উত্তাপ, কত শরতের কত পদ্ম, কত বসন্তের কত কোকিলের পঞ্চমস্বর আমাদের চক্ষের নিকট দিয়া শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, মাথার উপর দিয়া, গায়ের উপর দিয়া, কতবার চলিয়া গিয়াছে, এক দুই তিন করিয়া গণনা করা যায় না। কিন্তু ভূপেশ! আমি যোগী সাজিয়াছিলাম, কেহ কেহ হয় ত দেখিয়াছে, কেহ কেহ হয় ত আমার কথা শুনিয়াছে, চিনিবার অবকাশ পায় নাই। আর সে কথা এখন বলিব না। তুমি স্থির হইয়া থাক, স্থির হইয়া কাজ কর, ক্ষত্রিয়বীর্য্য দেখাইতে না চাও, অনুমতি কর, দাসীর হস্তে অসি দাও, আজ আমি আবার উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করি। আনোয়ার বখ্‌ত! স্বর্গভূষণ! তোমরা আমারে কাটিতে চাহিতে-ছিলে!—না? এসো, অগ্রসর হও, কাটো। মস্তকের উপর যদি মস্তক থাকে, তাহা হইলে অপ্সরাসুন্দরীকে কাটো। উঃ! কি অহঙ্কার! ঘৃণিত কুকুরের কি দর্প! সত্যই কি রাজা উদয়সিংহের কন্যা অসহায়িনী? দেখিতেছিস্! আবার হাসি আইসে।—তোরাইবা দেখিতে পাইবি কি, ঐ আকাশের মেঘের উপর দিয়া মেঘবরণী মহামায়া খাঁড়া হাতে করিয়া হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার পদছায়া আমি প্রার্থনা করি। যবনকে আমি বাম চরণের অঙ্গুলীর দ্বারা স্পর্শ করি। সাহস থাকে, সাধ্য থাকে, ক্ষমতা থাকে, সম্মুখে আসিয়া বীরত্ব দেখা। পথের ভীরু কুকুরের মত পশ্চাতে লাঙ্গূল গুটাইয়া দন্ত বিকাশ করিলে উদয়সিংহের কুমারী ভয় পাইবে না। যবন আমি জানি। আমার বংশের আদি মাতারা যবনের দর্প জানিতেন। কোথায় আমি, কোথায় তাঁহারা, এতদিন জানা ছিল না। মনে যেন জাল পড়িয়া-ছিল, চক্ষে যেন জাল পড়িয়াছিল। ভূপেশ আর কি তুমি অসি ধরিবে না? আর কি তুমি আমার হস্তে অসি দিবে না? আচ্ছা! থাক তুমি, স্থির হইয়াই থাক। আমার চক্ষের নিকটে যিনি নৃত্য করিতেছেন, অট্ট অট্ট হাস্য, কটিদেশে কত দৈত্যহস্ত, গলদেশে কত দৈত্যমস্তক, দক্ষিণের যুগলহস্তে বরাভয়, বামের নিম্নহস্তে দৈত্যশির, ঊর্দ্ধহস্তে তীক্ষ্ণ খড়্গ। তুমি ভূপেশ, যদি

আমারে খড়্গা দিতে না পার, সেই খড়্গা আমি চাহিয়া লইব। যবনের রক্তে বিল্বপত্র ভিজাইয়া চামুণ্ডাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিব। মা করুণাময়ি! করুণা কর। যবনের রুধির বলিয়া ঘৃণা করিও না। পতিতপাবনী তুমি, তোমার নিকটে অপবিত্র কি আছে দেবি? তোমার চরণের দাসীর যাহারা শত্রু, তাহাদের নিপাতে তোমার অনুমতি চাই। কথা কি শুনিবে না মা? দয়াময়ি! শত্রুবিনাশে কি অনুমতি দিবে না মা? দেখি দেখি, কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পার? আমার চক্ষু দেখিতেছে, চতুর্ভুজ বিস্তার করিয়া তুমি আকাশে উড়িয়া যাইতেছ। নবীন নীরদবরণীসাজে সাজিয়া হাসিতে হাসিতে মায়া-জগৎকে মায়া দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছ। সুনীল অবয়বে মণিমাণিকের দীপ জ্বালিয়া সৌদামিনীর মত হাসি হাসিতেছ। কিন্তু কেন দেবী দূরে দূরে? হৃদয়ে আমার কি স্থান নাই? তোমার দাসীর হৃদয়মন্দিরে কি পদ্মাসন নাই? হা সর্ব্বনাশি! তোর মুখে এত হাসি? দাসীর দুঃখ দেখিয়া কি এত হাসি আসে মা? খাঁড়াখানি খুলিয়া ফেল, আমার হাতে ফেলিয়া দাও; তথাপি কথা নাই? গায়ে রক্ত, পায়ে রক্ত, বুকে রক্ত, মুখে রক্ত, জিবে রক্ত, আরও দেখিতেছি, কপালেও রক্তের ফোঁটা! এত রক্ত মাখিয়া মা বুঝি তুমি ঃ—

রক্তমাখা রক্তমুখী? চামুণ্ডাসুন্দরি!
এসো মা হৃদয়াসনে প্রণিপাত করি॥
অভয়া আমার তুমি অভয়দায়িনী।
নিরাশ্রয়া তনয়ার তুমি সহায়িনী॥
কাতরা কিঙ্করী ডাকে যুড়ি দুই কর।
রক্ষা কর রক্ষাকালী দিন ভয়ঙ্কর॥
নিরস্ত্র ক্ষত্রিয়বালা, গিরীশবালিকে!
অস্ত্র দিয়া ভয়হরা, রক্ষ মা কালিকে!
সম্মুখে বিপক্ষদল রয়েছে দাঁড়ায়ে।
দয়া কর মহামায়া ঠেলিও না পায়ে॥

একা যদি আমি দেবি ! তব কৃপাবলে,
দাঁড়াইতে পারি এই ক্ষুদ্র রণস্থলে,
কার সাধ্য কে আমারে জিনিবারে পারে ?
তব পাদপদ্ম সার, বিপক্ষসংহারে ॥
করুণা, করুণাময়ি ! এই ভিক্ষা চাই ।
বিপদবারিণী পদ হেরিবারে পাই ॥
ও পদ প্রসাদে সতি ! অক্ষয় অব্যয়—
যে পদ, সে পদ মোরে দানিবে অভয় ॥
ধূর্ত্ত যবনের জাতি ছলনা কৌশলে,
খেলিতেছে কত খেলা গরবের বলে ॥
সে গরব মহামায়া ! কত কাল রবে ?
মম খড়্গে পাপীদের দর্প চূর্ণ হবে ॥
দেহ মা অভয় খড়্গ ত্রিপুরাসুন্দরি !
এই দণ্ডে পাপীমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি ॥"

"কর কি অপ্সরাসুন্দরী ?—কর কি ? লজ্জাসম্ভ্রমে তোমাদের জাতির যত আদর, খড়্গো তত নয়। আরও বিশেষতঃ,—মনে করিয়া দেখ, গুরুজন উপস্থিত। আমিও উপস্থিত। আমাকে লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে কেহ অপমান করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। তবে আমি কেন চুপ্ করিয়া থাকিতেছি জান ? গ্রহচক্র মাথার উপর ঘুরিতেছে। কুদিন আমাদের যায় নাই, সুদিন আমাদের আসে নাই। যদি জানিতে পারি, গ্রহদেবতারা অনুকূল হইয়াছেন, তাহা হইলে তোমারে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে কেন ?"

"কেন ? তাহা বুঝি জান না ? ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা তোমাদের মস্তকের গৌরবের রত্নমুকুট কাড়িয়া লইয়াছে। সামান্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও তোমরা ছোট হইয়াছ। এখন যদি আমি অস্ত্র ধারণ না করি, তোমাদের মানরক্ষা কে করিবে রাজকুমার ?"

"ধন্য বীরাঙ্গনা! ধন্য তুমি। তোমার কথায় আমি জ্ঞান পাইলাম। মানুষ কখন কি অবস্থায় থাকে, অবস্থাপন্ন মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। শত্রুকে আমি নিপাত করিতে পারি, কিন্তু মনে এক ভয় আছে। সে ভয় তুমি সতী হয় ত বুঝিতে পার না। গ্রহের বিড়ম্বনা সকল মানুষের মাথার উপর দিয়া যায়। বংশে যাঁহারা ধর্ম্মের আদর জানিতেন, ধর্ম্মপুত্র বলিয়া যাঁহাদের আদর ছিল, তাঁহারাও গ্রহচক্রে অসীম যন্ত্রণার দাস হইয়াছিলেন। অশেষ অসীম যন্ত্রণা রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল। বুদ্ধিমতী তুমি, বিদ্যাবতী তুমি, ধর্ম্মশীলা তুমি, আমাদের পুরাতন শাস্ত্রের সে সকল কথা কি মনে পড়ে না দেবি?"

"পড়ে রাজকুমার! কিন্তু ধৈর্য্য রাখিতে পারি না। ছাগল আসিয়া শিবের মাথায় বিল্বপত্র ভক্ষণ করিবে, ইহা কি চক্ষে দেখা যায়? শিবের মাথার সাপেরা ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছিল, গরুড়পাখী আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। সে পাখী সাপ খায়, তুমিও জান, আমিও জানি, কিন্তু ধরিতে পারিতেছিল না, খাইতে পারিতেছিল না। আকাশে থাকিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, বল প্রধান নহে, স্থান প্রধান। শিবের মাথায় থাকিয়া তোরা গর্জ্জন করিতেছিস্, রক্ষা সম্ভবে, তাহা যদি না হইত, মাটীতে যদি পাইতাম, পথে যদি পাইতাম, তাহা হইলে গর্জ্জন শুনিতাম না। ভূপেশচন্দ্র! এই সকল মুসলমান ইরানী মুসলমানের রাজত্বে বাস করে বলিয়া আর্য্যবংশের অপমান করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুমার! তুমি আমারে বল কি? আমি ক্ষত্রিয়-কুমারী, আমি কি ইহাদের বল টুটাইতে পারি না?"

"পার তুমি সতী, পার; আমি তাহা জানি। তোমার সঙ্গে আমি যোগ দিলে আরও পারি, তাহাও জানি; কিন্তু সময় বুঝিয়া কাজ করিতে হয়। ক্ষমার উপর ধর্ম্ম নাই। ধৈর্য্যের উপর শান্তি নাই। তুমিই ত কত দিন আমারে ঐ কথা বলিয়াছিলে। এখন অপ্সরা! আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতেছ কেন?"

"কেন? কতবার বলিব? এখানে আমরা কেন আসিয়াছি; জান? রাজা বিরাটকেতুকে দেখিবার জন্য। এখানে যদি মশা, মাছী, ছারপোকারা উৎপাত আরম্ভ করে, টিপিয়া কি মারিয়া ফেলিতে হইবে না?"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "হইবে বটে; কিন্তু তুমি কি এত টিপিতে জান দেবী?"

"জানি কি না জানি, এখন তোমারে বুঝাইতে পারি না। অস্ত্র দিলে না, অস্ত্র দিবে না, তোমার কাছে আমার অনেক আব্‌দার। চিতোরের রাজ-কুমারীর হস্তে যদি তলোয়ার না থাকে তাহা হইলেও কি অরিকুল চক্ষের উপর সত্য সত্য জয়ী হইয়া যাইতে পারে? ক্ষুদ্র পিপিলিকা। টিপিয়া টিপিয়া মারিব।"

আবার হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "টিপিয়া মারিতে পার, পদতলে দলন করিতে পার, ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু বল দেখি সতী, ক্ষুদ্র প্রাণীকে মারিয়া ফেলিলে গৌরব কি আছে? উহারা আসিয়াছে, চাকর হইয়া আসিয়াছে। একজনের হুকুম লইয়া প্রভুত্ব দেখাইতে প্রবেশ করিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে কি উহাদিগকে বিদায় করিতে পারিতাম না? ইচ্ছা করিলে কি দণ্ড প্রদান করিতে পারিতাম না? কাহার কাছে তুমি উপস্থিত রহিয়াছ দেবি? গুর্জ্জররাজ্যের অধিপতি মহারাজ মহানন্দ রাও। ইঙ্গিতে মনে করিলে ইনি যে কি করিতে না পারেন, মহামহা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মুসলমান তাহার কিছুই জানে না। আমি তাঁহার মুখ চাহিতেছি। ইঙ্গিতে যদি কিছুমাত্র আদেশ প্রাপ্ত হই, এই ক্ষুদ্র আলয়ে মহা প্রলয় উপস্থিত করিতে পারি। তুমি দেবী বৃথা উতলা হইতেছ। যেখানে মহারাজ উপস্থিত রহিয়াছেন, বীরভ্রাতাসহচর আমি উপস্থিত রহিয়াছি, যেখানে জননীদেবী বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেখানে তোমার আশঙ্কার কারণ কি আছে? অসি ধারণ করিবারই বা কি প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, আমি তাহা দিব না।"

"দিবে না?—দিবে না তুমি রাজকুমার? মহারাজ উদয়সিংহের কন্যাকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিবে? ঈশ্বর ক্ষমা করুন, গুরুদেব ক্ষমা করুন, সে সাধ্য তোমার নাই। পূজা করি তোমাকে, আদর করি তোমাকে, মান্য করি তোমাকে, কিন্তু এখন পারিলাম না। যাহারা যাহারা এখানে অস্ত্রধারী আছে, তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইব, যবন কাটিব।" উভয়ের এই সকল কথোপকথন আর কেহ শুনিতে পাইলেন না, ইহা বলা বাহুল্য।—শেষের

কথাটী ভূপেশচন্দ্রের কর্ণেও প্রবেশ করিল না। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্ভুজ সেখানে নাই। সংশয় আসিল। সংশয়ের সঙ্গে বিস্ময় আসিল। পাগল রাজা নাচিতেছেন, একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাকে থামাই-বার জন্য আকিঞ্চন পাইবার অবসর পাইলেন না। চতুর্ভুজ গেলেন কোথায়? মুসলমানেরা এক ধারে দাঁড়াইয়া আছে। হনুমান সিং দেয়ালে মুখ লুকাইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। চতুর্ভুজ ক্ষণেকের জন্য অদৃশ্য হইয়াছিলেন, প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একজন লোক।—পাকা দাড়ী, মাথায় জটা, গেরুয়াবস্ত্র পরা, ভস্মমাখা, নাসারন্ধ্রে, কর্ণরন্ধ্রে, শাদা শাদা চুল, গাত্রমাংস বিলোল, গণ্ডমাংস লোলিত; চক্ষের পাতা শাদা। সেই পাতা যেন চক্ষুকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মহাদেবের চক্ষু ঢুলু ঢুলু। মানুষ কি তাহার অনুকরণ করিতে পারে?—করিয়াছে। এই লোকের চক্ষু ঢুলু ঢুলু। বুকে অনেক চুল। সেই চুলও শাদা। শাদা চুলের উপর ছাই মাখা। এই লোক কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আর একবার দেখা দিয়াছিল।—নাম প্রকাশ পায় নাই। মুখে কথা আছে, কিন্তু সে কথার মানে বুঝা যাইতেছে না। এক-বার বলিতেছে জগদম্বা, একবার বলিতেছে মহালক্ষ্মী, একবার বলিতেছে মিহিরা। জটা বহিয়া ঘাম্ পড়িতেছে, বুকের চুল ভিজিয়া ঘাম পড়িতেছে। ছিল কোথা, এলো কোথা? হাততালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া সেই লোক কহিল. "আমার কন্যা কোথায় আসিয়াছে?"

মুখে থাবা দিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "কথা কহিবার জন্য আমি তোমাকে এখানে আনয়ন করি নাই। পাগল হইয়া গারদে আটক রহিয়াছিলে, রাজপুত্রকে দেখাইবার জন্য এখানে আনিয়াছি। দেখিতেছ?—" অপ্সরাসুন্দরী তখন খড়্গাধারিণী হইয়াছেন, হিজিবিজি করিয়া কত কি কথা বলিতেছেন। শুনিতেছে সকলে, কিন্তু বুঝিতেছে একজন কি দুইজন। দাড়ীধারী জটা-ধারী নাচিল, নাচিয়া নাচিয়া কহিল, "প্রাণ কেন যায় না? ঐ পাখী ডাকিতেছে। গাছে যখন উঠিয়াছিলাম, আহা! আহা! কি চমৎকার পাখী! আমাকে ডাকিয়া তখন কথা কহিতেছিল, এখন উড়িয়া গেল কোথায়? এই বুঝি এই? মিহিরা! কার পাখী হইয়াছিস্? মুখ লুকাইয়া কোথায় বসিয়া রহিয়াছিস্? হাসি মুখে ধরে না! আহা!—মরিয়া যাই না!

কেন এখন মরিব? শুনিয়াছি, সব এখানে। হুঁ-হুঁ-হুঁ! কত লোক, কত পাখী; কত কুকুর, কত শেয়াল! ঐ গেল! আর আমি বলিতে পারি না। আসিতেছে, যাইতেছে, উড়িতেছে, বসিতেছে। গেল গেল, উড়িয়া গেল! মিহিরা! তুই বুঝি উড়িয়া গেলি? ছি—ছি—ছি!—তুই মা কেন উড়িয়া পলাইবি? আকাশে আমি আছি, পাতালে আমি যাই, পৃথিবীতে আমি থাকি, কিন্তু তুই মা!—ঐ যাঃ!—ঐ আবার ভুলিয়া গিয়াছি।”

সান্ত্বনা করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, “তুমি অত চঞ্চল হইতেছ কেন? তোমার মিহিরমোহিনী তোমারই আছে। তুমি বড় ভাগ্যবান হইয়াছ। মিহিরমোহিনী রাজার ঘরে পড়িয়া রাণী জগৎকুমারী হইয়াছে।”

“অঁ্যা?—কি বল তুমি আমাকে? আমার মিহিরমোহিনীর নাম হইয়াছে জগৎকুমারী?”

“তোর আবার মিহিরমোহিনী কে?”—বসিয়া ছিলেন, চীৎকার করিয়া লাফাইয়া শশিকুমার কহিলেন, “তোর আবার মিহিরমোহিনী কে?”

বিমর্ষবদনে জোরে হাস্য আনিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, “জগৎকুমারী তোর কে? জগৎকুমারী আমার রাণী।”—চক্ষু ঢাকা দিয়া পাগল রাজা কাঁদিয়া কহিলেন, “জগৎকুমারী আমার রাণী। তোরা কারা?”

নূতন লোক আকাশে হাত তুলিয়া কহিল, “কাহারও না, কাহারও না, মিহিরমোহিনী আমার। অনেক দিন দেখি নাই. দেখিবার আশাও ছিল না,—এ কি? গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছে কেন? এত বজ্র ধ্বনি হইতেছে কেন? আমি কোথায় আসিয়াছি? ঐ যা! আমার চক্ষু ঝল্সাইয়া গেল! এই বুঝি চপলা? দূর ছুঁড়ি! এত হাসি কোথায় শিখিয়াছিস্? চক্ষু আমার পুড়িয়া গেল। চপলা! কপালে কি তুমি খেলা করিতে পার না? বুকে আসিতে পার? যদি পার, ডাকিয়া বলিব—না—না,—আর বলিব না,—কি দেখিতেছি, কি শুনিতেছি—ঐ বুঝি—”

“আরে, এ লোকটা আরো পাগল! এত কথা কহিতেছে, একটী কথারও খেই ধরা যায় না। আসিয়াছ তুমি চতুর্ভুজ?” অন্যমনস্ক হইয়া ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আসিয়াছ তুমি চতুর্ভুজ? কবিরাজ তুমি, নাড়ী ধরিয়া বাত পিত্ত কফ পরীক্ষা করিতে পার, কিন্তু আনিয়াছ কাহাকে?

যাহাকে আন, সেই-ই কি পাগল ? ইহার নাম কি ? এত কথা কহিতেছে, মাথা ঘুরাইয়া নাচিতেছে, ইহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দাও।”

“তাই ভাল। ভূপেশচন্দ্র। রাজকুমারের কথাই এই বটে! পাগলা গারদে পাগলের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লওয়াই ভাল!”

“না রাজকুমারি!”—অপ্সরার ব্যঙ্গোক্তিতে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “না রাজকুমারি।—এ লোক পাগল নয়। ইহাকে আমি দেখিয়াছি। ছল করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়াছে। ছল করিয়া পাগলাগারদে প্রবেশ করিয়াছে। পাগল নয়।”

“বেশ যাহা হউক। সত্য ভুপেশচন্দ্র।—সত্য!—পাগলকে পাগল বলিয়া আমি চিনিতে পারিতেছি,—”

“পারিতেছ? তোমার কি ভুল হইতে পারে না দেবি? এই লোককে আমি রাজবাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। তখন ইহার মূর্ত্তি—”

“মূর্ত্তি তুমি সকলই জান। আমারে ভুলাইবার জন্য ফাঁকি দিয়া ফাঁকি দিয়া কত কথাই কহিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। রাজ-কুমার। দুষ্টগ্রহ ছাড়িয়া গিয়াছে, তোমাতে আমাতে সুখী হইব মনে করিয়াছি; নিদ্রায়, স্বপ্নে, জাগরণে, আশা আসিয়া আমার কাণের কাছে কথা কহেন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার কাছে জানিয়াছি, দুষ্ট—”

অনেক স্বর এককালে মিলিত হইয়া যেন গীত গাইল। রাজা মহানন্দ রাও আর যশেশ্বরী দেবী বিমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অজানা লোকে যখন কথা কহে, মানী লোকের তখন যেন মাথা কাটা যায়। ভাল কথায় না।—সেই সকল লোকের উপযুক্ত কথায় একটী আমাদের অন্দরবাসিনী মেয়েদের ছি আছে।

“ঐ বুঝি তাহারা আসিল? তাহারা আবার কাহারা? এক লোক সম্মুখে আসিয়াছে, ইহার সঙ্গেই পরিচয় হইবে, মুখে দাড়ী, বুকে চুল, বেশ জটাধারী সন্ন্যাসী।—আমি জিজ্ঞাসা করিব না, ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিবেন না, কিন্তু কে? নাচিতে নাচিতে আসিতেছ, তুমি কে? পাগল হইতেছ? চিনি না বুঝি তোমারে? দুরাত্মা পাপিষ্ঠ লম্পট! সন্ন্যাসী সাজিয়া আসি-য়াছ? চিনি না বুঝি তোমারে? খাড়াখাড়া, খাড়া হইয়া দাঁড়াও! রাণী

চিনিয়া লও, কন্যা চিনিয়া লও, আর যদি কিছু চিনিবার থাকে, অপ্সরা-সুন্দরীর অসির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। জটা দেখিয়া ভুলিব না, দাড়ী দেখিয়া ভুলিব না। ঐ আবার ওরা কে? কেন পাগলাগারদে প্রবেশ করিয়াছিলাম? কত দিকে কত লোকের পানে চাহিয়া দেখিতে হইতেছে,—না—না—না,—ভূপেশচন্দ্র! আর অন্ধকারে থাকিব না, আমার হস্তে তলোয়ার আছে। নির্ভয়ে আমি দাঁড়াইয়া থাকি। ভূপেশ! তুমি ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, এ কথা যদি কেহ বলে, তাহা কি আমার প্রাণে সহ্য হইবে? ভূপেশ! বুক ফাটিয়া প্রাণ যদি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম আমি ছাড়িব না। যে ধর্ম্মের বলে আপনার জীবনকে বিপক্ষ-কবল হইতে বাঁচাইয়া আসিতেছি, যে ধর্ম্মের বলে তোমারে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, সে ধর্ম্ম আমারে পরিত্যাগ করিবেন না।—ছিঃ!—আমারেও ছিঃ! কোন্ লজ্জায় কাহারে কি বলিয়া রাণী বলিতেছি। পাপরাশি একত্র করিয়া যদি কোন পুতুল গড়িতে পারা যায়; আমি গড়িব না, এই পাকা চুল, পাকা দাড়ী জটাধারী গড়িবে, কেমন এক গৃহস্থ-গৃহের গণিকা। আমি ইহাকে রাণী বলিয়া পরিচয় দিতেছি, কিন্তু কিসের অনুরোধে? শুদ্ধ কেবল রাজা রঘুবরের অনুরোধে। যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা শুনিবেন,—পূর্ব্বেও শুনিয়াছেন, এখনও মাঝে মাঝে শুনিতেছেন, আবার শুনিবেন, কাহার কন্যা, কেহই জানে না, কিন্তু ঐ কুলটা মহালক্ষ্মী,—চতুর্ভুজের পরিচয়ে পুরাতন কথায় কুলটা মিহিরমোহিনীর জননী;—ধূর্ত্ত ক্ষত্রিয়াধম স্বর্গভূষণের জননী। লৌকিক শাস্ত্রের একটী কথা আছে, পুত্রকন্যারা মাতাপিতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। দুই স্বভাব একত্র হওয়া অসম্ভব। অন্যতর হয় এক, না হয় আর এক। জনকের স্বভাব কিম্বা জননীর স্বভাব। মিহিরমোহিনী জননীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ত হাতে হাতে স্পষ্ট পরিচয়। কিন্তু স্বর্গভূষণ যে, কাহার প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ, যথার্থ অনুমান করা যায় না। স্বর্গভূষণের পিতা দুরন্ত প্রকৃতির লোক হইতে পারেন, কিন্তু সতীর সতীত্বনাশে ইহাঁর যে প্রবৃত্তি আছে, ইহা শুনা হয় নাই। তবে স্বর্গভূষণ কি মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা—না, সে কথা এখানে বলিতে নাই। ইঙ্গিতের আভাসে যদি কেহ কিছু বুঝিয়া লইতে পারেন,

আমি তাহাতে লজ্জাহীনা হইব না। কাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিব? দিনকাল বড় ভয়ঙ্কর! কেহ যদি আমার কথায় হুঁ হাঁ না দেন, অপমানে মাটী হইয়া যাইব। যেখানে রহিয়াছি, সেখানে মিত্রমণ্ডলী অপেক্ষা শত্রুমণ্ডলী অধিক। আমি নারী, অনেক সাবধান হইয়া কথা কহিতে হয়। এত শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিব না। খানিকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকি। চতুর্ভুজ মহাশয়! আপনি ত একজন বহুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, আপনি কেন চুপ করিয়া রহিয়াছেন? লজ্জাভরণা কুলকামিনীর মুখে এত কথা শুনিতে আপনার কি এতই বাসনা হইতেছে? আপনি অনেক জানেন, আপনার মুখে শুনিয়া আমিও অনেক জানিয়াছি; কিন্তু এই লোকটা,—এখন দেখিলে বলিতে হয়, নূতন লোক, কিন্তু পরিচয়ে পুরাতন। ইহার মধ্য পরিচয় রাজা বিরাটকেতুকে শুনাইতে হইবে। আমি ত তাহা পারিব না। পিতা বসিয়াছেন। পিতার নিকটে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কথা কহা হিন্দু কুলবালার পক্ষে নিষিদ্ধ। চতুর্ভুজ মহাশয়! আপনি বোধ করি বুঝিতেছেন, ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিতে হইবে, সে সকল কথা হিন্দু-কুলবালার মুখ হইতে উচ্চারিত হওয়া উচিত নহে। সংসারশাস্ত্রে যাঁহারা শাস্ত্রী, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের জ্ঞান কিছু অল্প পায়। মোটামুটী সোজা কথায় তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, নারীজাতির অলঙ্কার লজ্জা। কিন্তু সত্যই কি তাহাই? এমন দেশ অনেক আছে, যে দেশে নারীজাতি লজ্জার আদর করে না। আর্য্যবর্ত্তে তাহাই সত্য। আর্য্যকুলের কুলাঙ্গনা লজ্জাকে প্রিয় অলঙ্কার বিবেচনা করিয়া পরমযত্নে হৃদয়ে ধারণ করেন। কিন্তু সকল দেশে এমন নয়। যে সকল দেশে যে সকল নারী পুরুষের উপর প্রভুত্ব করে, তাহারা লজ্জার আদর জানে না। কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দুটী কথা বাকী আছে। শশিকুমারের সঙ্গে মিহিরমোহিনীর কি সম্পর্ক, একবার সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু সকলে হয় ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমার মুখে কিম্বা অন্যের মুখে তাহা হয় ত তত স্পষ্টও হইতে পারিবে না। আকাশের মেঘ যখন উড়িয়া গিয়াছে, নক্ষত্র যখন ফুটিয়াছে, চাঁদ যখন উঠিয়াছে, তখন কুমুদিনী অবশ্যই হাসিবে। কুমুদিনীর কি লজ্জা নাই? যদি নাই, তবে প্রভাতে সূর্য্যকে দেখিয়া নয়ন

নিমীলন করিয়া মৌনবতী হয় কি জন্য ? আহা ! কুমুদিনী বড় সতী। সে সতীর লজ্জা আমরা রাত্রিকালে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। একজন মূর্খ ভট্টাচার্য্য একবার বলিয়াছিল, নিশাকালে ভ্রমরেরা কাণা হয়। কুমুদিনীকে সাক্ষী করিয়া,—আমি নারী, বলিতে পারি, মধুলোভী মধুকর কাণা হইতে জানে না। জোঁকেরা একটী কুটা ছাড়িয়া আর একটী কুটা আশ্রয় করে। কুটায় কুটায় চলিয়া যায়। কিন্তু বস্তুর মহিমা জানে না। একটী শিশু জননীর স্তনে ক্ষীর চুষিয়া খায়, জোঁককে সেই খানে বসাইলে কেবল রক্ত টানে। এই স্বর্গভূষণ, এই শশিকুমার, আর এই মিহিরমোহিনী,—আর যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, এই মহালক্ষ্মী, ইহারা জোঁকের ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছে। স্বর্গভূষণের ভগ্নী মিহিরা, শশিকুমারের পিতার পত্নী মিহিরা, আর আমি কথা কহিব না। যাহা কিছু কহিবার থাকে, চতুর্ভুজ মহাশয় কহিবেন।”

সকলে যেন অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। চক্ষু সকলেরই আছে, কিন্তু স্থলবিশেষে চাহিবার শক্তি সকলের নাই। যাঁহাদের চাহিবার শক্তি ছিল, তাহারা চাহাচাহি করিলেন, কিন্তু যাহাদের শিরায় শিরায়, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে, তাহারা মাথা হেট করিয়া রহিল।

চতুর্ভুজ কহিলেন, “উদয়সিংহের কন্যার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অবশ্যই উচিত। জানি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে যে, যে স্থানে দশবার এক কথা বলিয়া না দিলে অনভিজ্ঞ লোকে ঠিক্ ঠিক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অগত্যা আমাকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইল। মহারাজ মহানন্দ রাও! দোষ মার্জ্জনা করিও। রাণী বিরজা! আমাকে অপরাধী মনে করিও না। কুমার ভূপেশচন্দ্র! তুমি আমার এক এক কথার সাক্ষী হও। কুমারী অপ্সরাসুন্দরি! মা! তুমি আর একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখ। পুরাতন কথা আমি সংক্ষেপে আবার নূতন করিয়া কহিব। তাহাই বা কেন ? পুরাতন যাহা, তাহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নূতন যাহা, তাহা নূতন হইয়া আসিবে। এই লোককে এখানে কে আসিতে বলিয়াছিল ? ইহাকে দেখিবার জন্য কাহার

আকিঞ্চন হইয়াছিল ? ভণ্ড যোগীবেশে আমাদের চক্ষে যেন আগুন জ্বালিয়া দিতে আসিয়াছে। পাকাচুল, মাথায় জটা, গায়ে ছাই। এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভুলিয়া যাইব, ইহাই যেন মনে করিয়াছে। কেহই যেন চিনিতে পারিবে না, এমনি ভেকধারী হইয়া সাজিয়া আসিয়াছে। রাজা রঘুবর! এই ভণ্ড তপস্বীকে চিনিতে পার ? ইনি তোমার গুরুদেব, নাম অশ্বানন্দ স্বামী। আমাদের কথায় বাওযাজী। ইনিই তোমার মহালক্ষ্মীর জঠরে মিহিরমোহিনীর জন্ম দিয়াছিলেন! মহালক্ষ্মী ইহাঁকে তোমার আমার অপেক্ষা ভাল করিয়া জানেন। ছদ্মবেশ দেখিয়া তোমরা হয় ত ভক্তি করিতে পার, কিন্তু আমি অস্থিতে অস্থিতে জর্জ্জর হইয়া যাইতেছি। ভণ্ডামী এই ক্ষণেই ভাঙ্গিয়া দিতে পারি, কিন্তু ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এখানে উপস্থিত থাকিতে,—আমি গরিব লোক, আমার সেটা ভাল দেখায় না। জটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, পদধূলায় গাত্রভস্ম মুছিয়া ফেলিয়া এই দণ্ডে আমি ইহাকে অশ্বানন্দ সাজাইতে পারি। ক্রোধ হইতেছে, ক্রোধকে আমি মনে মনে চাপিয়া রাখিতেছি। একটু ভয় আছে। ইনি হন কি না, নছিক্ পুলুছ। যাঁহার গুরু নছিক্ পুলুছ, তিনও অবশ্য নছিক্ পুলুছ হইতে পারেন। গুরু নছিক্, শিষ্য নছিক্, শিষ্যের পুত্র ছগ্যভূছন নছিক্, গুরুপুত্রী মিহিরমোহিনা নছিকা। মিহিরমোহিনীর আদরের ধন বিরাটকেতুর কুলধ্বজ বংশধর ছছিকুমারও নছিক্ পুলুছ। এত নছিক্ আমরা একত্র করিয়াছি। কিন্তু কি বলিব রাজা! ক্ষত্রিয়ের নিকটে একজন সামান্য কবিরাজকে তলোয়ার ধরিতে নাই।"

"নাই চতুর্ভুজ মহাশয় ? ক্ষত্রিয়ের নিকটে তলোযার ধরিতে নাই ? ক্ষমা কর আমারে। ক্ষত্রিয়কুমারী তোমারে আদেশ করিতেছে, তরবারি ধারণ করিয়া মায়াচক্র ছেদন কর। মনে আছে সত্যভামার দর্পচূর্ণ ? মনে আছে সুদর্শনের দর্পচূর্ণ ? মনে আছে গরুড়পাখীর দর্পচূর্ণ ? সেই সকল চূর্ণের কথা মনে কর। গোঁফদাড়ী, জটাভস্ম কাড়িয়া লও। যে মূর্ত্তিতে এই চোর প্রবেশ করিয়াছে, সেই মূর্ত্তির মায়া ভঞ্জন করিয়া সত্য মূর্ত্তি সকলকে দেখাইয়া দাও। আমি জানিতে পারিতেছি মায়া! কিন্তু বামাচরণের একটী অঙ্গুলী এই মায়াচূর্ণ করিয়া দিতে পারে। মহাশয়! এই মায়াবীকে এখানে কে ডাকিয়াছে ?"

একটা লাঠী হাতে করিয়া আনোয়ার বখ্‌ত কহিল, "আমি ডাকিয়াছি। আমার লোক ইহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। মেয়েমানুষের এতদূর অহঙ্কার? সেই অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আমরা সশস্ত্র সাজিয়া রহিয়াছি।"

"কি বলিস্,—কি বলিস্,—কি বলিস্ পাপিষ্ঠ যবন? তুই ডাকিয়াছিস্?—তুই কে?—মেয়েমানুষের অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিবি? কথা মনে আছে? আনোয়ার! নিকটে ঘেঁসিয়া আসিতেছিস্, দূরে যা! একদিন,—সেই একদিন, তোর কাছে আমি করুণা ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সে দিন আর নাই। এখন আমি তোদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী নই। তোদের অনুগ্রহের দাসী নই। স্বর্ণভূষণের কুচক্রের শিকার নই। আমার ভূপেশচন্দ্র অঙ্গীকারমুক্ত। আমি এখন রাজা বিরাটকেতুর পালিতা কুমারী বলিয়া পরিচয় দিতেছি, শিখিয়াছিস্ পরিচয়। আনোয়ার! এই চরণের প্রহার যাহারা সহ্য করিতে পারে, তাহাদের কাছেও তুই ছোট। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ উদয়সিংহের কন্যা আমি, চাতুরী, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ছলনা, যন্ত্রণা, যত কিছু এই বুকের উপর দিয়া সহ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি ভুলি নাই। প্রতিহিংসা ভাল নহে, এখনও তাহা আমি জানি। যিনি বিশ্বসংসারের বিধাতা, পাপীর দণ্ড তিনিই দেন। মানুষে যত আস্ফালন করে, তাহা মিথ্যা, তাহা বিফল হয়। আনোয়ার! তোরা তিনজনে স্বর্ণভূষণকে আর শশিকুমারকে সহায় করিয়া পাঁচজনে, আরও যদি গোপনে গোপনে রাজা রঘুবরের দেহ হইতে সাহস আনিবার সম্ভাবনা থাকে, ছয় জনে, যতদূর সাধ্য, বীরত্ব প্রকাশ কর্, চেষ্টা করিয়া দেখ্। চতুর্ভুজ মহাশয়। কতক্ষণ আর ইন্দুরকে ক্ষমা করিতে হইবে? ক্ষত্রিয়-কুমারেরা আর কতক্ষণ নিস্তেজের মত নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবেন? গিয়াছে গিয়াছে, স্বাধীনতা গিয়াছে, তাহা বলিয়া ত আর্য্যবংশের মহিমা যায় নাই। মুসলমান আনোয়ার! গোপনে গোপনে লোক পাঠাইয়া বড় সহায় আনিয়াছ। এই মায়াবী ভণ্ড যোগী বাঘ হইয়া যেন তুলসীবনে লুকাইয়াছে। রাজা রঘুবরের গুরু। মহালক্ষ্মীর গুরু। মিহিরমোহিনীর গুরু। ঘটনায় যদি বলি, তাহা হইলে শশিকুমারেরও গুরু। হইতে পারে, হউক। কর্ণ যদি শুনিতে পারে, শুনুক। কিন্তু আমি—"

নদীর জোয়ারের জলস্রোতের ন্যায় অপ্সরাসুন্দরীর বাক্যস্রোত অনেক

দূর ছুটিল। রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরাইয়া আনোয়ার কহিল, লেকায়ৎ কহিল, হনুমান প্রতিধ্বনি করিল, "এই ছুঁড়ীই সকল অনর্থের মূলাধার। ইহাকে কাটিয়া ফেল,—ইহাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলেই দিল্লীশ্বরের জয়!"

হাত তুলিয়া অপ্সরা কহিলেন, "দিল্লীশ্বরের এখনও জয় আছে? দিল্লীশ্বর কে? দিল্লীশ্বর কোথায়? আমি অপ্সরাসুন্দরী, একাকিনী যদি আমি অসিধারিণী হইয়া দাঁড়াই—"

"না দেবি! তোমারে দাঁড়াইতে হইবে না। এত অহঙ্কারের কথা সহ্য হইবে না। পূজনীয় রাজকুমার ভূপেশচন্দ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া আমিই অগ্রসর হইব।"

"তুমি? তুমি? কে তুমি অগ্রসর হইতেছ? আমার চক্ষে যে জল থাকিতেছে না। কেন আসিয়াছিলাম হরবিলাস? কেন তোমরা আমারে এখানে আনিয়াছিলে? জলের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে! ভয়ে না,—মরণকে আমি ভয় করি না। যমকেও না। হরবিলাস! কি করিতে আসিয়াছি? কি করিতেছি? কাহাদের সঙ্গে কলহ করিতেছি? দেখ দেখি তোমরা একবার। আমার পাগল পিতা কেমন আছেন?"

"সেই কথাই ত কথা!"—চমকিয়া উঠিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, সেই কথাই ত কথা। এই সকল দুরন্ত লোকের ছলনাচক্রে সেই কথা ভুলিয়া বৃথা আমরা—"

"বৃথা নয় ভূপেশচন্দ্র! বৃথা নয়। যাহারা মায়াজাল বিস্তার করে, তাহাদের দমন করিবার ঔষধ প্রয়োজন। সে ঔষধ আমি ক্ষণে ক্ষণে প্রস্তুত করিতে জানি। কিন্তু ভূপেশ! একবার দেখ দেখি, তোমরা,—আমার পাগল পিতা কেমন আছেন?"

মন কাঁদে। যদি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কথা হয়, চক্ষের সঙ্গে যদি চক্ষের মিলন হয়, প্রাণের সঙ্গে যদি প্রাণের আকর্ষণ থাকে, তাহা হইলেই মন কাঁদে। বনে বনফুল ফুটিয়া আপনা আপনিই শুকায়। সূর্য্য তাহাকে আলো দেন, চন্দ্র তাহাকে সুধা দেন, কিন্তু কেন, কে বলিবে? সে ফুল শুকাইয়া যায়। কেহ আদর করে না, তুলিয়া লয় না, আঘ্রাণ করে না, আপনি ফোটে, আপনিই শুকায়। ছোট ছোট মেয়েরা বলে, কাটমল্লিকা।

কিন্তু তাহা ত না! কত সুবাসিত পুষ্প বিজন বনে ফুটিয়া থাকে, সকলের নাসিকা, সকলের চক্ষু তাহা জানিতে পারে না। যে সকল পুষ্প উপবনে প্রস্ফুটিত হয়, মালীর হস্তের যত্নবারি প্রাপ্ত হয়, সে সকল পুষ্পের সৌরভ পৃথিবীর লোকের নাসিকাতে কতই মনোহর বোধ হইয়া থাকে। তাহা দর্শন করিয়া দর্শকের নেত্র কতই প্রফু্ল হইয়া থাকে। কিন্তু উপবনে এমন পুষ্পবৃক্ষ ও জন্মে, তাহা দেখিতেও ঘৃণাকর, ফলের আঘ্রাণও অতিশয় উগ্র। এক একটার কিছুমাত্র গন্ধ পর্য্যন্তও নাই।"

"এ সকল কথা এখানে কেন তুলিতেছ? উপস্থিত ঘটনার সঙ্গে বনফুলের আর উপবনফুলের যে কি সম্পর্ক, তাহা ত কিছুই বুঝা যাইতেছে না।"

"একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলেই বুঝিবে। ফুলের কথা তুলিতেছি, ফুলের ফল বুঝাইয়া দিবার জন্য। এক ফুল এই মহালক্ষ্মী, আর এক ফুল এই মিহিরমোহিনী। মহালক্ষ্মী-ফুলের গর্ভেই মিহির-ফুলের জন্ম। দুটীই নছিকা। ইহাদের স্বভাবচরিত্রগত কত যে সৌরভ রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা ইহারাই জানে, আর ভাল ভাল নছিক্ পুলুছেরাই জানে। মিহিরাফুলটী ফোড়্কলমের।"

এই কথা গুলি সমাপ্ত হইলে ভূপেশচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, শশিকুমার আর স্বর্গভূষণ একবারে যেন বসিয়া বসিয়া মরিয়া রহিয়াছে। শরীরে স্পন্দ-মাত্র নাই, অপমানে অধোমুখ, কেবল চক্ষের পলক দেখিয়া অনুমান হয়, সজীব। মধ্যে মধ্যে এক একবার গাত্ররোমাঞ্চ দর্শনে অনুমান হয়, জীবন-বায়ু পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। এই ভাব দর্শন করিয়া ভূপেশচন্দ্র মনে মনে কহিলেন, তবুও ভাল। ইহাদের যে ঘৃণালজ্জা আছে, ঘৃণালজ্জা আসিয়াছে, পাপ বুঝিতে পারিতেছে, ইহাও এক প্রকার ভাল। স্বর্গভূষণ মরিলে ভাল হইত না। মরিয়া গেলে এ সকল দেখিতই বা কে, শুনিতই বা কে, দেখাইতই বা কে? এই পাপাত্মাকে বাচাইয়া চতুর্ভুজদাস ভাল কার্য্যই করিয়াছেন। ছিলই ত শ্রদ্ধা, তাহার উপর আরও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া চতুর্ভুজকে অভিবাদন করিবার অভিলাষে ভূপেশচন্দ্র গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক্ এই অবসরে রাজা বিরাটকেতু কাঁদিয়া উঠিলেন। কেবল চক্ষের জলে

রোদনের পরিচয় নহে, কত কথা বলিতে বলিতে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন। তাঁহার মানসে তখন যেন কি কত গুরুতর অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে সকলের সাক্ষাতেই কহিতে লাগিলেন, "আমি কি করিয়াছি, কি করিয়াছিলাম, কি করিতেছিলাম! বিধাতা আমায় তেমন মতি কেন দিয়াছিলেন! জানিতাম আমি, অপ্সরাসুন্দরী কাহার কন্যা। জানিতাম আমি, স্বর্ণভূষণ কাহার গর্ভের পুত্র। ইহা জানিয়া শুনিয়াও অর্থলোভে এক কুলটার গর্ভজাত দুঃশীল রোগীর হস্তে এই মহারত্ন সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমি জানিতাম না, ভূপেশচন্দ্র কাহার পুত্র। শুদ্ধ সেই কারণেই অপ্সরার সহিত ভূপেশচন্দ্রের পরিণয়সম্বন্ধে শুদ্ধ অজ্ঞানেই বিরোধী হইয়াছিলাম। আমি জানিতাম না, জগৎকুমারী বাস্তবিক কাহার কুমারী। শুদ্ধ অজ্ঞানেই বৃদ্ধবয়সে ঐ সাপিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। মায়াবিনী যে কি প্রকার মোহমন্ত্র জানে, তাহা আমি এখন বুঝিতেছি। সেই মন্ত্রবলেই আমাকে উহার এক প্রকার আজ্ঞাবহ দাস হইতে হইয়াছিল। বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিলে সচরাচর যেরূপ ফল হয়, আমার ভাগ্যে তাহাই ফলিয়াছে। জানিতাম না, শশিকুমার আমারই পুত্র, জানিতাম না, শশিকুমারের সহিত জগৎকুমারীর কি সম্পর্ক। জানিতাম না, স্বর্ণভূষণের সহিত জগৎকুমারীর কি সম্পর্ক। জগৎকুমারীকে আমি যথার্থ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতাম না। কতকটা ভয়ে ভয়েই বিশ্বাস করিতাম। স্বর্ণভূষণকে নিমন্ত্রণ করিয়া জগৎকুমারীকে দেখাই। দুজনকে এক গৃহে রাখিয়া সামান্য কার্য্যান্তরে আমি গৃহান্তরে প্রবেশ করি। উভয়ে কি কি কথা হয়, ফিরিয়া আসিবার সময় কিয়ৎক্ষণ গোপনে দাড়াইয়া তাহার গুটীকতক শেষ কথাও আমি শুনি। সন্দেহও জন্মে। কিন্তু ভয়ে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই। ভয়েও বটে, লজ্জাতেও বটে, চক্ষের খাতিরেও বটে। সে ত গেল দিনের কথা। তাহার পর, আমি যখন উপস্থিত থাকিতাম না, রাত্রিকালেও স্বর্ণভূষণ একাকী গিয়া জগৎকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। সেই অনুচিত সাক্ষাতের পরিণামফল মহাবিষময়। অনেক দুঃখে, অনেক কারণে আমার এরূপ চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে। বুঝিতেছি, ইহা প্রকৃত উন্মাদরোগ নহে, মানসের এক প্রকার সাংঘাতিক ব্যাধি। মনের সহিত দেহকেও এই ব্যাধি

আক্রমণ করিয়াছে। দিন দিন দেহ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। এক একবার বুকের ভিতব যেন কি হু হু করিযা জ্বলে। বক্ষঃস্থলে যেন এক বিন্দুও রক্ত নাই মনে হয়। চক্ষে যেন কিছুই দেখিতে পাই না। কর্ণে যেন কোন স্পষ্ট শব্দ প্রবেশ করে না। কেবল যেন বোধ হয, দূরের ঝড়ের শেষগর্জ্জনের মত ভোঁ ভোঁ আর গোঁ গোঁ শব্দ।--মস্তক যেন ঘুরিতে থাকে। কথা কহিবার শক্তি যেন ফুরাইযা যায়। যে দিকে চাহি, সকলই যেন অন্ধকার মনে হয়। অনেক ক্ষণ সেই ভাব থাকে। তাহাব পর যখন একটু ভাল হই, তখন বড় বড় নিশ্বাস আর নেত্রজলেব সঙ্গে অনেক অসম্বদ্ধ কথা বাহির হয়। সেই টুকুই উন্মাদের লক্ষণ। নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি, এ ব্যাধি হইতে আর আমি মুক্ত হইতে পাবিব না। শরীব জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। তাহাব উপব চতুর্দ্দিকেব যন্ত্রণানল যেন দাবানলের মত জ্বলিয়া অষ্টপ্রহব আমাকে দগ্ধ কবিতেছে। বৃদ্ধকালে এত যন্ত্রণা ত আর সহ্য কবিতে পারি না। বিধাতা আমার অদৃষ্টে এত যন্ত্রণা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সৌভাগ্যের সময ইহার কিছুই আমি জানিতাম না। দুর্ভাগ্য এখন কালভুজঙ্গ রূপ ধারণ করিযা অহরহ আমাব মস্তকে দংশন করিতেছে। সৌভাগ্যের সময় যে পৃথিবী আমার চক্ষে অনন্ত সুখনিবাস বলিয়া প্রতিভাত হইত, এখন এই চক্ষে সেই পৃথিবী যেন অনন্ত নরকনিবাস বলিয়া বোধ হইতেছে। ভগবান এই অভাগাকে যে, আর কত দিন এই নরকে রাখিয়া এইরূপে দগ্ধ কবিবেন, কত দিনে যে পরিত্রাণ হইবে, কিছুই বুঝিতে পাবিতেছি না।"

একবার অন্য দিকে চাহিয়া আবাব রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "নরক আরও আছে।. এক নরক হইতে পবিত্রাণ লাভের আশা করিতেছ রাজা, কিন্তু নরকেব সংখ্যা নাই। নরক অনন্ত। পৃথিবা ছাড়া অন্য স্থানে অনন্ত নরক আছে, ইহা আমি বিশ্বাস কবি না। এই স্থানেই সমস্ত ভোগাভোগ। কিন্তু এই স্থানে একটা রহস্যেব কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব। লজ্জা পরিত্যাগ কবিয়া উত্তর প্রদান করিতে হইবে। জগৎকুমারীর গর্ভে পুত্র হইয়াছে, সত্য সত্য সে পুত্র কাহার? তোমার, না স্বর্গভূষণের, না শশিকুমারের? কিম্বা রেজিয়া নামে মিহিরমোহিনী যখন

দিল্লীতে থাকে, তখন আর কোন নবাব ঐ পুত্রের পিতা হইয়াছিল কি না? সত্য বল, ঐ ছেলের সত্য পিতা কে?”

রাজা বিরাটকেতু সজোরে এক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মাথা হেঁট করিলেন। মিহিরমোহিনীও বসনে মুখ লুকাইয়া অধোমুখী। স্বর্গভূষণ আর শশিকুমার সমভাবে অস্পন্দ হইয়াই অধোমুখে রহিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের ধৈর্য্য! ধন্য তাঁহাদের সহিষ্ণুতা! ধন্য তাঁহাদের লজ্জা! এত সৃষ্টি হইতেছে, মাতাপিতা সম্মুখে, অথচ ঘৃণাবিষে দগ্ধীভূত হইয়া পলায়ন করিতেছেন না।

পলায়ন না করিবার একটী প্রধান হেতু আছে। স্বর্গভূষণ জানেন, ভূপেশচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে বলবান, মহাপরাক্রমশালী বীরপুরুষ তাহার উপর প্রধান দোহন হর্ষবিলাস।- যদি পলায়নের চেষ্টা করেন, নিস্তার পাইবেন না।—শশিকুমারও ইহা জানিতেন। সেই জন্যই লজ্জা-ঘৃণাকে ভূষণ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই। আরও বোধ হয়, তত লজ্জাও তাঁহাদের নাই।

অশ্বানন্দকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, “আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, তুমি নূতন আসিয়াছ, মিহিরমোহিনীর পিতা তুমি, মহালক্ষ্মীর গুরু তুমি, বিরাটকেতুর মহিষীর গর্ভজাত অজ্ঞাত পিতার ঔরসজাত ক্ষুদ্র বালক চন্দ্রলালের মাতামহ তুমি, তোমার ইতিহাসটা তুমি একবার নিজ মুখেই প্রকাশ কর। ঐ বেশে পরিচয় হইবে না, জটা নামাও, দাড়ী খুলিয়া ফেল, মুখের রংটা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেল। রঘুবর তোমাকে চিনিতে চান, মহালক্ষ্মীও তোমাকে চিনিতে চান। গায়ে ভস্ম মাখা আছে, ভস্ম থাক্,—ভস্ম ভিন্ন তোমার এখন আর কি ভূষণ হইতে পারে? ভস্ম থাক্। মুখখানি প্রকাশ করিয়া পরিচয় দাও। তাহার পর —তোমার পরিচয় সমাপ্ত হইবার পর উপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী যদি কেহ এখানে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে আবার তোমার ঐ চাঁদমুখে ছাই ঢাকা দিবেন।”

অশ্বানন্দ পলাইবার উপক্রম করিল। আনোয়ারের মুখ শুকাইয়া গেল। অশ্বানন্দ ভণ্ডযোগী, ভণ্ডগুরু। ঘোরতর মায়াবী, ঘোরতর দাগাবাজ। দস্যুতা করিয়া পথিকলোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাও তাহার যোগাশ্রমের এক

প্রধান ব্রত। আনোয়ার বথ্‌ত তাহারই দলস্থ লোক। লেকায়ৎ খাঁ আর হনুমান সিং তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে সেই বাতুলালয়মধ্যে তাহারা একটা হুলুস্থুলকাণ্ড বাধাইতে পারিবে, মনে মনে এইরূপ অভিসন্ধি করিয়াই আনোয়ার বথ্‌ত ঐ অশ্বানন্দকে সং সাজাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু বেগতিক দেখিয়া অশ্বানন্দস্বামী পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। চতুর্ভুজলাল যেন কোন প্রকার ইঙ্গিত জানাইয়া ভূপেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। অস্ত্রধারী আনোয়ার বথ্‌ত কিঞ্চিৎ দূরে ছিল, দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া পলায়নে উদ্যত অশ্বানন্দের হস্ত ধারণ করিল। চুপি চুপি কাণে কাণে কি কথা কহিল। নেত্রভঙ্গী, অঙ্গুলী ভঙ্গী করিয়া অপ্সরা দিকে দেখাইয়া দিল। বাস্তবিক অপ্সরাকে সেই স্থান হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়াই উহাদের দুরভিসন্ধি। গোপনে গোপনে তাহারই মন্ত্রণা। চুপি চুপি আনোয়ার কাণে কাণে কথা কহিল বটে, কিন্তু কথা কয়েকটা ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্থূল তাৎপর্য্য, আনোয়ার কহিল, "ঐ ছুঁড়ীকে ধরিয়া লইয়া চল। উহার নিমিত্তই যত অনর্থ। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি উহাকে জব্দ করিতে পারি নাই। ধরিয়া লইয়া চল। হিড়্ হিড়্ করিয়া টানো। আমরা চারি জন রহিয়াছি, ভয় কি আছে? টানো।"

অশ্বানন্দ চমকিয়া অপ্সরার দিকে চাহিল। ভূপেশচন্দ্র চতুর্ভুজের দিকে চাহিয়া তরবারি পরিগ্রহ করিলেন। শার্দ্দূলবিক্রমে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অপ্সরার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। অপ্সরা কহিলেন, "শান্তি! শান্তি!—যাহাকে শৈশবাবধি পিতা বলিয়াছি, তাহার এই অবস্থা এ সময়ে এখানে রক্তপাত করা উচিত হয় না। শশিকুমার আমাদের মন্দকারী নয়, রাজা রঘুবর আর স্বর্ণভূষণকে তুমি ক্ষমা করিয়াছ। তবে আবার অস্ত্র ধারণ করিতেছ কি জন্য রাজকুমার?"

"সে জন্য নয়। এই পাপিষ্ঠেরা পরামর্শ করিতেছে, আমাদের সম্মুখ হইতে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে!"

হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "আমারে?—সেই জন্য তোমার অস্ত্র ধারণ? এই জ্বলন্ত আগুনে চারি পতঙ্গ?"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া আনোয়ার বথ্‌ত কহিল, "ধর অশ্বানন্দ! ধর!—ধর

লেকায়ং! ধর!—ধর হনুমান!—ধর! একটা পাখী ধরিতে এত বিলম্ব কিসের? অহঙ্কার শুনিয়া রাগে আমার শরীর কাঁপিতেছে। ধর!—অক্ষম হও, আমিও ধরি।"

ভীম তরবারি কম্পিত করিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গীতে হাস্য করিতে করিতে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "মস্তক লইয়া যদি ঘরে ফিরিয়া যাইবার সাধ থাকে, এক পদও অগ্রসর হইও না। অগ্রসর হইলেই আমার পদতলে চারিটা মস্তকশূন্য দেহ পড়িয়া থাকিবে। আনোয়ার! এখনও পর্য্যন্ত তোমার চৈতন্য হয় না? সাহস করিয়া এখনও পর্য্যন্ত তুমি আমার সম্মুখে গর্জ্জন কর? সাবধান!"

"তুই কে?"—আনোয়ারের সাহসে সাহস পাইয়া অশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "এত দম্ভ প্রকাশ করিতেছিস্, তুই কে? আমরা চারিজন একত্র হইয়া শত জনকে নিধন করিতে পারি। বিশেষ বাদ্‌সাহের বাতুলালয়। আমরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। তুই কে? আমরা মনে করিলে অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিতে পারি।"

"পার তোমরা, তাহা জানি।" আবার হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অবশ্যই তোমরা পার, কিন্তু স্থান আছে, পাত্র আছে, তোমাদের মত লোকের দপের সঙ্গে বীরত্ব প্রকাশেরও অবকাশ আছে, কিন্তু এখানে নহে। আমি কে? তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কে? এ প্রশ্নের উত্তর আমার তরবারির নিকটে প্রাপ্ত হইবে। বাদ্‌শাহের বাতুলালয়। কথা শুনিয়া হাসি আসিল। বাদ্‌শাহ বাতুল হইয়াছেন, তোমরাও বাতুল হইয়াছ, সতী অঙ্গ স্পর্শ করিবার সাহস করিতেছ, কাণে কাণে মন্ত্রণা করিতেছ, তাহার প্রতিফল আমার অস্ত্রের নিকটে"—

অশ্বানন্দের গেরুয়াবস্ত্রের মধ্যে একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা লুকান ছিল। জোরে টানিয়া বাহির করিয়া, ভূপেশচন্দ্রের অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যে বাধা দিয়া অশ্বানন্দ কহিল, "তোর অস্ত্র? তোর অস্ত্রের নিকটে আমাদের প্রতিফল? শৃগাল হইয়া সিংহের কাছে বিক্রম?—এই দেখ্, এক আঘাতে—"

আর অধিক কথা কহিতে না দিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "পিপীলিকার পালক উঠিয়াছে। ভূপেশচন্দ্র! তুমি বীর, কি

জানি, ক্রোধের সময় যদি ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া এই ক্ষীণজীবী প্রাণিগণের গাত্রে অস্ত্র প্রহার কর, সাবধান হওয়া ভাল। ভয় নাই, যদি প্রয়োজন হয়, আমিই ইহার উচিতমত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইব। অস্ত্র থাক্, আমার হাতে দাও।"

ভূপেশচন্দ্র কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, বীরাঙ্গনার উপযুক্ত কথা। যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে স্থান হইতে সরিলেন না, কিন্তু স্বইচ্চায় অস্ত্রখানি অপ্সরার হস্তে প্রদান করিলেন। গম্ভীরবদনে সুস্থির-নয়নে,—সুস্থির অথচ উজ্জ্বল নয়নে অপ্সরার মুখ পানে চাহিয়া প্রশান্তস্বরে কহিলেন, "দেখ সতি! ক্ষত্রিয়কুমার আবার নিরস্ত্র। তোমাকে জানি, সেই নিমিত্ত,—শুদ্ধ সেই নিমিত্তই অনুরোধ রক্ষা করিলাম। দেখিও, অস্ত্রের যেন অমর্য্যাদা হয় না।"

হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী ভূতলে জানুস্পর্শ করিয়া উপবেশন করিলেন। একবার দক্ষিণ হস্তে, একবার বামহস্তে তরবারিখানি ঝকিতে ঝকিতে ঘুরিতে লাগিল। অশ্বানন্দ দেখিলেন, বিভ্রাট। এই বাঘিনীর সম্মুখে বিক্রম প্রকাশ করিতে গেলেই প্রাণ হারাইতে হইবে। আনোয়ারের সাহসে সেই লোক দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছিল, পাঁচসাত পদ হটিল, সেদিকে আর যেন চাহিতে না পারিয়া আনোয়ারের দিকে চাহিয়া সভয়কণ্ঠে কহিতে লাগিল, 'উঃ! চক্ষু দেখিয়াছ? চক্ষে যেন আগুন জ্বলিতেছে! তলোয়ারে যেন আগুন জ্বলিতেছে। এ মেয়ে কে গো? তলোয়ার ঘুরিতেছে যেন বিদ্যুৎ। অথচ ঐ নারীমূর্ত্তি অচঞ্চলা। এ মেয়ে কে গো? আনোয়ার! আমি ত উহার সম্মুখে যাইতে পারিব না, ধরিয়া লওয়া শেষের কথা, চক্ষু দেখিয়া সম্মুখে ঘেঁসিতেই আমার গা কাঁপিতেছে।"

"তুমি এখন এমনিই হইয়াছ বটে! আমি মনে করিতাম, আগেকার মত সাহস তোমার আছে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বাতাসের আগে তুমি পড়িয়া যাও। আচ্ছা, তুমি না পার, পশ্চাতে আইস। আমি অগ্রসর হইব, আমার সঙ্গীরা অগ্রসর হইবে। একটা সামান্য স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিতে কতক্ষণ লাগে? তুমি পশ্চাতে আইস।"

"আসিতেছি। কিন্তু আনোয়ার! তুমি যাহাকে সামান্য স্ত্রীলোক

বিবেচনা করিতেছ, সে স্ত্রীলোক সত্য সত্য সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। তুমি যবন, গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া হিন্দু স্ত্রীজাতির অপমান করিবার চেষ্টা পাইতে পার, কিন্তু আমি যাহাই হই, যাহাই থাকি, তথাপি হিন্দুরক্ত আমার শরীরে আছে। আমি পারিব না।"

"না পার, চলিয়া যাও। আনোয়ার কাহারও সহায়তা চায় না। ইহারা দুইজনেও যদি পলায়ন করে, তথাপি তাহাতেও আমি সাহসশূন্য হইব না। একাই আমি ঐ মায়াবিনীকে ধরিব। একবার ত ধরিয়াইছিলাম, ফাঁদে ত ফেলিয়াইছিলাম, চক্ষে যেন ধাঁধা দিয়া পলাইয়া গেল। এবারে আর কিছুতেই আমার হাঁত ছাড়াইতে পারিবে না, ধরিবই ধরিব।"

বদনে ক্রোধলক্ষণ কিছুই লক্ষিত হইল না। সমান শান্তভাবে অচঞ্চলে তরবারি প্রদর্শন করিয়া বীরকুমারী ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "আনোয়ার। এখনও বলিতেছি, বৃথা আস্ফালন ত্যাগ কর। তুমি কাহারও সহায়তা চাও না, অগ্রাহ্য কথা। আমি বরং বীরেন্দ্ররক্ষিত হইয়াও বিনা সহায়ে তোমাদের মস্তক ভূমিতলে গড়াইয়া দিতে পারি। এতক্ষণ দিতেছি না কেন, তাহা তুমি না জানিতে পার, কিন্তু ক্ষত্রিয় বীরেরা জানিবেন, আমরা রণস্থলে আসি নাই। একজন বিপদাপন্ন রাজাকে বিপদ সময়ে দেখিতে আসিয়াছি। এ সময় যুদ্ধ করিবার সময় নয়। যদি একান্তই তোমার জীবনে ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে অগত্যাই কিম্বা অবশ্যই আমারে সে ভার কমাইয়া দিতে হইবে।"

আনোয়ার বখ্‌ত আর সহ্য করিতে পারিল না। সদর্পে অসি উত্তোলন করিয়া চঞ্চলগতিতে অপ্সরার সম্মুখে যেন লাফাইয়া পড়িল। দুই হস্তমাত্র অন্তর।—ভূপেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া সুদৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি ধরিলেন। আনোয়ার বখ্‌ত কটিবন্ধে অসি বিন্যস্ত করিয়া দুই হস্তে অপ্সরাসুন্দরীকে ধরিতে গেল। আত্মরক্ষার তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া তলোয়ারের উল্‌টা পিট দিয়া তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা তাহার উভয় হস্তেই সজোরে দুই আঘাত করিলেন। গ্রীবাদেশেও সেইরূপ প্রহার। অবশেষে বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তরবারি হস্তে আরো কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেলেন। বাতাসে

যেমন এরণ্ডবৃক্ষ কাঁপে, লোকটা সেই রকমে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অপ্সরাও কাঁপিতে লাগিলেন। আনোয়ার কাঁপিল আঘাতে, অপ্সরা কাঁপিলেন, ক্রোধে। হরবিলাসের হস্তে তরবারি ছিল, ভূপেশচন্দ্রের অনুমতি না লইয়াই তিনি সেই তলোয়ারের বাঁট দিয়া কম্পিত লোকের দুই পায়ে দুই আঘাত করিলেন। লোকটা তখন যেন অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল।—অশ্বানন্দ ছুটিয়া পলাইল। আনোয়ারকে তুলিবার জন্যই হউক, বীরকুমারকে আঘাত করিবার অভিলাষেই হউক, অথবা অপ্সরাকে ধরিবার মতলবেই হউক্, লেকায়ৎ আর হনুমান অসি বিস্ফারিত করিয়া বীরদর্পে সম্মুখে অগ্রসর হইল। "দূর হইয়া যা পাপকীট।" এইমাত্র সতেজ সম্বোধনে ভূপেশচন্দ্র স্বয়ং তাহাদের উভয়ের বক্ষে ঘন ঘন পদাঘাত করিতে লাগিলেন। টিপ্ টিপ্ করিয়া দুটো লোক দুই দিকে পড়িয়া গেল।—তিনজনেই অচেতন। ঘরের লোকেরা একদৃষ্টিতে অপ্সরাকে দেখিতেছিলেন, এখন এই ব্যাপার দেখিয়া যেন চিত্রকরা পুতুলের মত, কিম্বা পাষাণের গঠনের মত স্থিরনেত্র হইলেন। ভূপেশচন্দ্র তখন কি করিবেন, ক্ষণকাল মনে মনে আলোচনা করিয়া হরবিলাসকে কহিলেন, "ভাই! তুমি এক কর্ম্ম কর। বাদ্সাহের উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যদি কোন প্রতিনিধি এ সহরে উপস্থিত থাকেন, সন্ধান করিয়া তাঁহার কাছে যাও। গিয়া বল, রাজা বিরাটকেতুর জ্ঞান হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, মুক্ত করিয়া দাও, আমরা তাঁহাকে লইয়া যাইব। সেই প্রতিনিধি যদি চক্ষে দেখিতে চাহেন, আসিতে বল, সঙ্গে করিয়া আন। আমি এখানে রহিলাম, তুমি শীঘ্র যাও। রাজপুরুষের রাজক্ষমতার অজ্ঞাতে যদি আমরা তাঁহাদের আশ্রমরক্ষিত বাতুলকে লইয়া প্রস্থান করি, পলায়নের মত কাপুরুষের কার্য্য হইবে। রাজক্ষমতার অপমান করাও হইবে। সে কার্য্য ভাল নহে; তুমি যাও।"

কুমার হরবিলাস ভ্রাতার আদেশ পালন করিলেন। অপ্সরাকে শান্ত করিয়া, রাজারাণীগণকে স্থূল স্থূল কথা বুঝাইয়া দিয়া, চতুর্ভুজকে মধ্যস্থ রাখিয়া রাজা বিরাটকেতুকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! আপনার অনুতাপের কথা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি, আপনি পাগল হন নাই।

দুর্ভাবনাই আপনাকে এবম্প্রকার অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছিল। লোকেরা যেন কোন প্রকারে আপনাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। এখন সে অবস্থা দেখিতেছি না। আপনি এখন কি আমাদের সঙ্গে গৃহে যাইতে ইচ্ছা করেন? আমরা আপনাকে গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

বিরাটকেতু অস্থিরপদে কাট্‌গড়ার মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। ভূপেশ-চন্দ্রের কথা শুনিয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, বাষ্পপূর্ণলোচনে চতুর্দ্দিক অবলোকনপূর্ব্বক চঞ্চলভাবে উত্তর করিলেন, "আমার গৃহ নাই! আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাও? গৃহে যাইব না। কাহার জন্য গৃহে লইয়া যাইতে চাও ভূপেশ? গৃহে গিয়া আমি কি দেখিব? আমার আর কি আছে? আমার আর কে আছে? তোমার কাছে আমি বড় লজ্জিত আছি। তুমি রাজপুত্র, ঘুনাক্ষরে যদি তুমি এই কথা বলিয়া আমার কাছে পরিচয় দিতে, তাহা হইলে কখনই আমি তোমাকে অপ্‌সরা সম্প্রদানে অসম্মত হইতাম না। পৃথিবীর জনসমাজে দুটী দল আছে। এক দল দুরন্ত, একদল শান্ত। দুরন্তদল পাপী, শান্তদল সাধু। প্রতিহিংসাও সেই দুই দলে দুই ভাগে বিভক্ত। পাপীলোকেরা পরের মন্দ করিয়া প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়, সাধুলোকেরা অপকারীর উপকার করিয়া মনের আনন্দে প্রতিহিংসা সাধন করেন। মনের অনল অপরাধীকে পুড়াইয়া মারে। তুমি রাজকুমার এই শেষের দলের লোক। বুঝিয়াছি, বুঝিলাম, সংসারে তুমি সাধু। এই বাতুলালয় হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে তুমি সুখী করিবার অভিলাষ করিতেছ। সাধুলোকের যথার্থই ইহা প্রতিহিংসা। কিন্তু বৎস! আমার যেন হৃদয় নাই, লজ্জাকে কোথায় রাখিব, তোমার সাধুব্যবহারকে কোথায় রাখিব, তাহার স্থান দেখিতে পাইতেছি না। তোমরা যাও, আমি থাকি। কোথায় যাইব, যাইব না। এইখানে আসি-য়াছি, এইখানেই মরিব। মরিবার বয়স হইয়াছে, মরিবার সময় হইয়াছে, আর কেন ভূপেশ! আর কেন আমাকে বাঁচাইবার আকিঞ্চন পাও? বাঁচিয়া কি করিব? বাঁচিয়া কি দেখিব? মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছি, সব যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সুখ পুড়িয়া গিয়াছে, শান্তি পুড়িয়া গিয়াছে, গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে। গৃহের নাম শুনিলে আমার কর্ণবিবর যেন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত

ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যায়। তোমরা যাও। আমি আর কোথাও যাইব না। চতুর্ভুজ আমাকে বলিয়াছেন, অসংখ্য নরক, অনন্ত নরক। তবে আমি এখান হইতে বাহির হইয়া কি সুখ পাইব? যদি শান্তি থাকে, এইখানেই আসিবে, যদি নরক থাকে, এইখানেই থাকিবে। আমিও এইখানে থাকিব। গৃহ আমার কোথায়? গৃহে আমার আর কি সাধ? যদি আমি গৃহী হইবার অধিকারী হইতাম, তাহা হইলে বুদ্ধির দোষে কখনই আমার এমন দুর্দ্দশা হইত না।"

"কেন মহারাজ? কেন পিতা?"—নেত্রমার্জ্জন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "কেন পিতা? গৃহে তোমার কি নাই? আমারে তুমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাস; আমারে তুমি প্রাণের সঙ্গে স্নেহ কর; সেই আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি। সেই আমি তোমার চক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। বড় আদর করিতে পিতা, সেই আদরে অভাগিনী বঞ্চিতা হইয়াছিল। মনের দুঃখে সেই সুখের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর না,—না, আর না। সে সকল পূর্ব্বকথা আর তোমাকে মনে করিয়া দিব না। আর একবার গৃহে চল, আব একবার অপ্সরাকে প্রাণাধিকা অপ্সরা বলিয়া ডাক, সব আক্ষেপ, সব যন্ত্রণা আমি ভুলিয়া যাইব।"

"কে? কে? অপ্সরা! আমার অপ্সরাসুন্দরী আমাব সঙ্গে কথা কহিতেছে? মা! আমি ভাল হইয়াছি। উন্মাদব্যাধি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তুই আমার কাছে আয়। পূর্ব্বের কথা কি বলিতেছিলে মা? সেই দিনের কথা? যে দিন তুমি আমার কাছে আশ্রয় চাহিয়াছিলে, অপ্সরার মত স্নেহযত্নে যে দিন আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে চাহি নাই, সেই দিনের কথা? না—মা: তখনকার সে দিনের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। তখন যেন কে আমাকে পাগ্‌লা গুঁড়া খাওয়াইয়াছিল। তুমি পলাইয়া গেলে, একটা বেশ্যা—"

"না পিতা! সে কথা এখন আর মনে করিতে নাই। আমার তাহা মনেও নাই। একদিনের জন্যও তুমি আমারে অযত্ন কর নাই। আমি তোমারে মনে মনে সেই প্রকারেই পূজা করিয়াছি। দর্শন পাই নাই, অদর্শনেও নিত্য তোমার নাম স্মরিয়া ভগবানের কাছে সদাসর্ব্বদা, প্রার্থনা

করিয়াছি।--দিবসে,—সন্ধাকালে,—সর্ব্বরীযোগে,—জাগরণে,--স্বপ্নেও সদা-সর্ব্বদা আমি তোমার মঙ্গলকামনা করিয়াছি।"

"কি বলিলি অপ্সরা? আমার মঙ্গলকামনা? তুই মা যে দিন আমারে ছাড়িয়া গিয়াছিস্, সেই দিন অবধি আমার মঙ্গলকামনা ফুরাইয়া গিয়াছে। একটা বেশ্যা, একটা বিষধরী, একটা ভুজঙ্গিনী, জগৎকুমারী নাম ধরিয়া আমার সর্ব্বস্বধন নষ্ট করিয়াছে! তুচ্ছ ধনের কথা নয়, জ্ঞানধন পর্য্যন্ত!"

"না পিতা! তোমার জ্ঞানধন ত বিনষ্ট হয় নাই; তোমার জ্ঞানধন ত অপহৃত হয় নাই। গৃহে চল। আমি যাইতেছি; ভূপেশচন্দ্র যাইতেছেন, যাঁহারা যাঁহারা আমাদের পরমহিতৈষী মিত্র, অকপট স্নেহানুরাগে তাঁহারা সকলেই যাইতেছেন, তুমি গৃহে চল। তুমি জ্ঞানবান্, তুমি এক রাজ্যের রাজা, আমি তোমারে কি উপদেশ দিতে পারি পিতা? সংসারের সুখ-দুঃখ চক্রের মত পরিভ্রমণ করে। সুখের দিন আসিয়াছিল, সুখের মুখ দেখিয়াছি। আবার দুঃখের দিন আসিয়াছিল, দুঃখের চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। আবার আর একচক্রের আবর্ত্তন। সুখের দিন আসিয়াছিল, সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, দুঃখের দিন আসিয়াছিল, দুঃখের দিনও চলিয়া গিয়াছে। যদি আবার ভাগ্যে থাকে, তোমার গৃহে অবস্থান করিয়া আমি শান্তিকে আবার কোলে করিতে পারিব। আমি যদি না পারি, শান্তি আমারে কোলে করিতে পারিবেন। দিন যেন পালক পরিয়া পাখী হইয়া উড়িয়া যায়। ধরিতে যাই, ধরিতে পারি না। মহারাজ! সময় আসিয়াছে, গৃহে চল। তুমি আর আমি--"

দূরে একটা শব্দ হইল। তিন চারি জন লোক যেন একসঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, এই প্রকার শব্দ। ভূপেশচন্দ্র সেই দিকে চাহিলেন। আশ্চর্য্য দেখুন পাঠকমহাশয়, দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা এখানে উপস্থিত। বিরাটকেতুকে যদি পাগল বলা না হয়, তাহা হইলে তিনিও একজন ক্ষত্রিয় রাজা। তাহা ছাড়া দুটী তিনটী রাজকুমার। স্বর্গভূষণকে ও শশিকুমারকে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আরও বেশী। কিন্তু শব্দ শুনিয়া সকলেই যেন কাঁপিলেন, কেবল ভূপেশচন্দ্র কাঁপিলেন না, দয়ালকুমার ভয় পাইলেন না। অপ্সরা-সুন্দরী ত নয়ই না।

চারিজন প্রবেশ করিলেন। প্রথমে হরবিলাস, পশ্চাতে একজন পক্ক-কেশ, পক্কশ্মশ্রু, টুপী মাথায় যবন, তাঁহার পশ্চাতে আর দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ। হরবিলাস দক্ষিণদিকে দাঁড়াইলেন। সেই তিনজন আসিয়া ভূপেশচন্দ্রকে সেলাম করিলেন। যে মূর্ত্তি অগ্রে, সেই মূর্ত্তিকে ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখন এই স্থানে দিল্লীশ্বরেব প্রতিনিধি ?"

হাতে হাতে দাড়ীতে ঢেউ খেলাইয়া বৃদ্ধ মৌলবীসাহেব মাথা নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কারা ?"

"আমরা যাহারা হই, দিল্লীশ্বরের আদেশে রাজা বিরাটকেতু নামে যাঁহাকে বাতুল বলিয়া তোমরা অবরুদ্ধ করিয়াছিলে, তিনি এখন অবাতুল ; তিনি এখন গৃহে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত। আমরাও তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। তুমি কি এখন সে হুকুম দিতে পার ?"

"পারিতাম, কিন্তু দেখিতেছি, তিনজন জখমী। কে ইহাদিগকে জখম করিয়াছে, তাহার সন্ধান না হইলে, তাহার বিচার না হইলে, ভাল হওয়া পাগলকে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।"

"আর আমি যদি স্বীকার করি ?"—দর্প করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "আর আমি যদি স্বীকার করি, আমি যদি জখম করিয়া থাকি ? যদি মরে, আমি যদি তাহার জন্য দায়ী থাকিতে পারি, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিতে পার কি না ? আমি নারী, মন আমার বিভ্রান্ত হইয়াছে, রাজা বিরাট-কেতু বিপদে পড়িয়াছেন, যবন আমারে অপমান করিতে আসিয়াছে, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া কোন কথার আমি উত্তর দিতে পারিতেছি না। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমার আগুন আসিতেছে। ভূপেশচন্দ্র ! তুমি উহাদিগকে তাড়াইয়া দাও। রাজা বিরাটকেতুকে লইয়া আমি গৃহে যাইব, নিশ্চয়ই যাইব। যেখানে সংবাদ দিতে হয়, দেওয়া হইয়াছে। যে ভয় তুমি করিতে-ছিলে, তাহা ঘুচিয়াছে। এখন কেন কালহরণ করিয়া যবনের সঙ্গে বৃথা কলহ ? আর কেন ভূপেশ ? রাজা বিরাটকেতুকে লইয়া চল আজ আমরা নির্ব্বিবাদে ঘরে যাই।"

"চল তবে দেবী। তোমার কথায় কবে আমি বাধা দিয়াছি ? তোমার উপদেশের একচুল বাহিরে আমি চলি না। কিন্তু রাজার হুকুমকে অমান্য

করিতে আমার একটু ভয় হয়। বিদ্রোহী হইব, ইহা মনে করিয়া ভয় হয় না, কিন্তু রাজার অজ্ঞাতে, রাজার আলয় হইতে প্রস্থান করা আমি যেন মনে করি, দোষের কাজ।"

"আমিও মনে করি; কিন্তু রাজা যখন ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান রাখেন না, তখন মানুষ কেন বিনাদোষে বন্দী থাকিবে? রাজা থাকিলে ত রাজ্যের বিচার থাকিত। আমি যেন মনে করিতেছি, ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মোগলবংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।"

"তাহা হইলে কি হইবে অপ্সরা? যতক্ষণ বংশের রক্ত থাকে, নারী হউক, পুল হউক, নাবালক হউক, রাজা বলিয়া মান্য করিতে হয়। আকবর-সাহের রাজ্যে যদি এখন বালক রাজা থাকে, বালকের পরিবর্ত্তে যদি নারী রাণী থাকেন, তিনি বুঝিবেন, নিরপরাধীকে কোন প্রকারে দণ্ড প্রদান করা রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ।"

যে তিনজন অজ্ঞান হইয়া ছিল, ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে তাহারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। রাজপ্রতিনিধি তখন বিরাটকেতুকে মুক্ত করিবার অনুমতি দিলেন। ভূপেশচন্দ্রের দলবল রাজা বিরাটকেতুকে লইয়া বাতুলালয় হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবষষ্টিতম প্রবাহ।

সংসারের নিত্য যোগ।

"I loved Latty Hyde tenderly and dearly; but a fear that her heart was already the prize of Drumlaurig, had long fettered my tongue on one hand, while a knowledge of his mother's intentions with regard to * * * * * * fannedmy expectations to the utmost on the other."

JAMES GRANT.

বাতুলালয়ের ভীষণ দৃশ্য অন্তর হইয়াছে। রাজা মহানন্দ বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ বহুলোকে সমাকীর্ণ। এখানেও যথার্থ সুখের বার্ত্তা শ্রুতিগোচর

হইতেছে না। যাঁহারা যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব রজনীতে সুখে কি অসুখে, নিদ্রায় কি অনিদ্রায়, শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। পরদিন প্রভাতে সকলেই পুনরায় একটী প্রশস্ত গৃহে একত্র হইয়া উপবেশন করিয়াছেন। দুটী একটী কথা হইতেছে, কিন্তু অনেকেই অন্যমনস্ক। অপ্‌সরাসুন্দরীর সতেজ নয়ন মহানন্দ বাহাদুরের দিকে অচঞ্চলে বিনিক্ষিপ্ত। ভূপেশচন্দ্র কত দিন পূর্ব্বে কখনও পিতৃ-নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেন না। রাণী বিরজা-সুন্দরীকে নূতন দর্শন করিলেন, কিম্বা পূর্ব্বে কখনও দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও মনে করিলেন না। যে স্থান হইতে আসিয়াছেন, যদিও এই রাজ-বাটী ততদূর অসুখের স্থান নহে বটে, কিন্তু বাহ্যদর্শনে সুখস্থান বলিয়াও কেহ বুঝিলেন না। যাঁহার নিকেতনে উপস্থিত, তাঁহার বিমর্ষভাব দর্শন করিয়াই ভূপেশচন্দ্রের মনে অতিশয় অসুখ হইতে লাগিল। হরবিলাসও অসুখী হইলেন। সুচতুর চতুর্ভুজলালও তৎকালে সেই অসুখের,—সেই বিমর্ষ-ভাবের প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন না। একবার মহা-রাজের বদনে, একবার ভূপেশচন্দ্রের বদনে, একবার অপ্‌সরাসুন্দরীর বদনে, কৌতূহলাক্রান্ত চঞ্চল নয়ন অর্পণ করিয়া চপলাগতিতে আর আর সকলের নয়ন নিরীক্ষণ করিলেন। কোন কোন মুখে বিষাদচিহ্ন আঁকা, কোন কোন মুখে প্রফুল্লভাব সুলক্ষিত, কোন কোন মুখে দুই ভাবের কিছুই না। যেন সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া তাহারা উদাসভাবেই বসিয়া রহিয়াছেন।

বাতুলালয়ে নানাপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ মহা-নন্দ রাও অতিশয় উন্মনা হইয়াছিলেন। রঘুবরের দিকে ঘৃণাসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তিনি আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। যশেশ্বরী দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবি! তুমি পুণ্যশীলা রত্নগর্ভা। তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া বহু দিনের পর আমি কৃতকৃতার্থ হইতেছিলাম, কিন্তু বিধাতা এ সুখ আমার অদৃষ্টে অধিকক্ষণের জন্য লিখেন নাই বোধ হয়। দেবি! এই বিনশ্বর মায়াক্ষেত্র, মহাকণ্টকাকীর্ণ। দশদিকে পাপপরিবেষ্টিত। এ সংসারে থাকিতে নাই। আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি আত্মহত্যা করিব না।

আর্য্যবংশে যখন এত দূর জঘন্য পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর মঙ্গল নাই। জীবনে আমার বিড়ম্বনাজ্ঞান হইতেছে। যে দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, সেইদিকেই যেন লক্ষ লক্ষ মহাপাপের করাল মূর্ত্তি আমাকে বিষম বিভীষিকা দেখাইতেছে। এ পাপ-সংসারে আমি আর থাকিব না। বনবাসী হইয়া অবশিষ্ট জীবনকাল শেষ করিবার সংকল্প করিতেছি। চতুর্ভুজলাল! তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিলে। কার্য্যক্ষেত্রে যে, এত পাপ সম্ভবে,—ইহা জানিতাম না। চরাচরে পাপ চরিতেছে জানি, পাপীলোকেরা দণ্ড পাইতেছে, তাহাও দেখি। এক পাপের একদণ্ড ভোগ-করিয়া বহুপাপের পাপী পুনর্ব্বার তদপেক্ষা গুরুপাপে রত হয়, ইহা আমার জানা ছিল না। অনেক পাপী বিনাদণ্ডে পরিত্রাণ পায়, অনেক সাধু বিনা দোষে দণ্ড প্রাপ্ত হন, এই মায়াময় নশ্বর সংসারের এই পর্য্যন্ত খেলা। কর্ম্মক্ষেত্রকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা পুণ্যক্ষেত্র বলিতেন, এই দুর্দ্দিন আসিতেছে, দেখিতে পারিবেন না মনে করিয়াই হয় ত তাঁহারা অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিয়াছেন। এখন আমি বুঝিতেছি, তাঁহাদের পুণ্যক্ষেত্র নামের বর্ত্তমান কলুষিত নাম পাপক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করাই ভাল। আমি বনবাসী হইব। যদি ক্ষুধা পায়, বনতরুর কাছে ফল ভিক্ষা করিব। যখন পিপাসা হইবে, বন-নদীর কাছে অঞ্জলি পাতিয়া জল চাহিয়া লইব। যদি শীত হয়, তপনদেব দিবাভাগে আমার দেহ তপ্ত করিয়া দিবেন। বনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া হুতাশনে নিশাকালে শীত নিবারণ করিব। যদি গ্রীষ্ম হয়, পবনদেব আমাকে বাতাস করিবেন। বর্ষাকালে বৃক্ষপত্রেরা আমার মস্তকে ছত্র ধারণ করিবে। আমি বনবাসী হইব।"

যোগশাস্ত্রের এই কয়েকটী সার সার কথা বলিয়া মহারাজ মহানন্দ রাও সেই জনপূর্ণ রাজপ্রাসাদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গিয়া চতুর্ভুজলাল তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। হর্ষবিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে সকলকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "পাপী নিষ্পাপী, সকলে তোমরা দেখ, মহারাজ মহানন্দ বাহাদুরের বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। জ্ঞানবৈরাগ্য নয়, সংসারবৈরাগ্য। সকলে তোমরা শ্রবণ কর, মহারাজকে আমি গুটিকতক কথা বলি।"

সংক্ষেপে এইরূপ ভূমিকা করিয়া মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়পূর্ণ-বচনে চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "গুজরাটেশ্বর! যদি বিবেচনা কর, তোমার পক্ষে ইহাই ত এক প্রকার বনবাস। স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় অন্য দেশে আসিয়া বাস করিতেছ। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্রকে এত দিন চিনিতে না পারিয়া, মোহান্ধকারে আবৃত থাকিয়া সেই পুত্র-রত্নের অনিষ্টকামনায় বিপক্ষের কুমন্ত্রণাছলনে যাহার পর নাই নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছ। বনবাসে তুমি ইহা অপেক্ষা আর কি সাধু আচরণ করিতে পারিবে? মহারাজ! আমি তোমাকে তিরস্কার করিতেছি না। আমার মুখ দিয়া যে যে কথা বাহির হইতেছে, তোমার অন্তরাত্মাও হয় ত তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। মহারাজ! এগুলি আমাদের ঘরের কথা। ইহা ব্যতীত আরও কিছু আছে। বনবাসে সাধুলোকের কিছু দিন শান্তি থাকিতে পারে, বিশ্বমোহিনী মায়াকে তাঁহারা কিছুদিন ক্ষণে ক্ষণে কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিতে পারেন, পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও ইহাতে আমি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু মহারাজ! মহাজনবাক্যে মুক্তিনামে যে একটী কথা আছে, আমি ত বলি, তাহা কেবল অভিধানের কথা। মুক্তিশব্দের সত্য অর্থ নির্ব্বাণ। সংসারী লোকের যে নির্ব্বাণ আছে, ইহা স্বীকার করিতে আমার চিত্ত বড় সঙ্কুচিত হয়। সকলে তোমরা শ্রবণ কর। এই যে সংসারক্ষেত্র, ইহা একটী কারাগার। এ কারা-গারে অনেক কয়েদী বাস করে। কালপূর্ণ হইলে কেহ কেহ বাহির হইয়া যায়,—তাহার নাম মুক্তি।—কিন্তু কারাগার শূন্য হয় না। যেমন তেমনি পরিপূর্ণ। মহারাজ মহানন্দ রাও আশা করিতেছেন, বনবাসী হইয়া অন্তকালে এই কারাগার হইতে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু তাহা ত সম্ভব হইতে পারে না। কারাগারের বন্দী যে দিন কারাগার হইতে মুক্ত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়, সে দিন তাহার মনে কতই আনন্দ কতই স্ফুর্ত্তি, কতই উল্লাস। মেয়াদ ফুরাইলে যে দিন বহির্গত হয়, সে দিন তাহার মুখে আর হাসি ধরে না। কিন্তু আমরা কি করি! মাতৃগর্ভ-কারাগারে আমাদের দশ মাস মেয়াদ। যখন মেয়াদ পূর্ণ হয়, সে কারাগার হইতে বাহির হই, তখন আমাদের হাসি কোথায় থাকে? কাঁদিতে কাঁদিতে আসি;—কাঁদিতে

কাঁদিতে বাহির হই।—কেন কাঁদি, অজ্ঞানেও তাহা যেন মনে থাকে। এক কারাগারে ছিলাম, আর এক কারাগারে প্রবেশ করিলাম; আবার এই কারাগার হইতে অন্য কারাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। মৃত্যুকালেও অনেকের চক্ষে জল আইসে। আসিবার সময় ক্রন্দন, যাইবার সময়েও ক্রন্দন। তবে আর সুখশান্তির অবসর থাকিবে কখন? যাইতে হয়, আসিতে হয়, সংসার-কারারূপে বন্দী থাকিতে হয়, পলায়ন করা যায় না। কত দিন একস্থানে থাকিতে হইবে, তাহাও কেহই বলিতে পারেন না। মহারাজ মহানন্দ রাও বনে থাকিবেন, বৃক্ষলতার সহিত বন্ধুত্ব করিবেন, কিন্তু তাহাই কি স্থায়ী? তোমরা সকলে শ্রবণ কর, তোমরা সকলে মনে কর। ধর্ম্মপথেই থাক, কিম্বা অধর্ম্মপথেই চর, চিরস্থায়ী হইয়া একস্থানে কখনই থাকিবার উপায় নাই। প্রস্থানেরও কালাকাল নাই। ভাবনা কর, এক স্থানে আসিয়াছ, কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছ, কত দিন অজ্ঞান;—কতদিন যেন সজীব হইয়াও জড়পদার্থ। তাহার পর জ্ঞানোদয়। প্রতিবাসীর সহিত, বন্ধুবান্ধবের সহিত, ক্রমে ক্রমে একে একে আলাপ-পরিচয়। আহা! মায়াধামে মায়াময়ের কি আশ্চর্য্য মায়া! জ্ঞানোদয়ের পর মানুষে মানুষে সেই রূপ আলাপ-পরিচয় হইতে কত দিন অতীত হইয়া যায়, তাহা যে শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে, এমন আশা কেহই করে না। সময়ে দারপরিগ্রহ করা হয়, সন্তানসন্ততি জন্মে, আরও সেই মায়া সুদৃঢ় হইয়া বসে। বুকে বসিয়া বন্ধন করে। সেই বন্ধনে ক্রমে ক্রমে ভয় বৃদ্ধি হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন, বড়ই শক্ত। সেই শক্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ভবধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, এ কথা যখন মনে পড়ে, তখন প্রায় সকলেরই কলেবর কম্পিত হয়। লোকে কথায় বলিয়া থাকে, জীবের অন্তকালে যমদূত আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মহারাজ! আমি ত এ কথায় বিশ্বাস করি না। কথা বটে, কিন্তু মিথ্যাকথা। মানুষের ঘরে ঘরেই ভয়ানক ভয়ানক যমদূত আছে। বিবাহিতা পত্নী এক প্রধানা যমদূতী। পুত্রাদি স্নেহাস্পদ পরিবার,—পরিজনবর্গ এক এক ভয়ঙ্কর যমদূত, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ অসুখ হইলেই মানুষের যেন প্রাণ উড়িয়া যায়। কালপ্রাপ্ত হইলে কেহই কাহাকে রক্ষা

করিতে পারিবে না, জানে; তথাপি কতই ব্যয, কতই শঙ্কা সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া চিত্তকে নিয়তই আকুলিত করে। অপরকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, কালপ্রাপ্ত হইলে নিজের আত্মাকেও রক্ষা করা যায় না। ভক্তিপাত্র, স্নেহপাত্র, প্রিয়পাত্র, সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। সে প্রস্থান যে কি ভয়ঙ্কর প্রস্থান, স্নেহকাতর মন তাহা বিলক্ষণ অনুভব করে। প্রস্থান নিশ্চয়। কিন্তু সকল সময় তাহা মনে থাকে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে সাধুলোকে সংসারী হইতে পারিতেন না, দুষ্টলোকে পাপকার্য্যে রত হইত না। এই পৃথিবীতে পৃথিবীর রাজাদের যে সকল কারাগার আছে, সময়ে সময়ে সেই সকল কারাগারে অনেক কয়েদী প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা সকলেই যে, যথার্থ জ্ঞানকৃত পাপী, সকলেই যে প্রকৃত বদ্মাস্, তাহা হইতে পারে না। কোন কোন ভাল লোক হয় ত কোন কুচক্রে পড়িয়া কারাবাসী হন। কেহ কেহ বা অকারণেও হয় ত বিচারকের বুঝিবার দোষে, কিম্বা বিচারকের ভ্রমে কারাবাসী হন। তাঁহারা মুক্ত হইলে যতদিন বাঁচেন, সংসারে বিলক্ষণ সাবধান হইয়া চলেন। যাহারা যথার্থ পাপী, যথার্থ বদ্মাস্, তাহাদের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে, তাহারা যে দিন প্রাতঃকালে কারাগার হইতে বাহির হয়, সেই রাত্রেই হয় ত আবার চুরী কিম্বা ডাকাতী কিম্বা খুন করিয়া ধরা পড়ে। মহারাজ মহানন্দ রাও! আমার অপেক্ষা তোমার বয়ঃক্রম অধিক হইতে পারে, কিন্তু নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া নানাপ্রকার লোকের চরিত্রচর্য্যা দর্শন করিয়া বহুদর্শনে তোমার অপেক্ষা আমি সংসারজ্ঞানে বহুদর্শী হইয়াছি। সংসারকে পাপনিবাস বিবেচনা করিয়া, কারাগার সিদ্ধান্ত করিয়া তুমি বনবাসে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইতেছ, কিন্তু মহারাজ! মনে করা উচিত, পৃথিবীতে যে সকল স্থান আছে, সমস্তই কারাগার। বনবাস যে কারাগার হইতে বিভিন্ন স্থান, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বিষম ভ্রম। মানুষ মরিয়া কি হয়, মানুষে তাহা জানে না, ইহাও সত্য; পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মুনিঋষিরা বনে বসিয়া তপস্যা করিতেন, ইহাও সত্য; কিন্তু তাঁহারা কেহই চিরজীবী ছিলেন না, তাঁহাদিগকেও মরিতে হইয়াছে। মরিয়া কোথায় গিয়াছেন, কি হইয়াছেন, আমরা তাহা জানি না। নির্ব্বাণ

নামে অভিধানে একটী শব্দ আছে, মৃত্যুর পর মনুষ্য যে সেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহার কি কেহ সাক্ষী হইতে পারেন? এখনও,—এই পাপময় কলিযুগেও স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ পুণ্যক্ষেত্রে অনেক লোকের চক্ষের অগোচরে দুই একজন সাধুপুরুষ বাস করেন, সংসারের কোন বন্ধনই তাঁহারা রাখেন না; জগৎপিতায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া জগদীশ-ধ্যানে নিত্য নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু মহারাজ! এটী নিশ্চয় যে, তাঁহারাও মরিবেন। যোগে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়; অকপটে যোগাবলম্বী যোগী সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন, কিন্তু জীবন অনন্ত নহে, অক্ষয়ও নহে। জীবের পশ্চাতে পশ্চাতে নিত্য নিত্য মৃত্যু ঘুরিতেছে। যমরাজের অনেক নাম;—মৃত্যু, যম, কৃতান্ত কাল, শমন ইত্যাদি ইত্যাদি। নাম শুনিলে ভয় হয় ধর্ম্মরাজ নামটী শুনিলে ভক্তি হয়। কিন্তু সেই ধর্ম্মরাজের কার্য্য কি? জীবের পাপপুণ্যের বিচার করা। ইহা ছাড়া তাঁহার আর একটা কার্য্য আছে। জীবের কেশাকর্ষণ করিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। কখন কোন্ সময়ে মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত হইতে হইবে, কেহই তাহা জানেন না; অতিগুহ্য বিষয়। স্বয়ং মৃত্যুও সেই গুহ্যকথাটী বলিয়া দেন না। আসিলেই যাইতে হইবে। কোথায় যাইতে হইবে, যাইলে আবার আসিতে হইবে কি না, সংসারের এই তত্ত্বই অত্যন্ত দুরূহতত্ত্ব। তর্কশাস্ত্রে ইহার মীমাংসা নাই। শাস্ত্রে অনেক কথা লেখা আছে; অথচ যদি যুক্তির বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে শাস্ত্র হারিবে, যুক্তিই বলবতী হইবে। শাস্ত্র বলে, কোন কোন জীব জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্ব জন্মের সকল কথা তাহাদের মনে থাকে। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্রের এই বাক্যটী তাঁহারা হাস্য করিয়া উড়াইবেন। কিন্তু মহারাজ! পুনর্জন্মে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, উভয়েই গোলযোগ। মৃত্যুপুরী হইতে কেহ ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে কোন কথা বলে না। সুতরাং মৃত্যুর পর জীবের যে কি গতি, ইহা নিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবেই মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। তর্কবলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মরণান্তে পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশায়। আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, নূতন দেহও হয় না। কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুই নির্ব্বাণ। এই দুটীই শাস্ত্রের

কথা। কিন্তু পুনর্ব্বার সেই শাস্ত্রেই দেখা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব একবার একবার দেহত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ কুলে সমুদ্ভূত হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতি। মানুষ মরিয়া কুকুর হয়, শৃগাল হয়, শূকর হয়, কীটপতঙ্গ হয়, ইহাও শাস্ত্রে লেখা আছে। অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণের কথাও শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রে যখন এতদূর অনৈক্য, তখন কোন্‌টীতে বিশ্বাস, আর কোন্‌টীতে অবিশ্বাস করিবে বল দেখি মহারাজ? আমি আপনার মনের কথা কহিতেছি না। যাঁহাদিগের কথা লইয়া সংসার চলিতেছে, এগুলি তাঁহাদেরই কথা।"

"তাহা আমি জানি চতুর্ভুজ।" দুটী নিশ্বাস ফেলিয়া মুখখানি ভারি করিয়া মহারাজ মহানন্দ রাও কহিলেন, "তাহা আমি জানি চতুর্ভুজ! কিন্তু জীবের মুক্তি নাই বলিয়া যে কথা তুমি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছ, সে কথায় বিশ্বাস করিব না। তুমিও যেমন মান পুনর্জ্জন্ম, আমিও তেমনি মানি। যাহাদের কর্ম্মভোগ আছে, তাহাদেরই পুনর্জ্জন্ম আছে। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মত্যাগী, সংসারবিরাগী, তাঁহাদের যদি মুক্তি না থাকে, তবে দেহ শুষ্ক করিয়া, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, সাধুলোকে তত কষ্ট স্বীকার করিবেন কিসের জন্য? পুনরায় সংসার-কারাগারে ফিরিয়া আসিবার জন্য? ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে চতুর্ভুজ? একটা প্রবাদবাক্য আছে,—সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি যার দাসী। এ বাক্য কি অসার বাক্য? আমার বুদ্ধিতে আইসে, ইহা কখনই অসার হইতে পারে না। যতদিন সংসারে আমার ভক্তি ছিল, ততদিন সংসারে আমি জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছিলাম। ভাবগতিক দেখিয়া সংসারে আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বের ভক্তি চলিয়া গিয়াছে। সেই ভক্তি কেবল সেই ভক্তবৎসল বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ করিতেছি। তবে সেই মুক্তি কেন আমার হৃদয়ের ভক্তির দাসী হইবে না? তুমি আমাকে বুঝাইতেছিলে, তোমার কথা আমি শুনি। এখন আমি তোমাকে বুঝাইব। ভাব দেখি চতুর্ভুজ! শীতের হিমানী, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যতাপ, বর্ষায় অনন্ত বারিধারা, এই সকল সহ্য করিয়া অনশনে যাঁহারা দেহ শীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি মুক্তিকামনা করিতেন না? যেখানে কামনা আছে, সেখানে বস্তুও আছে।—নিদারুণ নিদাঘে চতুর্দ্দিকে

অগ্নি জ্বালিয়া, ঊর্দ্ধপদে, হেঁটমুণ্ডে, যাঁহারা কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি মুক্তিকামনা করেন নাই? তাঁহারা কি পুনর্ব্বার সুদীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে বাস করিবার কামনা করিয়াছিলেন?”

“এইবার মহারাজ তোমারে ঠকিতে হইয়াছে। কামনার সঙ্গে মুক্তির স্বতন্ত্র সম্পর্ক। যেখানে কামনা আছে, সেখানে মুক্তি নাই। কামনা হইতেছে কর্ম্মের সহচরী। যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। সত্য যদি মুক্তি থাকে,—আমি বিশ্বাস করি না,—সত্য যদি জীবের মুক্তি থাকে, সেই মুক্তি নিষ্কাম উপাসনার দাসী। তুমি মহারাজ! তবে বুঝি কামনাকে সঙ্গে করিয়া বনবাসী হইতে যাইতেছ? সময় ভাল নহে। আমোদপ্রমোদের সময় হইলে,—সত্য বলিতেছি,—আমোদপ্রমোদের সময় হইলে, সত্যই আমি হাস্য করিতাম মহারাজ! বনে যদি কামনা তোমার সঙ্গে যায়, তবে তোমাকে নিশ্চয়ই কারাগারে পুনঃপ্রবেশ করিতে হইবে।”

“হাঁ! বুঝিলাম, এ কথাটী কথা বটে। আচ্ছা, কামনাকে আমি ছাড়িয়া যাইব। নিষ্কাম হইয়াই আমি বনবাসী হইব। ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?”

“আছে মহারাজ! মানুষ নিষ্কাম হইতে পারে না। মুখের কথা নিষ্কাম, কাজে তাহা নিস্ফল। কথা কহিতে জানিলেই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। জ্ঞানবিশ্বাসে কিম্বা অজ্ঞানভ্রান্তিতে যাঁহারা মুক্তি চাহেন, তাঁহাদের মুখেই আমি শুনিয়াছি, মুক্তিকামনা। সমস্তই ভারতী। মহারাজ! ভারতী আমাদের সত্যনিত্য জ্ঞানদায়িনী। যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারা পূজা করে। যাহারা বুঝে না, তাহারা কেবল পাগলের মত হাসে। তুমি রাজা, বনবাসের বাসনা পরিত্যাগ কর। বনবাসে সুখ নাই, বনবাসে ধর্ম্ম নাই, বনবাসে মুক্তি নাই। সংসারেই তুমি সুখী, সংসারেই তুমি ভক্ত, সংসারেই তুমি জীবনমুক্ত। দেখ দেখি মহারাজ! যশেশ্বরী দেবীর সতীত্বগরিমা কতদূর। মনে কর দেখি মহারাজ! ভূপেশচন্দ্রের সত্যধর্ম্ম, বীরত্বধর্ম্ম, বীরত্বদর্প কতদূর! মনে কর দেখি মহারাজ! শ্রীমতী অপ্সরাসুন্দরীর স্বর্গীয় ধৈর্য্যমহিমা কতদূর! কথা ফিরাইয়া আনি।

আরো মনে কর দেখি মহারাজ! অর্চ্চনীয় ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা রঘুবরের চরিত্র-নীচত্ব কতদূর! কলুষিত কুলকলঙ্ক স্বর্গভূষণের নীচপ্রকৃতি কতদূত! বিরাটকেতুর পুত্র শশিকুমারের বীর্য্যবান আত্মা পাপ-সাগরের কতদূর অগাধজলে ডুবিয়া গিয়াছে! মনে কর দেখি মহারাজ! অপরিচিতা বিদেশিনী মহালক্ষ্মী,—কে জানে কি নাম পূর্ব্বে ছিল, কে জানে কাহার গর্ভে, কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, পাপ তাহাকে কতদূর অতল সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছে! মনে কর দেখি মহারাজ! জারজগর্ভজাতা পাপিনী কলঙ্কিনী মিহিরমোহিনী কোন্ পাপসাগরের বাড়বানলে পুড়িতেছে! শান্তসমুদ্রের শান্তসলিলের ভিতরে এক প্রকার আশ্চর্য্য আগুন জ্বলে। পাপীলোকের হৃদয়সমুদ্রেও সেইরূপ অশ্চর্য্য আগুন জ্বলে। মহারাজ! বনে জ্বলে দাবানল, সাগরে জ্বলে বাড়বানল। তুমি বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ, বনেও ত দাবানলে দগ্ধ হইতে হইবে। শান্তি-কাননে যাইতে চাও, সেখানেও ত শান্তি পাইবে না। বনের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি সাগরে প্রবেশ কর, সেখানেও ত দুর্জ্জয় বাড়বানল তোমাকে দগ্ধ করিবে! মহারাজ! বনবাসে প্রয়োজন নাই। বিরাগ জন্মিয়াছে, আচ্ছা, বেশ কথা, গৃহে বসিয়া পরমারাধ্য পরমধনের উপাসনা কর। শান্তি আপনি মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার হৃদয়ধামে বসিবেন, হৃদয়ে যদি অগ্নি থাকে, শীতল করিয়া দিবেন। বনবাসী হইবার প্রয়োজন কি রাজা? লোকের পাপ দেখিতেছ, ভয় হইতেছে? ভ্রম! সংসারকে যেমন আমি পুণ্যক্ষেত্র বলিতে পারি, তেমনি পাপক্ষেত্র বলিতেও পারি। এখানে পুণ্যও আছে, পাপও আছে। এখানে স্বর্গও আছে, নরকও আছে। শান্তি চাও, শান্তি পাইবে, অশান্তি কল্পনা কর, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। কেন রাজা তবে তুমি বনবাসী হইবে? পাপ তোমারও আছে, আমারও আছে। বনে প্রবেশ করিলে সেই পাপ যে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে? নলরাজা বনচারী হইয়াছিলেন, পাপমোচনের নিমিত্ত নহে,—দুরন্ত কলির ছলনে। রামচন্দ্র বনচারী হইয়াছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্য। যুধিষ্ঠির বনচারী হইয়াছিলেন, দুর্য্যোধনের উৎপীড়নে আর ধর্ম্মপালনের অনুরোধে।—কিন্তু তাঁহারা সকলেই পুনরায় সংসার-আশ্রমে

প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে বিবেচনা কর রাজা! চরম-কালে যে, বনবাস আশ্রয় করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বনে গমন করিলেই যে পাপতাপের শান্তি হইবে, এমন কোন কথাও নাই। বনে বনজন্তু বাস করে, তাহারা কি হিংসাবৃত্তি জানে না? বনবাসী ব্যাঘ্র, বনবাসী সর্প, ইহারা কি জীবহিংসায় বিরত? আর একটী স্থূল কথা মহারাজ! রাজা রঘুবর রাও, কুমার স্বর্গভূষণ, কুমার শশিকুমার, রাণী মহালক্ষ্মী, রাণী জগৎকুমারী, ইহারা যদি বনবাস আশ্রয় করে, তাহা হইলে কি ইহসংসারের সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে? এই কথায় যদি তুমি সায় দিতে পার, তাহা হইলে তোমার বনগমনে আমি আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিব না। আমি জানিতেছি, সে কথায় তুমি সায় দিতে পারিবে না। তুমি মহারাজ একেবারেই যে নিষ্পাপ, ইহা কি সাহস করিয়া বলিতে পার? শরীর ধারণ করিলেই কোন না কোন প্রকারে সেই শরীরে পাপ প্রবেশ করে। কেবল প্রভেদ এই যে, জ্ঞানকৃত আর অজ্ঞানকৃত।"

"চতুর্ভুজ! তুমি বিস্তর কথা কহিতেছ। একে একে আমি সমস্তই খণ্ডন করিতে পারি। কিন্তু আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। কিছুতেই আর প্রবোধ মানিতে চায় না। সংসারে থাকিয়া কিছুতেই আমি সুখী হইতে পারিব না। তুমি আমাকে যতই উপদেশ দিতেছ, আমার চিত্ত যেন ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তুমি বলিতেছ, মুক্তি নাই, তুমি বলিতেছ, নির্ব্বাণ নাই, সত্য যদি নাও থাকে, তথাপি বনবাসে আমি সংসারের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।" ব্যস্তভাবে এই কয়েকটী কথা বলিয়া রাজা মহানন্দ রাও সবিষাদে এক বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

"এ রহস্য মন্দ নয়!" ঈষৎ হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "এ রহস্য বড় মন্দ নয়! একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করেন! বাতুলালয়ে জনকতক লোকের পাপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তোমার এতদূর বৈরাগ্যো-দয় হইয়াছে, ইহা এক প্রকার কৌতুকের কথা। গৃহাশ্রমে থাকিয়া ভগবানে মন সমর্পণ করিলে শান্তিলাভ করিতে পারা যায় না, এরূপ মনে করাই

ভুল। মনের দোষ কোথাও শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ! আরও কিছু অধিক জানিতে হইবে। আমার মুখেই হউক, কিম্বা অপরের মুখেই হউক, আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তত্ত্ব তোমাকে শ্রবণ করিতে হইবে। তোমার পিতৃরাজ্য গুর্জ্জরের এখন কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাও জানিতে হইবে। দেবী যশোধরা অকারণ লোকলজ্জার অনুরোধে ভূপেশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার অগ্রে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্রের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাধাবন্ধনে এখন আর তোমাদের উভয়কেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। ভূপেশচন্দ্রকে তুমি অনেক যন্ত্রণা দিয়াছ, কিছুদিন পুত্রস্নেহের পবিত্র নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া মনের সুখে সংসারে বাস কর। ভূপেশচন্দ্রকেও পিতৃস্নেহ জানিতে দাও। সংসারে যাহাদিগকে সস্নেহভাবে, প্রিয়তমভাবে ভালবাসিতে হয়, তাহাদিগকে লইয়া যতদূর মানসানন্দ লাভ করা যায়, তাহা তুমি জানিতে পার, কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমার ভাগ্যে সেটী ঘটে নাই। অবসর আসিয়াছে, সম্ভাবিত বিপদাশঙ্কা ঘুচিয়াছে। যাহারা যাহারা শত্রুতাচরণ করিতেছিল, তাহাদের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে। তাহারা আর মাথা তুলিতে পারিবে না। ভাগ্যে তাহাদের যত শাস্তি আছে, অতি শীঘ্রই হউক, কিম্বা কিছু বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই তাহারা ভোগ করিবে। তাহাও তোমাকে দেখিতে হইবে। ঘটনা যদি সকল সময় চক্ষের নিকটেও না আইসে, শ্রবণেও শ্রবণ করিতে হইবে। তুমি গৃহবা—"

আরব্ধবাক্য সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে চতুর্ভুজ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, সেই গৃহমধ্যস্থ পাপীরা শিহরিয়া উঠিতেছে। তাহাদের বদন ক্ষণে ক্ষণে যেন বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বুঝিলেন, যে মন্ত্রে বনের সাপ জড়সড় হয়, সেই মন্ত্রের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি। সে দিকে আর অধিকক্ষণ নয়ন না রাখিয়া চতুর্ভুজলাল পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "তুমি গৃহবাসী হও। স্ত্রীপুত্র লইয়া কিছু দিন সংসারসুখ উপভোগ কর। গুর্জ্জরে চল, আমি কিছুদিন পূর্ব্বে গুর্জ্জরে গিয়াছিলাম। রাজ্য তোমার শত্রুশূন্য হইয়াছে। পতঙ্গের মত সেই শত্রুবংশের এক কুলসন্তান,—কুল কাপুরুষ সিংহাসনে বসিয়া আছে। অমাত্যবর্গ বিদ্রোহী। সৈন্যসামন্ত

বিদ্রোহী ;—তাহার জীবন সংশয়। কাপুরুষ বলিয়া কেহ তাহার গাত্রে করস্পর্শ করিতেছে না। সকলেই তোমার জন্য হায় হায় করিতেছে। তুমি জীবিত আছ, ইহাতেও সকলে সন্দেহ করে। প্রজারা তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর। আমি তথাকার কয়েকজন প্রধান লোককে সঙ্গোপনে তোমার শুভসংবাদ দিয়া আসিয়াছি। তুমি গুর্জ্জরে চল। বনবাসী হইবার বৃথা কল্পনা ভুলিয়া যাও; ছাড়িয়া দাও। কষ্টের অবসান হইবার সময় আসিয়াছে। আর কেন ইচ্ছা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিবার অভিলাষ করিতেছ ?"

মহারাজ মহানন্দ রাও কথা কহিলেন না। অবনত মস্তকে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অবশেষে বদন উত্তোলনপূর্ব্বক সাগ্রহে কিঞ্চিৎ ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চতুর্ভুজ! রাজ্য কি বৈরীশূন্য হইয়াছে সত্য ?"

দেবী যশেশ্বরী রাজ-রসনায় এই ক্ষুদ্র প্রশ্নমাত্র শ্রবণ করিয়া রাজার মুখের দিকে অপলকে সুস্থির নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। কুমার ভূপেশচন্দ্রও তদ্রূপ। মাতাপুত্রের চারি চক্ষু যেন সবিস্ময়ে কথা কহিল। কি আশ্চর্য্য! চতুর্ভুজের অত কথায় যাঁহার বৈরাগ্য দূর হইতেছিল না, গুজরাটরাজ্য শত্রুশূন্য, এই কথাটী শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার মন ফিরিয়া গেল!!!—ধন্য বিষয়বাসনা!!! ধন্য ধনসম্পদের মায়া!!! চক্ষুরা যাহা কহিল, মায়িক জগৎ-সংসারে তাহাই সত্য। যাঁহাদের চক্ষু, গুরুলোক বলিয়া তাঁহারা সাক্ষাতে সাক্ষাতে মুখামুখী কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের চক্ষুরা যাহা জানাইল, সেই মায়াই বড় মায়া। জগতে বিষয়ী সংসার পুত্রকলত্রপ্রভৃতি পরিজনগণের মায়ায় যত বিমুগ্ধ না হয়, অর্থের মায়ায়, অর্থের লোভে তদপেক্ষা শতগুণে মুগ্ধ হইয়া থাকে। সকল দেশের কবিরাই একটী বিষয়-বাসনার কথা বলেন! বিষয়-বাসনার সুবিস্তৃত অর্থ সংসার-বাসনা। সংসারে কল্পিত সুখের যত কিছু পদার্থ আছে, সবগুলি একত্র করিয়া বিষয়-বাসনার অর্থ করিতে হয়। ইহার মধ্যে ভোগলালসা, ঐশ্বর্য্যলালসা, আর বিষয়-লালসা;—এই তিনটী প্রধান। প্রধানের মধ্যেও প্রধান স্থানে আইসে, ঐশ্বর্য্যলালসা। রাজা মহানন্দ রাও গুজরাটের কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া যেরূপ সাগ্রহ প্রশ্ন

করিলেন, তাহা বিচিত্র নহে। সেরূপ প্রশ্ন প্রায় অধিকাংশ বিষয়ী লোকের মুখেই শ্রবণ করা যায়। অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। স্থূল কথায় এই টুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যে লোক মরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তিও যদি অর্থলাভের আশ্বাসপ্রাপ্ত হয়, অন্তকালেও তাহার পাণ্ডুবর্ণ বদনে, নিষ্প্রভ নয়নে, মূর্ত্তিমতী স্ফুর্ত্তি খেলা করে, বাঁচিয়া থাকিবার আশা জন্মে। রাজা মহানন্দ রাও মনে মনে বৈরাগ্য আনিতেছিলেন, রাজ্য-লাভের আশা তাঁহাকে যেন গগনমণ্ডল হইতে ভূমণ্ডলে টানিয়া আনিয়া ফেলিল। ইহা হইয়াই থাকে। এইরূপ আকর্ষণেই পৃথিবীর বৈষয়িক সংসার সমাকৃষ্ট।

মহারাজ মহানন্দ রাও পুনরায় চতুর্ভুজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যথার্থই কি আমার গুজরাটরাজ্য শত্রুশূন্য? সত্যই কি তুমি গুজরাটে গিয়াছিলে? সত্যই কি একজন কৃশ কাপুরুষ সেখানে রাজত্ব করিতেছে? সত্য কি আমার অরিপুত্র আমার সিংহাসনে উপবেশন করিতেছে? সত্য কি রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছে? সত্যই কি আমার জন্য প্রজালোক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে?"

"হাঁ মহারাজ! সমস্তই সত্য। স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। তোমার শুভ সংবাদ বলিয়া আসিয়াছি। তুমি চল। আমি তোমাকে লইতে আসি-য়াছি। অনেক দিন আসিয়াছি। এতদিনে কবে লইয়া যাইতাম, কেবল কতকগুলি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রহস্য-ব্যাপার দেখাইবার শুনাইবার জন্যই বিলম্ব করিতেছিলাম। কত ঘটনা হইয়াছিল, রাজা বিরাটকেতু পাগল হইয়াছিলেন, সেই কা—"

"না,—আমি পাগল হই নাই।" চীৎকার করিয়া রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "আমি পাগল হই নাই। কে বলে আমাকে পাগল? তুমি কে? অপ্সরা কে? জগৎকুমারী কোথায়? স্বর্ণভূষণ মরিয়াছে? তবে ওরা কে? কি নাম বলিতেছিলে? মনে করি করি, ভুলিয়া যাই। আসে আসে, আসে না। সূতিকাগৃহ, ধাত্রী, ছেলে, তাহাই ত দেখিতেছি। ভূত! ঐ ভূতটা এতক্ষণ কোথায় ছিল? ও বাবা! গাছের ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে! দেখিয়াছ! দেখিয়াছ! মুখ দেখিয়াছ! যেন একখানা

চাকা!' আব্‌লুসকাষ্ঠের চাকা! আবার কাপড় পরিয়াছে। কাপড় পরিয়া ভূত যেন আমাকে হাঁ করিয়া খাইতে আসিতেছে! ধর! ধর! ধর! ভূপেশ-চন্দ্র!—ওঃ!—আবার এ নাম শুনিতে হইল! দাসীপুত্র আবার এখানে আসিল? আমার পা কোথায়? অপ্সরা! তুই কি আসিয়াছিস্? রাঙা কাপড় পরিয়া আসিয়াছিস্? তোর মুখে রক্ত কে দিলে? কে তোরে মারিয়াছে মা? মিহিরমোহিনী? এ নাম আবার কোথাকার?—স্বর্গভূষণ? একলক্ষ মুদ্রা? ঐ আবার ভূত! তোমরা আমাকে ধরিতে পারিলে না? কাঁপিতেছি, পড়িয়া যাই! এ কি! যাই! যাই! গেলেম!! ভূত আমাকে ছাড়িল না! জগৎ—স্বর্গ—ভূ—অপ্‌স—"

রাজা বিরাটকেতু কম্পিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। মহাপরিশ্রান্ত অশ্ব বহু দূর হইতে আসিয়া যেরূপ ঘন ঘন হাঁফাইতে থাকে, তাহার মুখ দিয়া যেমন ফেনপুঞ্জ বিনির্গত হইতে থাকে, রাজা সেইরূপ হাঁফাইতে লাগিলেন; তাঁহার মুখ দিয়া সেইরূপ গাঁজা বাহির হইতে লাগিল। উত্তানচক্ষু হইয়া তিনি ইলিবিলি কত কি বকিতে লাগিলেন, একটী বর্ণও কেহ বুঝিতে পারিল না। তাহার পরেই এককালে বাক্‌শূন্য অচেতন।

অপ্সরাসুন্দরী রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "হায় হায় হায়! বাঁচাইতে পারা গেল না! কি ভাবিতে কি হইল! অত বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া আনা হইল, শেষে কি না আবার সেই? মহারাজ!"—রাজা মহানন্দ রাওকে সম্বোধন করিয়া অশ্রুমুখী কুমারী বাষ্পনিরুদ্ধ বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ! কি হইল!—ইহাঁকে বাচাইতে পারা গেল না! ইনি আমার স্নেহ ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ত ভুলিতে পারিলাম না। দেশে থাকি, বিদেশে থাকি, দূরে থাকি, নিকটে থাকি, এক দিনের জন্যও ত ভুলি নাই। অনেক যত্নে, অনেক আদরে, অনেক স্নেহে, এই রাজা আমারে পালন করিয়াছেন। সত্য কাহার কন্যা আমি, অজ্ঞান শিশুকালে তাহা জানিতাম না; ইনিই আমার জন্মদাতা পিতা, ইনিই আমার প্রতিপালনকর্ত্তা, আমিই ইহাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যা, ইহাই ত জানিতাম। এখনও পর্য্যন্ত যেন তাহাই জানি। ইহাঁকে বাঁচাইবার কি হইবে মহারাজ?"

"শান্ত হও মা! শান্ত হও! মূর্চ্ছা হইয়াছে, মৃত্যু নয়। একটু পরেই আবার চৈতন্য হইবে। ব্যাধির সমতা হয় নাই। অনেক প্রকার পাপের কথা, প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া বাতুলালয়মধ্যে অনুতাপ আসিয়াছিল, অনুতাপী হইয়া কতকগুলি জ্ঞানের কথা কহিয়াছিলেন; তাহাতেই আমরা মনে করিয়াছিলাম, প্রকৃতিস্থ। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সত্য সত্য আরাম হন নাই।"

আরাম আর হইতে হইবে না। মনে মনে ঘৃণার সহিত এই কথা বলিয়া স্পষ্টবাক্যে চতুর্ভুজ কহিলেন, "তখনই তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু খালাস করিয়া আনিতে হইবে, সেই জন্যই কথাটা চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনটে লোক ঘরে পড়িয়া অজ্ঞান ছিল, রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত, পাছে কোন দায়ে পড়িতে হয়, সেই আশঙ্কায় হুকুম লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। তোমরা শুনিতে পাও নাই, তোমরা জানিতে পার নাই, তোমরা দেখিতে পাও নাই, অলক্ষিতে জনান্তিকে আমি সেই বৃদ্ধ প্রতিনিধিকে কহিয়াছিলাম, ইহারা তিনজনে পরস্পর হাতাহাতি করিয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। দৌরাত্ম্য করিতেছিল, তজ্জন্যই তোমারে সংবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। মিথ্যা কথা কহিলাম, বৃদ্ধ কিছু ভালমানুষ, তাহাই বুঝিয়া গেল। জখমীরাও চৈতন্য পাইল।—অনায়াসে আমরা বাহির হইতে পারিলাম। অপ্সরাসুন্দরী বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, ভূপেশচন্দ্রও বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন। কাহারও গাত্রে অস্ত্রাঘাত করেন নাই। কাহারও গাত্রে রক্তচিহ্ন ছিল না, কাহারও গাত্রে অস্ত্রের দাগ ছিল না। সুতরাং বৃদ্ধের প্রত্যয়ে আমাদের অব্যাহতি।"

"ওগো! তোমরা এখন ও সকল কথা কেন বলিতেছ?"—অশ্রুনয়না কাতরা নায়িকা স্নেহময়ী অপ্সরাসুন্দরী একটু যেন উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "এমন বিপদসময়ে ওসকল কথা তোমরা কেন বলিতেছ? বাঁচাও, প্রাণ যদি জীবনের আশা আছে, বাঁচাইবার চেষ্টা পাও। মাথায় জল দাও, মুখে একটু জল দাও। চক্ষু যে বুজিয়া গিয়াছে! চক্ষে একটু জল দাও। আমি যেন দেখিতেছি, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে। দুই কস্ দিয়া ফেনা গড়াইতেছে। ওগো! তোমরা কর কি? আমার যে প্রাণ কেমন করিতেছে। তোমরা দেখিতেছ কি? কাহাকেও বল একটু জল আনিতে। আমি নূতন

বাড়ীতে আসিয়াছি, কোথায় জল থাকে, কোথায় কি আছে, কিছুই আমি জানি না। আমি সম্মুখে থাকিতে রাজার প্রাণ যাইবে, আমি তাহা চক্ষে দেখিব! হা! হা! হা হৃদয়! একদিনের জন্যও কি সুখী হইলাম না! বিদীর্ণ হইয়া যাও। জীবনে আর আমার প্রয়াস নাই। হা অদৃষ্ট!—হাঃ। বারম্বার এত অসহ্য যন্ত্রণা আ—"

"শান্ত হও মা! শান্ত হও! বাঁচাইবার উপায় আছে। পাগলের চৈতন্য অচৈতন্য—"

"মহারাজ! ও সকল কথা এখন আমার শুনিবার সময় নাই। প্রবোধ উপদেশ, সান্ত্বনা, উহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার কর্ণ এখন প্রস্তুত নাই। জল—জল—জল—"

ত্রস্তস্বরে উন্মাদিনীর মত এইরূপ কথা কহিতে কহিতে অপ্সরাসুন্দরী অচেতন রাজা বিরাটকেতুর বুকের উপর মুখ দিয়া পড়িলেন। আবার মুখের কাছে, কাণের কাছে, মুখ লইয়া পুনঃপুন ডাকিলেন, "পিতা! মহারাজ! পিতা! আমার কপালে কি এতই দুঃখ লেখা ছিল? আমি অপ্সরা, আমি ডাকিতেছি, চক্ষু খুলিয়া চাও। অভাগিনীর মুখ দেখ! এ জন্মে কি আর এ মুখ দেখিবে না পিতা? কথা কও। তুমি প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে তোমার অভাগিনী অপ্সরা পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিবে দেখ। অবাধ্য হইয়াছিলাম, পলায়ন করিয়াছিলাম, মনে তোমার বড় আঘাত লাগিয়াছিল। সেই পাপে আমার—"

একজন কিঙ্করী স্বর্ণঝারী পূর্ণ করিয়া সুশীতল বারি আনয়ন করিল। কাকচিল যেমন বালকবালিকার হস্ত হইতে ছোঁ মারিয়া মিঠাই কাড়িয়া লয়, অপ্সরাসুন্দরী সেইরূপে সেই পরিচারিকার হস্ত হইতে বারিপূর্ণ ঝারী আকর্ষণপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত রাজার মুখে, বুকে, নয়নে, মস্তকে, পরিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। রাজা একবার চাহিয়া দেখিলেন। দুখানি হস্ত একবার পার্শ্বদেশ হইতে বুকের উপর আনিয়া জড় করিলেন। আকাশের দিকে চক্ষু দিয়া জোড়করে মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "পরমেশ্বর! পাঠাইয়াছিলে, আবার গ্রহণ কর। আমি চলিলাম। সম্মুখে কে?"—বলিতে বলিতে চক্ষু দুটী আবার মুদ্রিত হইল।

"সম্মুখে আমি মহারাজ!—অপ্সরা আমি।—তোমার মুখে বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যেন তোমার মাথায় শান্তিজল দিতেছি। আমি তোমার অপ্সরা। চক্ষু কি আবার বিমুদ্রিত হইয়াছে? চাহিয়া দেখ দেখি, তোমার পাশে কে বসিয়া? ঘৃণা কর? আমার দিকে চাহিতে তোমার ঘৃণা হয়? আচ্ছা, পদতলে গিয়া বসি, চাহিয়া দেখিয়া, তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া কথা কও; তাড়াইয়া দাও; কিছুতেই আমি না বলিব না। তোমার মুখের কথা শুনিলেই আমার প্রাণ জুড়াইবে। আমি অপ্সরা।"

"অপ্সরা?—ফের্ ফের্ সেই নাম আমার কর্ণে?—দেবী বুঝি আমার সঙ্গে মায়াখেলা খেলিতেছেন। কেন মা। মৃত্যুকালে এমন তোমার খেলা? আমি মরি, আমি যাই, প্রাণ আইঢাই করিতেছে। খেলা করিতেছ? পাতালে নামিতেছ, ভূতলে উঠিতেছ, আবার হাসিতে হাসিতে গগনে উড়িয়া যাইতেছ, বিজলী বুঝি তুমি? অন্তকালে হৃদয়ে এসো মহাদেবী। আমি বাঁচিব না। বুঝিয়াছি। বাঁচিবারই বা কি সাধ? সব গিয়াছে, সব ফুরাইয়াছে; আমার অপ্সরা বিদায় হইয়াছে; যাহা কিছু ছিল, আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে! উঃ! আগুনের শিখা আকাশ পর্য্যন্ত উঠিতেছে। শিখার মধ্যে এক মূর্ত্তি! যেন সোণা দিয়া গড়া।—চক্‌মক্ করিতেছে! চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে। চাহি চাহি করিয়া চাহিতে পারিতেছি না। ধূমে ধূমে ধূমাকার! দেবি! মহাদেবি! ধূমের ভিতর এত আলো? আলোর ভিতর এত আগুন? আর চাহিব না, চাহিলেই চক্ষু পুড়িয়া যাইবে। বুক জ্বলিতেছে, কপাল জ্বলিতেছে, মাথা জ্বলিতেছে। ইহারা বুঝি জল দিয়াছিল? দেবি! সামান্য জলে কি এ আগুন নির্ব্বাণ হইতে পারে? তুমি হাসিতেছ, পশ্চিম হইতে দক্ষিণদিকে যাইতেছ, দক্ষিণ হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবার কোথায় লুকাইতেছ। দোলমঞ্চে যেন ঠাকুরের দোলাখেলা! একটু স্থির হইয়া দাঁড়াও, ভাল করিয়া একবার দেখি। দোল কি থামিতে পারে না? বিদ্যুতের খেলা! চক্ষের কাছে আগুন আসে, সেই আগুন নিবিয়া যায়, আবার দূরে গিয়া, রক্তবর্ণ হইয়া জ্বলে! এ দর্পণ আমাকে কে দিলে? দর্পণের ভিতর আগুন! প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড! সেই অগ্নিকুণ্ডমধ্যে এক প্রতিমা ছুটিয়া যাইতেছে, আর ছুটিয়া আসিতেছে। হা অদৃষ্ট! এ প্রতিমা আমি ধরিতে

পারিতেছি না। দাঁড়াও দাঁড়াও। কে তুমি প্রতিমা? প্রাণের প্রতিমা, হৃদয়ের প্রতিমা, নয়নের প্রতিমা! তুমি বুঝি সেই মহাদেবী কমলাসুন্দরী?"

"না পিতা!"—অত্যন্ত কাতরা হইয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "না পিতা! মূর্চ্ছাবশে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ। আমার প্রাণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। একবার চাহিয়া দেখ।"

পুনর্ব্বার মুখে চক্ষে বারি সিঞ্চন করিয়া সজললোচনে রাজার বদন নিরীক্ষণ করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "পিতা! কেন আর দুঃখিনীকে ভয় দেখাও? আমি কাঙ্গালিনী হইয়াছি, পাগলিনী হইয়াছি। ভূপেশচন্দ্রকে—"

"হো হো! দূর হইয়া যা! মরণসময় আর কেন যন্ত্রণা? আলো খেলিতেছে। বিদ্যুৎ হাসিতেছে, মেঘেরা ছুটিয়া ছুটিয়া অনন্ত আকাশকে আঁধার করিয়া দিতেছে। কিন্তু আমি ত আঁধার দেখিতেছি না। কমলাসুন্দরি! সৌদামিনীরূপে আসিয়া আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। ভূপেশচন্দ্র! কাহার মুখে, কাহার কথায়, কাহার নাম শুনিতেছি? তোমার মুখে মহাদেবী? না,—অভিসাপ!—কলঙ্ক!—কালভুজঙ্গ!—না—কমলা!—"

"ওগো! তোমরা কি দেখিতেছ? রাজা, রাজকুমার, রাজরাণী, এত সব উপস্থিত থাকিতে বিথোরে রাজা বিরাটকেতু প্রাণ হারাইবেন? রাজা বিরাটকেতু অজ্ঞান হইয়া আমারে চিনিতে পারিতেছেন না। আমি যদি এখন বুকে ছুরি মারিয়া মরি,—ভূপেশচন্দ্র! তুমিও কি ভ্রান্ত হইলে? একজন রাজা তোমাদের সকলের সম্মুখে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, ভূপেশ! ইহা দেখিয়াও কি তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেছ? সাত বৎসর! উঃ! সেই সাত বৎসর! অরি-চক্রে ঘুরিয়া, কত দিন কত সময়ে কত প্রকারে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছ। এক এক ক্ষেত্রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, ধৈর্য্যকে বুকে বাঁধিয়া কত প্রকারে আমারে বুঝাইয়াছ। এখন কেন বুঝাইতে আসিতেছ না রাজকুমার! আমি পাগলিনী হইয়াছি। রাজার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে। ভূপেশ! আমারে কাতরা দেখিলে তুমি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া সান্ত্বনা করিতে আসিতে। এখন তোমার সেই সান্ত্বনাহস্ত, সান্ত্বনাবাক্য কোথায় গেল? তুমিও কি এই বিপদসময়ে আমার প্রতি বাম হইলে?"

"শান্ত সিংহ যেমন ধীর মৃদুপদসঞ্চারে সিংহিনীকে কথা না কহিয়াও সান্ত্বনা করে, ভূপেশচন্দ্র সেইরূপে মৃদুনয়ন-ইঙ্গিতে অপ্সরাসুন্দরীকে প্রবোধের সঙ্কেত দেখাইলেন। সম্মুখে পিতা বর্ত্তমান, মাতা বর্ত্তমান, অধিক কথা কহিয়া বাচালতা প্রকাশ করিতে আপনিই সঙ্কোচ হয়। সঙ্কেত মাত্রই অপ্সরাসুন্দরীর হৃদয়ে আশ্বাস আসিল। আশ্বস্ত হইয়া রাজা বিরাটকেতুর নয়নপানে সতৃষ্ণনয়নে একবার চাহিলেন। দেখিলেন সেই মুদ্রিতনেত্র ঘোররক্তবর্ণে বিস্ফারিত। সেই আরক্তচক্ষে আবার সযত্নে জল ছিটাইলেন।

সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া রাজা বিরাটকেতু উঠিয়া বসিলেন। নয়নের রক্তিম আভা তখনও বিদূরিত হয় নাই। মনের যে ভ্রান্তি, তাহা তখনও বিদূরিত হয় নাই। অপ্সরাকে দেখিলেন, ভূপেশচন্দ্রকে দেখিলেন, রাজা রাণী, রাজকুমার যাঁহারা যাঁহারা সেখানে ছিলেন, সকলকেই দেখিলেন, কিন্তু যেন চিনিয়াও চিনিলেন না। বিভ্রান্তচিত্তে আপনা আপনি বকিতে লাগিলেন, —মাথা ঘুমাইতে ঘুমাইতে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, এত বঞ্চনা'ত ছিল না। আমার মহাদেবী ত এত বঞ্চনা জানিতেন না। তবে এ কি? সরু সরু রূপার তারের ন্যায় আকাশের পথে যেন মন্দাকিনীর দুগ্ধধারার মত ছোট ছোট ধারা, সম্মুখে ছায়াপথ, সেই পথে মহাদেবী যেন তীরের মত ছুটিয়া যাইতেছেন। ঐ, ঐ, ঐ দেখি! আবার দেখিতে পাই না। রাণী কমলাসুন্দরি! এত বঞ্চনা কোথায় শিখিয়াছ? কত দিন কাহার নিকট অভ্যাস করিয়াছ?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া অপ্সরা কহিলেন, "না পিতা! আকাশে কমলাসুন্দরী চলিয়া যাইতেছেন না। মেঘ নাই, চপলা-মালাও হাসিয়া হাসিয়া খেলিয়া যাইতেছে না, আমি অপ্সরা!"

"আবার অপ্সরা? যে নাম শুনিব না মনে করিয়াছি, সেই নাম আবার আমার কর্ণে? সুখে মরিতেছিলাম, জ্ঞান আমারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সে সুখে বাধা দিতে আসিয়াছে কে? চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি একবার যেমন দ্বাদশপুত্রনিধনে রাজস্থানের রাজপুত্রবংশের একজন রাজা গগনপটে চলাচলে মহামায়াপ্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন, আমিও

যেন সেইরূপ দর্শন করিতেছি। অপ্সরা নাম কেন পুনঃপুন শুনিতে হয়, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

সকলেই বিবেচনা করিলেন রাজা বিরাটকেতু পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উন্মত্ত হইলেন। অপ্সরাসুন্দরী রোদন করিতে করিতে যেন বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। অশ্রুনয়নে সকলের দিকে চাহিয়া কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন, "ইহাঁর এরূপ দুরবস্থা ত আর চক্ষে দেখিতে পারা যায় না। চতুর্ভুজ মহাশয়! শুনিয়াছি আপনি একজন বহুদর্শী সুচিকিৎসক। কোন প্রকার উত্তম ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রাজাকে যদি আপনি আরাম করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার কাছে আমি চীরজীবনের মত পরমোপকার-ঋণে ঋণী হইয়া থাকিব।"

রাজকন্যার কাতরতা দর্শনে রাজা মহানন্দ রাও অতিশয় আকুল হইলেন। অপ্সরাসুন্দরীর বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া তিনিও চতুর্ভুজলালকে ব্যগ্রতাসহকারে অনুরোধ করিলেন। চতুর্ভুজলাল উভয় অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া ক্ষণকালের জন্য সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অপ্সরাসুন্দরী অন্যান্য উত্তরসাধকের সহায়তায় সাধ্যমত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বিরাজসুন্দরী এই সময় মহারাণী যশেশ্বরীদেবীর সহিত মিলিতা হইয়া উৎকণ্ঠিতমানসে রাজা বিরাটকেতুর যথাসম্ভব সময়োচিত সেবাশুশ্রূষা করিলেন। রাজা যেন কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়া তাঁহাদের দিকে প্রশান্ত নয়ন বিনিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া মনে যেন হঠাৎ কি এক প্রকার অন্য ভাবের উদয় হইল, অন্যমনস্কভাবে অস্থিরচরণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঊর্দ্ধদিকে বাহু তুলিয়া মুষ্টবদ্ধ উভয় বাহু কম্পিত করিতে করিতে সেই প্রশস্ত গৃহের অনেকদূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন। আবার ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন, আবার অন্য দিকে দৌড়িলেন।

"ওগো! তোমরা দেখ কি? দেখিতেছ কি? ধর না! ধর ধর! আমার ভয় হইতেছে। ঐ ভাবে ছুটিতে ছুটিতেই পড়িয়া যাইবেন, পড়িলে আর বাঁচিবেন না! আমিও যেন পাগলিনী হইতেছি। তোমরা দেখিতেছ কি?"—পাগলিনীর মত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে

অপ্সরাসুন্দরী আলুলায়িত-কুন্তলে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। মুখে সেইরূপ সকরুণ বাক্য।—"আমি কি ধরিয়া রাখিতে পারিব? এই অবস্থায় ঐ শীর্ণশরীরেও রাজার আরও বল বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি কি ধরিয়া রাখিতে পারিব? তোমরা এসো না! নিকটে আসিয়া ধর না! রাজা যে ছুটিতে ছুটিতে কাঁপিতেছেন। এ সময় কি দেখিতেছ তোমরা? শীঘ্র আসিয়া ধর না!"

সত্যই ছুটিতে ছুটিতে বিরাটকেতু কাঁপিতেছিলেন। দেয়াল ধরিবার জন্য সেই কম্পিতচরণে ক্ষণে ক্ষণে ঝুঁকিতেছিলেন, যথার্থই যেন পড়িয়া যান যান, এমনি গতিক।

ভূপেশচন্দ্র শশব্যস্তে নিকটবর্ত্তী হইয়া যুগলবাহু বিস্তারে পৃষ্ঠদিক হইতে রাজাকে ধারণ করিলেন। মুখ ফিরাইয়া রাজা দেখিলেন, ভূপেশচন্দ্র। তাদৃশ বিভ্রান্ত অবস্থাতেও মনে ঘৃণা আসিল। চক্ষু দিয়া সেই ঘৃণার প্রতিবিম্ব যেন দেখা গেল। হাত ছাড়াইবার জন্য প্রয়াস পাইলেন, বহুচেষ্টা করিয়া ধস্তাধস্তি করিলেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের আক্রমণ ছাড়াইয়া লওয়া কি বিড়ালের সাধ্য? শার্দ্দূলবিক্রম ভূপেশচন্দ্রের সহিত তুলনায় রাজা বিরাটকেতু একটী ক্ষুদ্র মার্জ্জার মাত্র। শক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখের জোর বিলক্ষণ আছে। ভূপেশচন্দ্র তাঁহাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বস্থানে আনয়ন করিতেছেন, বিরাট মুখভঙ্গী করিয়া বিরাটকেতু কহিতেছেন, "ছাড়িয়া দে! কে তুই? তোর মুখ দেখিতে নাই। কেন স্পর্শ করিলি আমাকে? ছাড়িয়া দে! দাসীপুত্রের করস্পর্শে আমার দেহ অপবিত্র হইল! আমি স্নান করিতে যাই, ছাড়িয়া দে!"—মুখ ছুটাইবার সঙ্গে আর একবার যথাশক্তি বাহুতাড়নে বিকলে হুড়াহুড়ি করিলেন। হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র তাঁহাকে পূর্ব্বস্থানে লইয়া গিয়া বসাইলেন। চরণতলে অপ্সরা-সুন্দরী, একপার্শ্বে যশেশ্বরী দেবী, অন্য পার্শ্বে রাণী বিরজাসুন্দরী।

চতুর্ভুজলাল ফিরিয়া আসিলেন। হস্তে একপ্রকার প্রলেপদ্রব্যপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র কৌটা। নিকটে উপবেশন করিয়া রাজার বক্ষঃস্থলে আর ললাটে দুই তিনবার সেই প্রলেপটী লেপন করিয়া দিলেন। রাজার নাসিকা উপর্য্যুপরি কয়েকবার উষ্ণউষ্ণ নিশ্বাস উদ্গীরণ করিল। নাসারন্ধ্রের নিকটে হস্তার্পণ

রহিয়া চতুর্ভুজ অনুভব করিলেন, করতলে যেন উষ্ণ ধূমযুক্ত বহ্নি বর্ষিত হইল। অপ্সরার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা! এইবার মস্তকে কিছু অধিক পরিমাণে বারিসিঞ্চন কর। আমার ঔষধের কা[illegible]। যে উষ্ণতায় চিত্তবিকার জন্মিয়া প্রলাপ উচ্চারিত হইতেছিল, সে উষ্ণতা নির্গত হইয়া গিয়াছে। শরীরে আর সে উত্তাপ নাই। এখন মস্তক শীতল করিলেই সুস্থ হইবেন।"

অপ্সরাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের আদেশ পালন করিলেন। বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া রাজা কহিলেন, "আঃ"

অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার মস্তকে জলসেক করিয়া কহিলেন, "পিতা! একটু আরাম বোধ হইতেছে কি? একটু শয়ন করিবে কি? কিছু আহার করিবে কি? পিতা! তোমার চক্ষু দেখিয়া আমার বড় ভয় করিতেছে। এমন রক্তবর্ণ চক্ষু ত আমি আর কখনও দর্শন করি নাই। কিছু শীতল বস্তু আহার কর।"

সেই লোহিতবর্ণ নেত্র অপ্সরার দিকে ঘূর্ণিত করিয়া ধীরস্বরে রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "না মা! আহার করিব না। আহারে আমার রুচি নাই। ক্ষুধা নাই। কিছু আরাম বোধ হইতেছে। শয়ন করিব।"

অদূরে শয্যা প্রস্তুত ছিল, ছোট রাণী আর অপ্সরাসুন্দরী অতি যত্নে রাজাকে ধরাধরি করিয়া সেই শয্যায় লইয়া শয়ন করাইলেন। তখনও আবার সেই চক্ষের দিকে চক্ষুনিক্ষেপ করিয়া ভয়াকুলা রাজকুমারী শঙ্কিত-স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "ইস্ চক্ষু যে ক্রমে ক্রমে আরও রক্তবর্ণ হইতেছে"

অভয়প্রদানে [illegible] চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "ভয় নাই মা! ভয় নাই! মস্তকে অধিক জলসেক করিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে। শান্ত হইয়া একটু ঘুমাইলেই ও ভাব দূর হইয়া যাইবে।"

রাজা বিরাটকেতু শয়ন করিলেন। যশোমতী আর বিরজাসুন্দরী শয্যার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। অপ্সরাসুন্দরী নিঃশব্দে সেই ব্যাধিশয্যার পার্শ্বে বসিয়া অঞ্চলসঞ্চালনে রোগীর গাত্রে মৃদু মৃদু বাতাস দিতে লাগিলেন। রাজার তন্দ্রা আসিল। তিনি ঘুমাইলেন।

মহারাজ মহানন্দ রাও চতুর্ভুজলালকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া সকলকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আর এখানে গোলমাল করিয়া কাজ নাই। অপূর্ব্বসুন্দরী থাকুন, দুইজন কিঙ্করী থাকুক, আর যদি প্রয়োজন হয়, হরবিলাস থাকুক। আমরা চল, অন্য গৃহে গমন করি।"

মহারাজের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইল। যাঁহারা থাকিবার, তাঁহারা থাকিলেন; আর আর সকলে মহারাজের সহিত প্রাসাদের অন্য এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষটী ঐ পূর্ব্ব কক্ষের অদূরবর্ত্তী।

সপ্ততিতম প্রবাহ।

দুই বৎসরের লক্ষ!

সময়ের পাখা আছে, বাতাসের ভরে।
উড়ে উড়ে চলে যায় অনন্ত অন্তরে॥
ফিরিয়া আসে না আর যে যায় সে যায়।
কাহারো ক্ষমতা নাই ধরিবারে তায়॥
সম্পদ বিপদ সব সময়ের দাস।
সময়েতে নাসিকায় ফুরায় নিশ্বাস॥

ভারতরত্ন।

মহারাজ মহানন্দবাহাদুরের প্রাসাদে যে দিন উন্মত্ত রাজা বিরাটকেতু নিদ্রাভিভূত হন, সেই দিন হইতে দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালমধ্যে আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়কনায়িকাগণের এবং আনুসঙ্গিক অপরাপর স্ত্রীপুরুষগণের কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পাঠকমহাশয় পূর্ব্বে আভাস পাইয়াছিলেন, মহারাজ মহানন্দ রাও গুজরাট রাজ্যে যাত্রা করিবেন। তিনি গুজরাটে গিয়াছেন। পিতার সিংহাসনে পিতার মুকুট পরিধান করিয়া বহুদিনের পর পুনরায় অভিষিক্ত হইয়াছেন।

দেশপর্য্যটনকারী চতুর্ভুজলাল বার্ত্তাবহস্বরূপ হইয়া যে কৃশ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে হয় নাই। ভূপেশ-চন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কোনপ্রকার রাজকীয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশ্বাস দিয়া রাজসিংহাসন হইতে সুকৌশলে অবরোহণ করাইয়াছেন। কিন্তু সেই কৃশপুরুষ কোন্ পদের উপযুক্ত, পরীক্ষা না করিয়া নিম্নতন এক অমাত্যপদেই অবস্থিত রাখা হইয়াছে। উক্ত হইয়াছিল, প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ, রাজ্যরক্ষক সৈন্যসামন্ত, এবং রাজ্যবাসী সাধারণ প্রজাবর্গ রাজ্যমধ্যে প্রকৃত বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল। ন্যায়বান রাজা রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলে বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ইহা রাজতন্ত্রের বিশুদ্ধ নিয়ম। বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইয়াছে। রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত লোক সন্তোষলাভ করিয়াছে। মহারাজ এখন সেই মনঃকল্পিত সংসারবৈরাগ্য ভুলিয়া গিয়া সংসারসুখে, সংসারমায়ায় পুনর্লিপ্ত হইয়াছেন। দুই বৎসর ত গিয়াইছিল, আরও দুই মাস গেল। কার্য্যগতিকে,—ঘটনাচক্রে আমাদি-গকে আরও কিছু দূরে গমন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে।

সৌরাষ্ট্রের তপত্রীনদীতীরে একজন সন্ন্যাসী। এমন সন্ন্যাসী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। জটা নাই, শ্মশ্রু নাই, অঙ্গে ভস্ম নাই, কেবল সামান্য চিহ্ন পশুচর্ম্ম পরিধান, হস্তে ত্রিশূল, বদন গম্ভীর, রসনায় বিশ্বনাথের নাম। এ সন্ন্যাসীকে যাহারা দেখে, তাহারাই বিস্ময়াপন্ন হয়। কিন্তু কাহারও সঙ্গে তাঁহার কথা হয় না।—মৌন সন্ন্যাসী।—এ দেশের লোকেরা বিনা দর্শনেও বলিয়া থাকেন, যোগিঋষির বয়স অনুমান করা যায় না। শত-বর্ষীয় যোগীকে বিংশতিবর্ষীয় বলিয়া ভ্রম হয়। কিছু অধিক দূর অগ্রসর হইয়া আরও কতকগুলি ভক্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন, পঞ্চাশ বৎসর আমরা দেখিতেছি, ঠিক একরূপ। আমাদের অপেক্ষা যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহারাও দেখিয়া শুনিয়া গল্প করিয়াছেন, ঐ একইরূপ। যাঁহারা এপ্রকার প্রমাণ দিতে পারেন, তাঁহাদের বাক্যের, কিম্বা তাঁহাদের ভক্তির, কিম্বা তাঁহাদের বিশ্বাসের বিরোধী হইয়া আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তপত্রীতীরের এই সন্ন্যাসীটী নবীন। মুখে বাক্য নাই। অন্য কোন সময়ে মানবচক্ষের অগোচরে তিনি কি কার্য্য করেন,

মানবকর্ণের অগোচরে তিনি কি কথা কহেন, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। নদীতে স্রোত বহিতেছে। সেই স্রোতের দিকে চাহিয়া সুস্থিরনেত্রে সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন। কোন কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিষ্য থাকে; এ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কেহই নাই।

আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসীর চক্ষু কখনও আকাশের দিকে উঠিতেছে, কখনও পৃথিবীর দিকে নামিতেছে, কখনও চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই চক্ষু আমরা যেন আর কোথাও দেখিয়াছি দেখিয়াছি মনে হয়। আশ্চর্য্য। স্বাভাবিক চক্ষু অপেক্ষা এ চক্ষু যেন কিছু অধিক অস্থির। নদীর জলে যখন ছায়া পড়ে, তখন দেখায় সুস্থির। কিন্তু যখন চতুর্দ্দিকে ঘোরে, তখন সম্পূর্ণ বিভিন্নভাব। সন্ন্যাসী যখন নদীতীরে দাঁড়াইয়া, তখন অনেক বেলা আছে। ভগবান ভাস্কর তখন পশ্চিমে যাইতে যাইতে প্রচণ্ডকরে পৃথিবী পুড়াইতেছেন। সন্ধ্যা না হইলে, সন্ধ্যার অন্ধকার আবরণে জগৎসংসার সমাচ্ছন্ন না হইলে, এ সন্ন্যাসী যে কি সন্ন্যাসী, তাহা আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিব না। লুকাইয়া দেখা-শুনা আমাদের অভ্যাস নাই। কিন্তু এক এক সময়ে এমনি ঘটনা আইসে, লুকাইয়া না শুনিলে, লুকাইয়া না দেখিলে, সত্য চরিত্র বুঝিতে পারা যায় না। সূর্য্যকে আমরা বড় ভালবাসি। জগতের চক্ষু তিনি, তাঁহার উদয়ে বিশ্বসংসার আলো হয়, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়, স্নেহের পুতলীকে দেখিয়া কোলে করিয়া লইবার অবকাশ হয়। দিনকর অস্তগত হইলে সে অবকাশ থাকে না। জননীর ক্রোড়ে বালকবালিকা সুখে ঘুমাইতে পারে, কিন্তু স্নেহবতী জননী সে সময় বাহ্যনয়নে তাহাদের স্নেহময় প্রফুল্ল বদন দেখিতে পান না। অন্ধকারে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে। অন্ধকারে এই সন্ন্যাসীকে আমরা পরীক্ষা করিব।

বেলা গেল। সন্ধ্যা আসিল। নক্ষত্র জ্বলিল, জোনাকী জ্বলিল। কৃষ্ণপক্ষ কি শুক্লপক্ষ, মনে পড়ে না, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। নদীতীর হইতে নবীন সন্ন্যাসী একটী বনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কত দূরে বন, সন্ন্যাসী জানিতেন, আমরাও জানিলাম। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী একখানি পাথরের উপর বসিলেন। একজন লোক তাঁহার

নিকটে আসিল। কি পরামর্শ বলিয়া দিয়া লোকটীকে তিনি বিদায় করিলেন। তখন বুঝা গেল, সন্ন্যাসী কথা কহিতে জানেন। আগ্রহ বাড়িল; কৌতূহল বাড়িল। মাথার উপর বৃক্ষপত্র, চারিদিকে বৃক্ষঘেরা, আবরণ বৃক্ষলতা। সেই লতান্তরালে লুকাইয়া তিনি একটী গীত ধরিলেন। সন্ন্যাসীরা যে তেমন গীত গাইতে পারেন, যাঁহারা শুনিবেন, তাঁহারাই চমৎকৃত হইবেন। সন্ন্যাসী গাইতেছেন এক গীত।

গীত।

"কেন মন এমন করে, তারি তরে। (কেন মন এমন করে)
বিশ্বাসঘাতক সেই, প্রাণ সমর্পিল পরে!
পুরুষ পরেশ বলি, সঁপিলাম মনপ্রাণ,
প্রাণ-মন সমর্পিয়া প্রাণ হয় অবসান,
জনমের মত বুঝি সে ছেড়ে গিয়াছে মোরে॥"

তখন আসিয়া চৈতন্য দেখা দিল। মনে মনে বুঝা হইল, এ সন্ন্যাসী বিরহের সন্ন্যাসী। প্রেমব্রতে ব্রতী হইয়াছিল, হতাশ্বাস হইয়া বনবাসী হইয়াছে। সংসারধামের অনেক সন্ন্যাসীই এইরূপ। বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া সন্ন্যাসীগণকে যাহারা ভক্তি করে, চক্ষু থাকিতেও তাহারা অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও তাহারা বধির।

মনে আর এক সন্দেহ প্রবল। গীতের তাৎপর্য্যে বুঝা গেল, পুরুষের উদ্দেশ, পুরুষের প্রতি বিরাগ। এ সন্ন্যাসী হয় ত নারী হইতে পারে। নারী কি পুরুষ, অসন্দেহে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল না; কিন্তু অন্ধকারে কতক্ষণ থাকা যায়? যদি সত্য সন্ন্যাসী হন, থাকুন। যদি ভণ্ডামী হয়, থাকুক। এই রাত্রে গুজরাটে যাইতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসীর সহিত যে লোকের পরামর্শ হইযাছিল, কোথা হইতে সেই লোক আবার আসিয়াছে। সন্ন্যাসীর বিরহগীত সেই লোকের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। কাননের বৃক্ষলতারা সেই গীত শ্রবণ করিয়াছিল। বাতাসে বাতাসে সেই গীতের সমস্ত কথাগুলি উড়িয়া উড়িয়া

আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, একটী লোক। পরিচিত কি অপরিচিত, দৃষ্টপূর্ব্ব কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, সে তত্ত্ব তখন মনে আসিল না। উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কথা শুনিয়া, কথা কহিয়া বিদায় করিলাম, আবার তুমি এখানে কি নিমিত্ত ?"

লোকটা কদাকার। বর্ণ মিস্ কালো; শূকরের মুখের মত মুখের অগ্রভাগ সরু; শূকরের লোমের মত মাথায় খাট খাট চুল। নাক্‌টা চ্যাপ্‌টা। চক্ষু ছোট। ঠোঁট পুরু। সেই পুরু ঠোঁট মাঝে মাঝে কালো কালো দাগে রঞ্জিত। দুই গালে যেন আগুনের ফোস্কা! দৃষ্টিতে যেন সমস্ত দুষ্টরিপু জাজ্বল্যমান। ক্ষুদ্র চক্ষে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া সেই লোক উত্তর করিল, "তুমি চুপ করিয়া থাক। আমার আসিবার নিমিত্ত আছে। নিমিত্ত না থাকিলে ফিরিয়া আসিতাম না। তোমাকে আমি চিনিতেছি। তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। চুপ করিতে বলিতেছ, আবার কথা আছে বলিতেছ, চুপ্ করিয়া থাকিলে তোমার কথার উত্তর করিব কিরূপে ?"

সরু মুখ আরও সরু করিয়া লোক কহিল, "আজমীরে যেমন করিয়া কথা কহিয়াছিলে, তেমনি করিয়া।"

"ওঃ! অনেক দিনের কথা মনে করিয়া দিলে। তুমি বুঝি সেই লোক ? তখন যেমন সকলে জানিয়াছিলেন, তুমি ডাকাত, তখন যেমন সকলে বলিয়াছিলেন, আমারে ডাকাতে ধরিয়া লইয়া গেল, এখন আমি নিঃসহায়, তোমার পরিচয় জানি না, কিন্তু আকৃতিতে চিনি। যেখানকার লোক তুমি, সেইখানে চলিয়া যাও, আমারে আর অধিক ভয় দেখাইও না।"

"ভয় পাইতেছ মিহিরা ?"

প্রস্তরাসন হইতে উঠিয়া সর্পগতিতে দশহস্ত দূরে গিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমার চক্ষের নিকটে তুমি আর একদণ্ডমাত্রও থাকিও না। বনবাসী সন্ন্যাসী আমি,—আমার সঙ্গে এই পশুচর্ম্ম ছাড়া,—দেখিতেছ, গলা অবধি পা পর্য্যন্ত পশুচর্ম্মে ঢাকা,—এই পশুচর্ম্ম ছাড়া আমার সঙ্গে আর কোন সম্বল নাই। তুমি ভুলিতেছ, কাহাকে দেখিয়াছিলে, কাহার নাম শুনিয়া-

ছিলে, সেই কথা মনে করিতেছ। কাহার নাম মিহিরা? তুমি বিদায় হও। তোমারে দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে।"

"ভয় হইতেছে কি জন্য? আমি তোমাকে মনের কথা বলিয়াছি। তুমি ভ্রান্ত হইয়া ডাকাতের কথা বলিতেছ, চিনিতে পারিতেছ না। সমস্তই মিথ্যা কথা। তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, ইহা যেমন মিথ্যা, দুষ্ট চতুর্ভুজ যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহাও সেইরূপ মিথ্যা। মহালক্ষ্মীর গর্ভে অশ্বানন্দের ঔরসে তোমার জন্ম হয় নাই। তোমার নাম মিহিরমোহিনী, আমি তোমাকে জানি। শশিকুমার তোমাকে ভুলাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, তুমি ভুলিয়া যাও নাই, তাহাও জানি। জগৎকুমারী নামে পাগল বিরাটকেতু তোমাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ। নবীন সন্ন্যাসি! মন দিয়া আমার কথা শোন। ছদ্মবেশ আমার কাছে ছাপা থাকে না। আমি নিজে অনেক ছদ্মবেশ ধরিতে জানি। শিখিয়াছি অনেক। স্বর্গভূষণের সঙ্গে তুমি পলায়ন করিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি। কিন্তু মিহির!—"

"তুমি কে গো! আমার কাছ এতদূর বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ কি জন্য? চলিয়া যাও, আমি বনবাসী সন্ন্যাসী—"

"কেন মিহির! তুমি বনবাসী সন্ন্যাসী হইবে কেন? স্বর্গ হইতে যেন কথা আসিতেছে, তুমি পরম পবিত্র। বিরাটকেতুর পুত্র মহাপাপী। বিরাটকেতু পাগল, স্বর্গভূষণ ধূর্ত্ত। তাহাদের সঙ্গে তোমাদের কোন সংশ্রবই ছিল না। তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্রকুমারী মিহিরমোহিনী। তুমি আমারে বরণ কর। আমি তোমারে আদরিণী করিয়া, রাজরাণী করিয়া পরমযত্নে রক্ষা করিব।"

এই সকল ছলের কথা শুনিয়া নবীন সন্ন্যাসী ভূমিতল হইতে ঊর্দ্ধে লম্ফ পরিত্যাগ করিয়া তর্জ্জনে গর্জ্জনে কহিলেন, "এখনও বলিতেছি, দূর হইয়া যাও! ডাকাত তুমি, আমি তোমারে জানি। আমার সম্মুখে ও সকল কথা কহিও না। আমি তোমারে—"

"কেন মিহিরা? এখানে বুঝি আর কেহ আছে? তাহার ভয়েই বুঝি আমাকে তুমি অগ্রাহ্য করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ? কে আছে এখানে? কাহার খাতিরে তুমি,—" ঘেঁসিয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া সেই

লোক পুনর্ব্বার কহিল, "মিহিরমোহিনি! তাহার খাতিরেই বুঝি মনের ভাব লুকাইয়া তুমি আমাকে ডাকাত বলিতেছ? এখানে তোমার কে আছে?"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া নবীন সন্ন্যাসী কহিলেন, "বলিতেছি, চলিয়া যাও! আমার চক্ষের নিকটে আর দাঁড়াইয়া থাকিও না। আমার সব আছে। বৃক্ষ আছে, লতা আছে, বৃক্ষপল্লবেরা বৃক্ষশাখায় বিদ্যমান আছে, সাপ আছে, বাঘ আছে, বনজন্তু সকলেই আছে। অন্ধকার বনে তাহারা ছাড়া আর কাহারা থাকিবে? আমি মিহিরমোহিনী নই। আমি সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গে অন্য লোকের কথা হইতে পারে না। তুমি ডাকাত, রাজা-রাজড়াকে ধর। আমার কাছে কি পাইবে? পশু-চর্ম্ম বসন, এই লও, খুলিয়া দিলাম।"—চঞ্চলভাবে ছদ্মপরিচ্ছদ ফেলিয়া দিয়া, এলোকেশী মিহিরমোহিনী অন্ধকার বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটা খানিকদূর পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া গাছে গাছে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিল। কপালে রক্তপাত। দুই হাতে রক্ত ঢাকা দিয়া ক্রোধে গম্ভীরে কহিল, "আচ্ছা! আজ আমি পরীক্ষা করিব মিহিরা! কেমন তুই সন্ন্যাসী। কে তোরে রক্ষা করে! আমার এত উপাসনা, এত আরাধনা কাননের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল! বিবাহ করিব বলিলাম, আদরিণী করিব বলিলাম, রাজরাণী করিব বলিলাম, গ্রাহ্য হইল না? আচ্ছা! দেখিব, সন্ন্যাসীবেশে মিহিরমোহিনী কত দিন সৌরাষ্ট্র নগরে লুকাইয়া থাকিতে পারে!"

কথাগুলি বাতাসে উড়িল। কোথায় বা সন্ন্যাসী, কোথায় বা মিহিরা, কোথায় বা সেই আস্ফালনকারী লোক। নিশার অন্ধকারে সমস্তই লুকাইয়া গেল। পাঠকমহাশয়! অন্ধকারে অন্ধকার বনে থাকিয়া আর কি ফল? আসুন, গুজরাটে যাত্রা করি। তথাকার রাজভবনে কি কি দৃশ্য উপস্থিত আছে, দর্শন করা আবশ্যক।

গুজরাটের রাজনিকেতনে পাঁচটী লোক। তাঁহারা চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। মহারাজ মহানন্দ রাও নূতন নাম ধারণ করিয়াছেন। সে নাম মহারুদ্রচাঁদ। পাত্রমিত্রপরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ মহারুদ্রচাঁদ যুক্তি করিতেছেন, বিরাটকেতুকে বাতুলাগারে পুনঃপ্রেরণ করা উচিত কি না?

ভূপেশচন্দ্র কাহতেছেন, "গৃহে যদি আমরা কোন প্রকারে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি, তাহা হইলে কেন আর যবনের আশ্রমে প্রেরণ কবিব ?"

মহারাজ কহিতেছেন, "তুমি জান না ভূপেশ ! অনেক পাগল আত্মহত্যা করে, অনেক পাগল অনাহারে মরে, অনেক পাগল বুক ফাটিয়া মরিয়া যায়। গৃহে রাখিলেই বিপদ আছে।"

"না মহারাজ ! কোন বিপদ নাই। একটী বিশেষ কারণে যাহারা উন্মাদগ্রস্ত হয়, কারণ বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাহারা ভাল হইয়া থাকে। রাজা বিরাটকেতুর পাগল হইবার কারণ শুদ্ধ টাকা। অপ্সরা নয়, জগৎ-কুমারী নয়, স্বর্গভূষণ নয়, আমি না, শুদ্ধ কেবল টাকা। বিবাহের অঙ্গী-কারের মূল্য একলক্ষ। মোকদ্দমার দাবী বিংশতি সহস্র। এই পাগল রাজাকে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে পারিলেই এক দণ্ডের মধ্যে ইহাকে আরাম করিয়া তুলিতে পায়া যায়।"

প্রকাশ করা আবশ্যক, গুর্জ্জরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া নূতন নামের মহারাজ মহারুদ্রচাঁদ,—পুরাতন নামে মহারাজ মহানন্দ রাও সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদেরই মধ্যে রাজা বিরাটকেতু একজন। বিধাতার সংঘটনের মত মানুষের সঙ্ঘটন আছে। যাঁহাদের সঙ্গে প্রয়াগে দেখা হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক গুজরাটে আসিয়াছেন। সকলে নয় ; শশিকুমার নাই, স্বর্গভূষণ নাই, জগৎকুমারী নাই, রঘুবব রাও নাই, অশ্বানন্দ নাই, মহালক্ষ্মীও নাই। জগৎকুমারীর ছোট ছেলেটীও নাই। বাকী সকলে অতিথি।

একটী স্বতন্ত্র গৃহে বিরাটকেতু আর অপ্সরাসুন্দরী। বিরাটকেতু কহি-তেছেন, "কাহার জন্য আমি আর বাঁচিব ? কাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না !—আমি মরি। আমাকে তোমরা বিদায় দাও। চারিদিকে আমি আকাশ দেখিতেছি। একদিন রাজা ছিলাম, সে দিন আমার ফুরাইয়া গিয়াছে। কি লইয়া আর আমি সংসারী হইব ?"

"কেন মহারাজ !" অশ্রুপূর্ণনয়নে অপ্‌রাসুন্দরী কহিলেন, "কেন মহারাজ ! কেন পিতা ! কি লইয়া তুমি সংসারী হইবে, এ কথা বলিতেছ কেন ? তোমার কি নাই ? আমি আছি, অপ্সরাসুন্দরী আমি, তোমার

আদরিণী কন্যা আমি,—আমি আছি, তোমার প্রিয়তম পুত্র শশিকুমার আছেন, তোমার আদরিণী মহিষী জগৎকুমারী আছেন, তোমার আদরের পুত্রবধূ মিহিরমোহিনী আছেন, লক্ষটাকাদাতা স্বর্গভূষণ আছেন, তবে তোমার কি নাই মহারাজ ?"

"তুই দূর হইয়া যা অপ্সরা ! আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, একাকী থাকিব। যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হয়, নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। সব গিয়াছে, কাহা-কেও আমি আর চাহি না। একবার আমার কাণে আসিয়াছে, জগৎ-কুমারীর নাম মিহিরমোহিনী। সেই মিহিরমোহিনী আমার পুত্রবধূ ? এ কথাও আমাকে শুনিতে হইল ! অপ্সরা ! আঃ ! অপ্সরা ! অনেকদিনের বুক জুড়াইবার ধন ! তুই মা কেন এখন আর আমাকে ক্ষণে ক্ষণে জ্বালাইতে আসিতেছিস ?"

"না পিতা ! জ্বালাইতে আসি নাই। তোমার সব আছে। ক্ষমাকে তুমি হৃদয়ে ডাকিয়া আন। তুমি ভাল হইয়াছ।—দুষ্টব্যাধি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ইহাই আমার মঙ্গল। অপ্সরার মত হিতৈষিণী তোমার আর কে আছে মহারাজ ? সকলে তোমাকে ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু অপ্সরা ভক্তি করিবে। সকলে তোমাকে শত্রুজ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু অপ্সরা তোমাকে মিত্র বলিয়া ডাকিবে। পিতা ! তুমি আরাম হইয়াছ, দুঃখিনী অপ্সরার মুখের দিকে চাও।"

"তাহাই ত চাহিতেছি, তাহা দেখিয়াই ত বাঁচিয়া রহিয়াছি। কিন্তু তারা কোথায় ?"

"তারা কারা পিতা ?"

প্রশ্ন সমাপ্ত হইতে না হইতে এক ভিকারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। "সাতদিন অনাহার !" গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, মুখের সকল কথা স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে কহিল, "সাতদিন অনাহার !"

চকিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তুমি কোথায় থাক ? সাতদিন উপবাসিনী কিসের জন্য ?"

"আমার থাকিবার স্থান নাই মা ! পথের কাঙ্গালিনী আমি। মুষ্টিভিক্ষার জীবনরক্ষা, তাহাও সকলে দেয় না। সেই নিমিত্ত উপবাস !"

দয়াবতী অপ্সরাসুন্দরীর হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। ভিকারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া কিছু অর্থ আনয়নের অভিলাষে গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন, মহারাজ মহারুদ্রচাঁদ, কুমার ভূপেশচন্দ্র, আর কবিরাজ চতুর্ভুজলাল। তাঁহারা তিনজনেই এক সঙ্গে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অপ্সরার আর বাহির হওয়া হইল না।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজা বিরাটকেতুকে পুনরায় বাতুলালয়ে প্রেরণ করা উচিত কি না, এই প্রসঙ্গ লইয়া মহারাজের মন্ত্রণাগৃহে বাদানুবাদ হইতেছিল। ভূপেশচন্দ্রের শেষবাক্য শ্রবণে চতুর্ভুজ-লাল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা বিরাটকেতুর প্রকৃতি তখন কিরূপ ইহা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে রাজা ও রাজকুমারের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। উপবেশন করিবার অগ্রেই সেই শীর্ণকলেবরা জীর্ণবসনা ভিকারিণীর প্রতি তাঁহাদের নেত্র নিক্ষিপ্ত হইল। আর কেহই চিনিতে পারিলেন না, সকলের চক্ষেই সে মূর্ত্তি অপরিচিতা, কিয়ৎক্ষণ সেই চর্ম্মা-বৃত বদনপানে চাহিয়া চতুর্ভুজলাল ধীরে ধীরে মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাজা বিরাটকেতু! পরমসৌভাগ্য! কুটুম্ব উপস্থিত! ইনি একজন রাজমহিষী। তোমার শশিকুমারের—"

ক্রোধে দন্ত কড়্ মড়্ করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন," মৃত্যুকালেও এত যন্ত্রণা? আবার সেই শশিকুমারের নাম আমার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে? সেই পাপিষ্ঠ শৈশবাবধি আমার চক্ষের অন্তরে ছিল, ভালই হইয়াছিল। ভূতে উড়াইয়া লইয়া যাইবার কথা মিথ্যা। সে কথাটা মিথ্যা না হইয়া সত্য হইলেই ভাল হইত। চতুর্ভুজলাল! আমি তোমাকে নিষেধ করি-তেছি, ঐ ঘৃণিত নাম আর আমাকে শুনাইও না। ভিকারিণীকে বিদায় করিয়া দাও! একটু সুস্থ হইতেছিলাম, আবার যেন কি উত্তাপে আমার গাত্র দগ্ধ হইতেছে! মহারাজ! আপনি উপবেশন করুন, ভূপেশচন্দ্র! তুমিও বোসো। অপ্সরা! তুমি ওখানে ওরূপে দাঁড়াইয়া কেন? বোসো।"

বাস্তবিক রাজা, রাজকুমার এবং রাজকুমারীর নেত্রগুলি তখন ভিকা-রিণীর দিকেই সমাকৃষ্ট ছিল, তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে ভিকারিণীর অবয়ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, চক্ষুকর্ণের সমান ক্রীড়া হইতেছিল, কর্ণবিবরেও

বিনা বাক্যব্যয়ে চতুর্ভুজের বাক্যলহরী সুস্থিরভাবে শেষ করিয়াছিলে। রাজা বিরাটকেতুর অনুরোধবচনে তাঁহারা তিনজনেই দূরস্থিত ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন। বিনা অভ্যর্থনায় চতুর্ভুজলালও আসন গ্রহণ করিলেন। বিরাটকেতু কহিলেন, "চতুর্ভুজ! ভিকারিণীকে শীঘ্র তুমি বিদায় করিয়া দাও।"

"বিলম্ব আছে।" গম্ভীরভাবে চতুর্ভুজ কহিলেন, "বিলম্ব আছে। ইহাকে আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, আশা ছিল না; ঘটনার চক্রে ভিকারিণী হইয়া স্বয়ং আসিয়া দেখা দিয়াছে, হইয়াছে ভাল। ইহাকে না পাইলে একটী প্রধান রহস্য চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া থাকিত। ইহাকে আমার গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

বিরক্ত হইয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিয়া লও।"

"তাহাই হইতেছে।" ভিকারিণীকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, 'ভিকারিণি! তোমাকে আর এখন ভিকারিণী ভিন্ন অন্য কোন্ নামে আমি সম্বোধন করিতে পারি? রাজরাণীর পূর্ব্ব গৌরব এখন আর তুমি পাইতে পার না। যখন যেমন সময়, তখন তেমনি স ... এর। ভিকারিণি! বোসো। রাজবাড়ীতে আসিয়াছ. প্রচুর ভিক্ষা পাইবে, প্রচুর আহার পাইবে, প্রচুর বস্ত্র পাইবে। বোসো।"

ভিকারিণীর চক্ষে জল পড়িল। গণ্ডস্থলের চর্ম্ম প্লাবিত করিয়া সেই অশ্রু-প্রবাহ তাহার বিশুষ্ক বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিল। অপ্সরাসুন্দরীর দয়া সেই সময় আরও বলবতী হইয়া তাঁহাকেও যেন কাঁদাইল। করুণবচনে কহিলেন, "আহা! এই দুঃখিনী সাতদিন উপবাস করিতেছে। আমি ইহার জন্য কিছু—চতুর্ভুজ মহাশয়! আপনার যদি কিছু ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, একটু বিলম্ব করুন, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমি ইহার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী আনি। ভিকারিণি! তুমি বোসো। আমি আসিতেছি।" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া দয়াময়ী অপ্সরা গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া মহারাজ, মুক্তারুদ্রচাঁদ মনে মনে সেই দয়াশীলা রাজবালার দয়াগুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে ভিকারিণী বসিল। সকলেই তখন নির্ব্বাক।—চিত্র-

চাঞ্চল্যে রাজা বিরাটকেতু কেবল মাঝে মঝে দুটী একটী কথা কহিতে-ছেন। একবার নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চতুর্ভুজকে কহিলেন, "চতুর্ভুজ! তুমি জ্ঞানী লোক। বার বার কেন আমার কথা অগ্রাহ্য করিতেছ? উহারে বিদায় করিয়া দাও। ভিকারিণীর সঙ্গে তোমার এত কিসের কথা? উহাকে কথা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার এত কি প্রয়োজন? বিদায় করিয়া দাও। উহাকে দেখিলেই সেই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার শশিকুমারকে মনে পড়ে। চাহিয়া ত' দেখিতেছিই না, তথাপি চক্ষের কেমন ধর্ম্ম, যাহা দেখিব না মনে করি, বার বার তাহাই দেখিবার জন্য মন ব্যগ্র হয়। যতবার দেখিতেছি, ততবারই সেই কুলকলঙ্ককে মনে পড়িতেছে। দিয়ায় করিয়া দাও,—বিদায় করিয়া দাও!"

চতুর্ভুজ একটীও কথার উত্তর করিলেন না। মুখ ফিরাইয়া কেবল একটু হাস্য করিলেন মাত্র। ইত্যবকাশে প্রচুর খাদ্যসামগ্রীপূর্ণ একখানি পাত্রহস্তে সাক্ষাৎ করুণাময়ী অপ্সরাসুন্দরী সেই গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করি-লেন। ভিকারিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো! এসো, খাবে এসো।"

উপবাসিনী ঐ সম্বোধনে কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, "যাই মা অন্নপূর্ণা, যাচ্চি।"

"এসো।"

অপ্সরাসুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় আসিয়া দুঃখিনী ভিকারিণী পরি-তোষরূপে উপাদেয় রাজভোগদ্রব্য ভোজন করিল। ভোজনান্তে রাজ-কুমারীর সহিত সেই রাজগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিবে, কি পলায়ন করিবে, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, প্রচুর ভিক্ষা পাইবার লোভে গৃহমধ্যেই ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, "রাজলক্ষ্মী বাঁধা থাকুন, পরমেশ্বর মঙ্গল করুন, এই রাজকন্যা রাজরাণী হউন। আজ আমি যেমন জুড়াইলাম, এই রাজপুরীর সকলে এমনি জুড়াশীতলে চিরকাল পরমসুখে থাকুন।"

অপ্সরা কহিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তুষ্ট হইলাম, তুমি বোসো।"—প্রত্যেক বর্ণে বর্ণে স্পষ্ট স্পষ্ট প্রতিধ্বনি করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "তুষ্ট হইলাম, তুমি বোসো।"